কোম্পানী আমলে ঢাকা

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা

প্রথম সংস্করণ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

বাএ/৯২০
পাণ্ডুলিপি : পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা—২

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয়-বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা—২

মুদ্রাকর
বিভূতিরঞ্জন সাহা
বর্ণযোজন
৫২, লক্ষ্মী বাজার, ঢাকা-১

প্রচ্ছদ
আবদর রউফ সরকার

উৎসর্গ

বাবা আল্‌হাজ্জ আবদুর রহ্‌মান

ও

জান্নাতবাসিনী আমার মা

জোবায়দা খাতুনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

মূল গ্রন্থকার কর্তৃক পুস্তকের প্রস্তাবনারূপে লিখিত পত্র

ফোর্ট-উইলিয়ামের মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব মাননীয়
জেমস্ হাচিন্সন সমীপেষু,

মহাত্মন,

মেডিক্যাল অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নির্দেশে স্ব-স্ব জেলা এবং কার্যস্থলের ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আপনি যে আদেশ দিয়েছিলেন সেই মোতাবেক আমি মেডিক্যাল বোর্ডের সমীপে এতদ্‌সংলগ্ন "ঢাকার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" উপস্থাপন করছি।

মহামান্য গভর্ণর-জেনারেল-ইন্-কাউন্সিল এর প্রদত্ত স্মারক-লিপিতে অনুসন্ধানের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু, মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সার্জনদের প্রতি প্রদত্ত সরকারী নির্দেশনামায় এবং গভর্ণর-জেনারেলের নির্দেশাবলীতে প্রকাশিত সরকারী আদেশে যে সমস্ত বিষয় নির্ধারিত হয়েছে—তা' নিম্নরূপ: (১) স্থানের অবস্থান ও সীমানা। (২) নদনদী, জলাশয়, কুপ এবং জলাভূমি। (৩) জলবায়ু। (৪) মৃত্তিকা। (৫) জীবজন্তু, উদ্ভিদ ও খনিজদ্রব্য। (৬) কৃষির অবস্থা। (৭) সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। (৮) স্থানীয় এবং মহামারী আকারের রোগব্যাধি। (৯) হাসপাতালের অবস্থা এবং এর অন্তর্ভুক্ত ঘর-সমূহের আয়তন। (১০) লোকসংখ্যা, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা, জ্বালানী, খাদ্য, রীতিনীতি, শিশুপালন ও আমোদ প্রমোদ। (১১) বিবাহ, জন্ম, রোগব্যাধি এবং মৃত্যুর তালিকা। (১২) গবাদি পশু ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জীবজন্তুর রোগব্যাধি। (১৩) উদ্ভিদের রোগ। (১৪) আদম শুমারী। (১৫) অভাব ও প্রাচুর্যের কারণ ও ফলাফল। (১৬) দরিদ্রদের অবস্থা এবং তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। (১৭) শ্রমের মজুরী। (১৮) অপরাধের বাস্তব কারণ। (১৯) মৃত্যুর অনুপাত। (২০) জন্মের সঙ্গে বিবাহের সাধারণ অনুপাত। (২১) জেলার আয়তন। ভূমির তুলনামূলক উর্বরতা শক্তি, অধিবাসীদের অভ্যাস এবং হিন্দু ও মুসলমানের অনুপাত।

এগুলোর অধিকাংশ বিষয়ে আমার মন্তব্য ছাড়াও, আমি জেলার ইতিহাস, এবং স্থানীয় শিল্পদ্রব্যাদি, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজস্ব ও শিক্ষার অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছি। অধিকন্তু আমি বলতে পারি যে, আমি যে সব তথ্যাদি পরিবেশন করতে সক্ষম হয়েছি, তা' এস্থানে আমার আট বছর অবস্থান কালের ব্যক্তিগত জ্ঞান থেকে অর্জিত। বিভিন্ন সরকারী অফিস-আদালতের নথিপত্র পাঠ করে এবং শহর ও গ্রামে বসবাসকারী লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করেও আমি তথ্যাদি সংগ্রহ করেছি। শহরের লোক গণনার কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে, আমি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে. গ্রান্টের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এছাড়া, বিগত দশ বছর যাবৎ জলবায়ুর যে বিবরণ আবহাওয়া-সংক্রান্ত রেজিষ্টারে মিঃ ল্যাম্ব সংগ্রহ করেছেন, তা' থেকে তথ্য লাভের জন্য আমি তাঁর নিকট ঋণী। এ শহরের অধিবাসী গঙ্গাচরণ ও গঙ্গা দাস নামক দু'জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট থেকে মসলিন বস্ত্র-বয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি লাভ করার জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
জেমস্ টেলর
সার্জন

কলকাতা
৩০শে মার্চ, ১৮৩৯

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

যে কেউ এ গ্রন্থ পাঠ করে নিজেই এর মূল্যমান স্থির করতে পারবেন-এ প্রত্যাশা অমূলক নাও হতে পারে। তথাপি ভূমিকা লেখার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয়েছে। জেমস টেলর সাহেব রচিত "টপোগ্রাফী অব ঢাকা" গ্রন্থের বাংলায় ভাষান্তরের নামকরণ করা হয়েছে 'কোম্পানী আমলে ঢাকা'। মূল গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা মিলিটারী অরফান প্রেস থেকে। প্রকাশ কাল ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ।

সিপাহী বিপ্লবেরও ষোল বছর আগে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলের শেষ পর্যায়ে টেলর সাহেব ঢাকায় আসেন ডাক্তার হয়ে। তিনি ছিলেন ঢাকার তৎকালীন সিভিল সার্জন। এখানে তিনি দীর্ঘ আট বছর কাল অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে এবং কখনও বিভিন্ন সরকারী অফিসের দলিল দস্তাবেজ থেকে, কখনও সর্বশ্রেণীর লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নানাভাবে, এদেশের নানা তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ কাজ তিনি কোম্পানী সরকারের আদেশ ক্রমেই সম্পন্ন করেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে অবস্থানরত মেডিক্যাল বোর্ডের সচিব জেমস হাচিন্‌সনের নিকট ঢাকার ভূ-প্রকৃতি ও পরিসংখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ('এস্কেচ অব্‌ দ্য টপোগ্রাফী এণ্ড ষ্টাটিস্‌টিকস্‌ অব্‌ ঢাকা') পেশ করেন।

এ সময়ে প্রাচ্যের রহস্য-নগরী ঢাকা তার বিগত দিনের চাকচিক্যময় সকল গৌরব হারিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় উপনীত। তার রাজধানীর গৌরব লুপ্ত হয়েছে। বিশ্বখ্যাত মসলিন বিলেতী সুতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও প্রতি-কূলতায় বিপর্যস্ত হয়েছে। যন্ত্র-শিল্পের কাছে হেরে গিয়ে বহু কারিগর, শিল্পী শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে কৃষক সেজেছে; অযত্ন ও অবহেলায় রাস্তাঘাট বিবর্ণ ও পরিবেশ পুঁতিগন্ধময় হয়ে উঠেছে। শহরের লোক সংখ্যা হ্রাস পেয়ে এক চতুর্থাংশে পর্যবসিত হয়েছে; রপ্তানী আয় চরমভাবে কমে গেছে। অধিবাসীরা দুর্বল ও আত্মপ্রত্যয়হীন হয়ে পরাধীনতায় গ্লানিতে ধুকছে—এমনি এক বেদনাদায়ক পরিস্থিতিতে ঢাকার বিবরণ পাই একজন বিদেশীর কাছ থেকে।

উল্লেখিত গ্রন্থ কালের পরিমাপে প্রায় দেড়শো বছর অতিক্রম করার দশায় উপনীত হয়েছে। তথাপি এতে এদেশের কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও খাদ্য ইত্যাদি বিষয়ে এমন সব তথ্য রয়েছে যা থেকে জ্ঞান লাভ করার যথেষ্ট অবকাশ এখনও বিদ্যমান। ঢাকা বলতে শুধু শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি লেখক; মোটামুটিভাবে বর্তমান স্বাধীন সমুদয় বাংলাদেশের কথাই এতে বিধৃত হয়েছে কোন না কোনোভাবে। এদেশের ভূমিরূপ, নদ-নদী, অধিবাসীদের বিচিত্র জীবনধারা ও উপজীবিকা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, লোকসংখ্যা, দ্রব্যমূল্য, লোকচরিত্র, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, যাতায়াত ও যানবাহন, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সর্ব বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সচেতন দৃষ্টিতে চিত্রিত করার প্রয়াস আছে এ গ্রন্থের সর্বত্র। কোনো কল্পনা বা কিংবদন্তী নিয়ে লেখক কখনও সময় ক্ষেপণ করেননি। এ গ্রন্থের বহু পরবর্তী সময়ে ১৯০৬ সালে রচিত এস, বি, ব্রাডলী বার্টের 'Romance of an Eastern Capital' এর ন্যায় কিংবদন্তী নিয়ে কোনো রহস্যঘন পরিবেশও সৃষ্টি করেননি লেখক। তৎপরিবর্তে একটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। এদেশ সম্বন্ধে সেকালে কেন, একালেও এমন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রচিত দ্বিতীয় আর কোনো গ্রন্থের সন্ধান মিলবে কিনা, সন্দেহ। আমার বিশ্বাস এমন বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা কোনো একক গ্রন্থে আজও বিরল।

'ঢাকা তথা ঢাকা প্রভিন্স' বলতে যে ভূ-খণ্ডের কথা বলা হয়েছে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মধ্যযুগে স্বাধীন তুর্কী-পাঠান সুলতানদের আমল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বঙ্গ থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভিন্ন ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ তখনও বিদ্যমান ছিল।

মধ্যযুগে চৈতন্যের জীবনীকার বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রবেশের বাসনার কথা উল্লেখ করেছেন। এই ঢাকা তথা স্বাধীন বাংলাদেশকেই প্রকৃত বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করেছেন চৈতন্যের জীবনী লেখক। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নবাবী আমল থেকে কোম্পানী আমল পর্যন্ত 'ঢাকা প্রদেশ' নামে একটি স্বতন্ত্র ভূ-খণ্ডের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছু আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে বঙ্গ-ভঙ্গ করে 'আসাম ও পূর্ব বাংলা প্রদেশ' গঠন করেন। সেখানেও সিলেটসহ পূর্ববঙ্গের সমন্বয়ে বর্তমান ভূ-খণ্ডেরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে এ

ভূ-খণ্ডই পাকিস্তানের পূর্বাংশ হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে তা' স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে গৌরবময় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বহু শতাব্দী-প্রাচীন ঢাকা নগরী এই ভূ-খণ্ডেরই কেন্দ্র বিন্দু; আপন ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যে তা অনন্য।

টেলর সাহেব কমবেশী এই ভূ-খণ্ডেরই ভৌগোলিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে এর বিশাল জলধারা অর্থাৎ নদী-নালার গতিধারার পরিচয় তুলে ধরেছেন। গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা, বংশাই, বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও ইছামতী—আরো কত বিচিত্র নদীর নাম ও তার আনুপূর্বিক ইতিহাস এবং গতিপথ অতি সংক্ষিপ্ত অথচ চমকপ্রদভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানে তিনি একজন সার্থক ভূগোলবেত্তাও বটে।

লেখক বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি ও এর বৈশিষ্ট্য, মাটিতে বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণের ভাগ ও গুণাগুণসহ নদীর তলদেশের (River bed) বর্ণনা দিয়েছেন নিপুণভাবে। তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতার পরিচয় একটি মাত্র উদাহরণেই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ফরিদপুরের সন্নিকটে ৩০ ফুট গভীর মাটির অভ্যন্তরভাগে পিটকয়লার ন্যায় এক ধরনের পদার্থের বিবরণ দিয়েছেন লেখক। তাঁর নিজের ভাষায়, "The black vegetable mould is of various degrees of depth · in several situations it occurs in beds of a considerable extent and depth, and approaches to lignite in appearance

In the beds of the deep morasses in the southern division there are found small nodular masses of earth which appear to be composed of decayed vegetable matter; they are hard compact bodies of a jet black colour, and of so fine a substances, that when pulvarized they are occasionally used by the natives to make ink.

In the vicinity of the large lake near Fureedpore, this earth has been found in digging wells, at a depth of 30 feet below the surface." [Topography of Dacca, Page 7—8]

তাঁর এই আবিষ্কার সত্য প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানী আমলে ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে পিট কয়লার সন্ধান লাভের মধ্য দিয়ে।

বাংলাদেশের জীবজন্তু ও গাছপালার বর্ণনা আরো বৈচিত্রময়। টেলর সাহেব বহু জীবজন্তু ও পাখ-পাখালির চমকপ্রদ পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। এখানকার উদ্বিড়াল ও ভোঁদরের চামড়া, চীনের রাজপুত্রদের পোশাক তৈরীর জন্য মাছরাঙ্গা পাখির পালক ও অন্যান্য বহু দ্রব্য ভুটান, চীন, বার্মা ও তিব্বতসহ পৃথিবীর বহুদেশে রপ্তানী করা হতো। এদেশের বনে জঙ্গলে বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ, হাতি, খরগোস, সজারু, সাপ, ভালুক ইত্যাদি নানা প্রকারের জীবজন্তু ও সরীসৃপ দেখতে পাওয়া যেতো। দেখা যেতো নানা রঙের পাখি।

এই ঐতিহ্যবহুল ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত জনপদ থেকে একদা আরো বহু দ্রব্য সামগ্রীই রপ্তানী হতো পার্শ্ববর্তী দেশসহ অন্যান্য অনেক দেশে। এসব দ্রব্যের মধ্যে, মসলিন ও বুঁটিতোলা কাসিদাবস্ত্র—জেদ্দা, বসরা, মিশর, তুরস্ক এবং ইউরোপীয় দেশসমূহে; নীল, জাফরান, সুপারি, সাবান, চামড়া, পাট ও পাটজাতদ্রব্য, শঙ্খবালা, অলংকারাদি, তাম্রনির্মিত বাসন-কোসন, পনীর এবং সংরক্ষিত ফলমূল সাধারণতঃ কলকাতা, আসাম, আরাকান ও পেগু প্রভৃতি অঞ্চলে প্রেরণ করা হতো।

রপ্তানী যেমন ছিল, তেমনি আমদানীও করতে হতো বহু জিনিস। তখন আসাম থেকে সরিষা ও তৈলবীজ, আসাম ও মোরাঙ্গ থেকে চুনাপাথর ও কাঠ, পূর্ণিয়া থেকে তামাক, আরাকান ও ত্রিপুরা থেকে তুলা, আরাকান ও পেগু থেকে খয়ের, গজদন্ত, গোলমরিচ, শেঁকোবিষ, মোম, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি আমদানী করতে হতো। এ ছাড়া, আসাম থেকে মুগা বা তসরসিল্ক, পাটনা থেকে গম, খাদ্যশষ্য, জুতা; কলকাতা থেকে চাষশস্য, বিলেতী পাকানো সুতা (Mule Twist), লংক্লথ, নানা রঙের সুতী ছিট কাপড়, মিহি সাদা সুতীবস্ত্র, শাল, পশমী বস্ত্র, মাটি ও কাঁচনির্মিত বাসন-কোসন, সুঁই, দেশীয় ঔষধপত্র, মশলাদ্রব্য, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি আসতো। প্রচুর লবণ দেশেই পাওয়া যেতো। চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে প্রচুর লবণ নারায়ণগঞ্জ বন্দরের মাধ্যমে সারা দেশে চালান হোতো।

অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন কাজে ও কুঁড়েঘরের ছাউনীতে বহু রকম উদ্ভিদের ব্যবহার করতো। কুঁড়েঘরের ছাউনীতে বন, উলুখড়, কাশ বা খাগড়ার ব্যবহার ছিল। গোখাদ্য ছিল দুবলা ও বক্ষা; এ ছাড়া, মুলোয়া, কুশা, হোগল পাতা, ঝাউ, বাঁশ, বেত, গড়ালী তো ছিলই। গৃহস্থের লাঙ্গল

তৈরীতে আম, হিজল, বড়ই ও গাবের ব্যবহার ছিল। তাঁতের মাকু, ডিঙ্গী নৌকা, জলাধার ইত্যাদি তৈরীর কাজে তালগাছ; বাক্স পেটরা, বারকোষ, পেয়ালা, বিভিন্ন রকম বাসন-কোসন তৈরীতে কদম্ব ব্যবহৃত হোত। ঢেঁকি ও ট্যাম্পার বানাতে গাব; নৌকা, ঘরের খুঁটি ও কড়িবরগা তৈরীতে হরিতকি ও বয়রা; সিন্দুক, আলমীরা ও চেয়ার নির্মাণে কাঁঠাল কাঠ ইত্যাদির ব্যবহার ছিল, আজও আছে।

ঔষধি গাছপালার (Medicinal herb) কমতি ছিল না সেকালে। ঔষধি গাছ-গাছড়া এবং অধিবাসীদের মধ্যে এসবের ব্যবহার বিধি পর্যন্ত লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। জয়ন্তী পাতা, সোনা বা পাহাড়িয়া বেগুনী আবলুস, অপরাজিতা, রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, মুথা, পলতা, কালো কালকা সুন্দা, চিরা, ভুঁই কুমড়া, নিম, হেলেঞ্চা, বেল, ধনে, নাগকেশর, হাড়ভাঙ্গা লতা, তুলশী, মিঠা তুলশী, চমপা, নাগফণী, শেফালিকা, জবা, মান্দার, ইশবগুল, আমলকি, কদম্ব, থানকুনিপাতা, যষ্ঠীমধু, বকুল, রক্তকমল, সজনে, শতমূলী, কুন্দরী, পাথরচুর, সুন্দী শাপলা (নীলাভ ফুলের শাপলা), ধুতরা ও ভেরেণ্ডা ইত্যাদি বহুবিধ শাক্‌পাতা, গাছগাছড়া নানান রোগে নিত্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে যুগ যুগ ধরে। এসবের ব্যাপক সন্ধান দিতেও কার্পণ্য করেন নি লেখক। কোন্ রোগের কোন দাওয়াই তাও সঠিকভাবে বলে দিয়েছেন তিনি। লেখক জানেন, গরীব গ্রামবাসীরা চামচের পরিবর্তে ঝিনুক ব্যবহার করে; দুর্ভিক্ষের সময় শালুক আর ঘেচু সিদ্ধ হয় তাদের প্রধান আহার্য বস্তু। তিনি জানেন, আবহমান বাংলায় বন্যাই বার বার আনে দুর্ভিক্ষ, মহামারী। তিনি জানেন, বাণ্ডিকুট ইঁদুর ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। গর্তে লুকিয়ে রাখে এরা প্রচুর ধান, আর গরীব গ্রামবাসী এদের গর্ত খুঁড়ে এক থেকে দু'মণ পর্যন্ত ধান পেয়ে যায়। বনেজঙ্গলে আছে অসংখ্য সরীসৃপ; নদীনালায় আছে প্রচুর মাছ ও জলচর প্রাণী। লেখক এসবের পরিচয়ও দিয়েছেন। জেলার উত্তরাংশে পিণ্ড এবং দানার আকারে খনিজ লৌহের অস্তিত্বের কথাও তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন। ফলমুলেরও সরস বিবরণ পাই এই গ্রন্থে।

তিনি কৃষি প্রধান ও গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের পরিচয় আরো নিবিড় করে তুলে ধরেছেন। ধান, পাট, ইক্ষুই প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য এখানে। বর্তমানের ন্যায়, তখনও পাট, মেস্তাপাট ও শনের চাষ হতো। টেলর সাহেব লিখেছেন,

এক বিঘা ভাল জমিতে তিনমণ পরিষ্কার শন উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং প্রতিমণ শনের সর্বোচ্চ মূল্য দু' টাকা। পাট ও মেস্তাপাট শনের তুলনায় ব্যাপক হারে চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে এর বীজ বপন করতে হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে গাছ তুলতে হয়। এগুলোর প্রস্তুত প্রণালী, শনের মতই। পাট ও মেস্তাপাটের আঁশ দড়ি, কাগজ ও বিক্রমপুরের চট তৈয়ার করতে ব্যবহৃত হয়। কলকাতায় বেশ কিছু পরিমাণে এসব দ্রব্য রপ্তানীও করা হয়ে থাকে।

গবাদিপশু সম্পর্কেও লেখকের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, কৃষি কাজে ব্যবহৃত গবাদি পশু নিম্নজাতোদ্ভব, দুর্বল ও ক্ষুদ্রকায় এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের গবাদি পশু অপেক্ষা খর্বাকৃতির। এছাড়া, অন্যান্য কৃষিজ দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে।

বাংলাদেশের লোকজীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সাধারণ অধিবাসী ছাড়াও, উপজাতি—কোচ, রাজবংশী প্রভৃতিদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি সম্বন্ধেও মনোজ্ঞ আলোচনা আছে এতে; অন্ত্যজশ্রেণীর স্তরগুলোকেও সমান গুরুত্ব ও অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করার অনুরাগ লক্ষ্যযোগ্য। হিন্দুদের কামার, কুমার, ডোম, চণ্ডাল, পাটনী, পাটিয়াল, মালাকার, কৈবর্ত, গন্ধবণিক, নাপিত ও ধোপা প্রভৃতিদের এবং মুসলমানদের মধ্যে গারুরী, হাজ্জাম, মাহিফরাস, বেদে, ধোপা, বাজিকর, বেহারা, বাদ্যকর, সাপুড়ে প্রভৃতিদের সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

লেখকের সমসাময়িককালে ১৮২৮ সালে ফরায়েজী আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল। এই আন্দোলন এবং এর নেতা হাজী শরিয়তুল্লাহ সম্বন্ধেও টেলর সাহেব উদাসীন ছিলেন না। হিন্দু মুসলমান অধিবাসীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক, বিশেষ করে তাদের ধর্মীয় জীবনের চিত্র সমান দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ঘটনা বিরল বলে লেখক উল্লেখ করেছেন।

অধিবাসীদের চরিত্র, জীবনযাত্রা প্রণালী, রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ, চালচলন, স্বভাব ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখকের পর্যবেক্ষণ অনেকাংশে সত্যসন্ধ। একালের ন্যায় সেকালেও অধিবাসীদের কেউ কেউ মিথ্যা সাক্ষ্যদান, জালিয়াতি এবং মিথ্যা মামলা-মকদ্দমা রুজু করায় অভ্যস্ত ছিলো। হ্যামিল্টন ও জেমস টেলর বাঙ্গালীদের সাধারণভাবে অলস ও কাপুরুষ রূপে অভিহিত করার প্রয়াস

পেয়েছেন। মিঃ বি, হ্যামিল্টন সপ্তদশ শতকের অন্তিম-পর্বে ঢাকা অঞ্চল পরিভ্রমণে আসেন এবং এই জনবহুল জনপদের বিপুল ঐশ্বর্য ও জিনিষ-পত্রের অত্যধিক সস্তামূল্যের বিবরণ রেখে যান। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে তিনি অধিবাসীদের ভিরুতার কথাও উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক বলশূন্য চেহারা দেখে টেলর সাহেব হয়তো এমন দুঃখজনক উক্তির উদ্ধৃতি দিতে উৎসাহবোধ করে থাকবেন। কারণ পলাশীযুদ্ধে শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা শুধু বিশ্বাসঘাতকদের কুটকৌশলেই পরাজয় বরণ করেননি, আমার বিশ্বাস—তাঁর পরাজয়ের মূলে ছিল—যুদ্ধ ক্ষেত্রে ইংরেজ কর্তৃক নব্য ইউরোপের নতুন কুটকৌশল অবলম্বন ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার। নতুন কলাকৌশল, ভিন্ন ধরনের যুদ্ধরীতি ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কোম্পানীর সেপাইরা পরবর্তী সময়ে এদেশীয় জনসাধা-রণের মধ্যে ভীতির সঞ্চারে সফলকাম হয়েছিল। অন্যদিকে রাজনৈতিক শক্তি, স্বাধীনতা ও ঐশ্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব দরিদ্র অধিবাসীগণ নিস্তেজ হয়ে পড়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে পাঁচজন কোম্পানীর সিপাইর পক্ষে শ' পাঁচেক 'নেটিভ'কে তাড়িয়ে নেয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বাঙ্গালী কাপুরুষ নয়—এ সত্য আজ সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট উজ্জ্বলরূপে প্রকটিত। হ্যামিল্টন ও টেলরের মন্তব্য চিরকালের জন্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। নব জাগ্রত মহাচীন একদা আফিমের ঘোরে ঝিমিয়ে ছিল। তাই বলে আজও সে অলস, নিস্ক্রিয়—একথা আর কে বলবে? বাংলাদেশীরাও একটি শক্তিশালী সেনা-বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করে স্বাধীনতা এনেছে। অকুতোভয়ে তরুণেরা দুঃসাহসিক অভিযানে নিষ্ঠা, প্রজ্ঞা আর শক্তির পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছে। আজ আর কে বলবে বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ?

একদা এই স্বাধীন বাংলাদেশ-অঞ্চল ছিল—নিখিল বঙ্গের শস্যভাণ্ডার। চাল, ডাল, কাঁচা ফলমূল এখানে অকল্পনীয়রূপে সস্তা ছিল। ১৮১০ সাল থেকে ১৮৩৬ সালের মধ্যে এক মণ আমন চাল বিক্রি হতো ১ টাকায়। এক সের পরিমাণ পুঁটি মাছ মিলতো এক পয়সার অর্ধেক দামে। এক মণ আউশ চাল পাওয়া যেতো এক টাকারও কম মূল্যে। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে ঢাকা পরিভ্রমণে এসে হ্যামিল্টন সাহেব এবং এর পূর্বে ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে সিজার ফ্রেডারিক সন্দ্বীপ অঞ্চলে পদার্পণ করে একই রকম সস্তাদামে জিনিসপত্র বিক্রি

হতে দেখেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অকাল-বন্যা, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি অধিবাসীদের জন্য বয়ে আনতো অপরিমিত দুঃখ-দুর্দশা, খাদ্যাভাব এবং পরিণামে দুর্ভিক্ষ। আজও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। লেখকও সুদূর অতীতে অকাল বন্যাকে দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করেছেন। এবং ১৭৮৪, ১৭৮৭, ১৭৮৮ সালের মহাদুর্ভিক্ষও শুধু উল্লেখিত বন্যার কারণেই দেখা দিয়েছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক, ও সামাজিক জীবনের বর্ণনা যে পরিমাণে পাই, ঠিক সে পরিমাণে সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জীবনের পরিচয় মেলে না। যিনি এদেশের প্রতিটি বিষয় গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁর পক্ষে সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক ছিল না। লেখকের সমসাময়িককালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্য নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। তৎকালে ঢাকায় মুসলমানদের মধ্যে আরবী ফারসীর চর্চা ছিল কিন্তু কোনো সাহিত্যচর্চা হতো কিনা—তার আদৌ কোনো উল্লেখ নেই। শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। এ সম্পর্কিত আলোচনা থেকে বুঝা যায়—সামান্য বাংলা, ফারসী ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীরামপুর মিশনারী সোসাইটির উদ্যোগে ও অর্থে রেভারেণ্ড মিঃ লিউনার্দ কর্তৃক ২৯টি বিদ্যালয় পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য অর্থের অভাবে অল্পকালের মধ্যেই এর সংখ্যা মাত্র ৭-এ এসে পর্যবসিত হয়।

মোঘল আমলে নিঃস্ব গরীবদের আহার্য জোগানোর জন্য 'লঙ্গরখানার' ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কোম্পানী আমলে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেই বলে লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, ১৮২৮ থেকে বিলেতী পাকানো সুতার ব্যাপক আমদানীর ফলে মসলিনসহ এদেশীয় বস্ত্রশিল্প কি নিদারুণ-ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে তারও ফিরিস্তি দান করেছেন তিনি।

জেমস টেলরের বর্ণনায় বাংলাদেশের নিভৃত আঙ্গিনার রহস্যপুরীতে প্রবেশের স্বাক্ষর আছে। মেঘনার তীরবর্তী গ্রাম সিদ্দিকপুর, গঙ্গাতীরের গ্রাম মাছুয়াখালি, চাগঞ্জ ও দুবাই; রসুলপুর পরগণায় আছে খোদালবাগ। কত নাম! কত ইতিহাস।

নিভৃত পল্লীপথে কোথায় হেলেঞ্চা, গন্ধভেধালী আর কলমী শাক, কোথায় মাঠের মাঝে একলা দাঁড়িয়ে হিজল ফুল ছড়ায়, কোথায় গভীর জঙ্গলে ফলে অজস্র চালতা, কোথায় থাকে মাছরাঙ্গা, কোথায় বাস করে ভোঁদড় আর উদ্বিড়াল, কোথায় ইঁদুর লুকিয়ে রাখে মুঠি মুঠিধান, কেমন করে বর্ষায় বন্যায় মাঠের ধান শ্যাওলা পানায় ঢাকে, কোথায় বাসা বাধে ভুঁইপাখী, কোথায় থাকে নিশাচর 'অক', শাপলা পাতার ফাঁকে ফাঁকে কেমন করে বেচে থাকে চীনা-জেঁকোনা—এসবই একদা অন্তরঙ্গ চোখে সঙ্গোপণে দেখেছেন টেলর। আর গবেষকদের জন্য রেখে গেছেন গবেষণার অফুরন্ত উৎস। আমি মনে করি, যাঁরা এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালবাসেন, যাঁদের ঔৎসুক্য আছে দেশকে নিবিড়ভাবে জানার—তাঁদেরকে কথঞ্চিত তৃপ্তি দিতে পারলেই আমার এ অনুবাদ কর্ম সার্থক হবে। এই মূল্যবান গ্রন্থটির অনুবাদ খুব সহজ কর্ম ছিল না। এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীবজন্ত ও গাছপালা সংক্রান্ত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার জ্ঞান এর অনুবাদের জন্য অপরিহার্য বলা যায়। একাদশ অধ্যায়ে আছে চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা। এর সঠিক ভাষান্তরের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল। এ সব ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জন বন্ধুবর মকবুল হোসেন, আমার প্রিয় ছাত্র জর্জ ষ্টিফেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক মকসুদ আলী ও ঢাকা কৃষি কলেজের প্রভাষক আজহারুল ইসলাম।

মূল ইংরেজী গ্রন্থটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার সহকর্মী বন্ধু মির্জা হারুনর রশীদ সাহেব বইটির সন্ধান দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন এবং জগন্নাথ কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ আ. ন. ম. বজলুর রহমান সাহেব তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত আলমীরা থেকে বইখানা আমাকে প্রদান না করলে এর অনুবাদ আমার দ্বারা হয়তো কখনই সম্ভব হোত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের প্রবীন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডঃ নজমুল করিম সাহেবের সুপারিশ ক্রমে বইটির অনুবাদ কর্ম হাতে নেয়া সম্ভব হয়েছিল। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

ছাপার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ব্যাপারে বর্ণযোজনের স্বত্বাধিকারী বাবু বিভূতিরঞ্জন সাহা, নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে আমার জ্যেষ্ঠপুত্র মাহমুদ হাসান নিরু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল গবেষক আহমদ নূরুল ইসলাম ও সহকর্মী অধ্যাপক সফিউল আলম সাহায্য করেছেন। এ গ্রন্থ অনুবাদে আমার একটাই সান্ত্বনা ঃ এতে কমবেশী বাংলাদেশেরই ভূ-প্রকৃতি ও বিস্তৃত জনপদের সামগ্রিক পরিচয় বিধৃত।

বিনীত

জগন্নাথ কলেজ
ঢাকা

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

সূচীপত্র

জেমস্ টেলর

কোম্পানী আমলে ঢাকা

থম অধ্যায়

[ঢাকা জেলার সাধারণ বিব—বিভাগসমূহ—প্রাকৃতিক গঠন ও সীমারেখা—মৃত্তিকা—নদনদী ও জলব।]

ঢাকা জেলার অবস্থান ও প্রকৃতি

ঢাকা জেলা বঙ্গদেশের র্বাংশে অবস্থিত। এ জেলা প্রধানতঃ ২৩° ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৪° গ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০° ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। গঙ্গা, পুত্র ও মেঘনাবিধৌত এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন। এর আকৃত্রিভুজের ন্যায় ও ভূমি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এবং এর চূড়াটি ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনারঙ্গম-স্থলের দিকে অবস্থিত। এ জেলা উত্তরে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে াকেরগঞ্জপূর্বে ত্রিপুরা ও পশ্চিমে ফরিদপুর বা ঢাকা জালালপুর প্রভৃতি জেলা দ্বারা বেষ্টিত।

পূর্বে এসব জেলা অধীন ছিল, এবং এই সমুদয় এলাকা নিয়ে ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত একপ্রদেশ গঠিত হয়েছিল। এ জেলার উত্তর-দক্ষিণের সর্বাধিক প্রশস্ত স্থানের র্ঘ্য ৭০, ও সর্বোচ্চ প্রস্থ ৫৯ ভৌগোলিক মাইল, এবং আয়তন ১,৭৫০ বর্গইলের উর্ধে নয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এর আয়তনের এক-তৃতীয়া অনাবাদী ও বনাঞ্চল এবং এক-সপ্তমাংশ এলাকা জুড়ে রয়েছে নদীর শাখা-প্রশাখা এবং খাঁড়ি সমূহ।

সমুদ্র থেকে এ জোর দক্ষিণ প্রান্তের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। এই সমগ্র অঞ্চলটি বড় বড় নদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা শতধাবিভক্ত। এর ফলে এ অঞ্চলের আট-দশংশ স্থান বছরের বেশ কিছু সময়ই দু'থেকে চৌদ্দ ফুট গভীর পানিতে নিমজ্জিত থাকে। প্রাকৃতিক গঠন, বৈশিষ্ট্য, উচ্চতা এবং জমির আপেক্ষিক উর্বরাক্তি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে এই জেলাকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করা চলে ; কনাই, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং ইছামতি নদী এ দু'অংশের মধ্যবর্তী সীমা র্দেশ করে।

উত্তরাঞ্চল

এ জেলার উত্তরাংশ প্রায় ৯০০ বর্গমা জুড়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলের পূর্বে মেঘনা নদী, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও বানার নদ কিয়দংশ এবং একটি সীমারেখা আটিয়া ও কাশিমপুরের ঘন-বনাঞ্চল হয়ে বংশী নদীর তীরে অবস্থিত আমতা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম ও দক্ষিণাংশের সীমানা—কনাই নদী, ধলেশ্বরীর উর্ধাংশ এবং ইছামতী নদীর যে স্থানে বুড়িগঙ্গা মিলিত হয়েছে, সে স্থান থেকে মেঘনার সঙ্গে এর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। লা নদী এ অঞ্চলকে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। এরূপভাবে বিভক্ত দুটা অংশের পশ্চিমাংশে ঢাকা নগরী অবস্থিত এবং এ অংশই সর্বাধিক বিস্ত। বর্ষাকালে এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান চতুষ্পার্শ্বস্থ নদীসমূহের উচ্চতম জলসীমার চেয়ে উপরে থাকে। শহরের বিশ মাইল উত্তরে বিশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট গড়াঞ্চল সীমান্তে অবস্থিত গিরিশ্রেণীর সমান্তরালে চলে গেছে। এ অঞ্চলে মাটি লাল কাঁকর এবং কাদামাটির বিভিন্ন স্তরে গঠিত। অপেক্ষাকৃত উচুঁন সবুজ উদ্ভিদের পাতলা আস্তরণ দ্বারা এবং নদী ও খাল নালার দিকে পলিমৃত্তির স্তর দ্বারা আবৃত। এই অঞ্চল একটি বিস্তৃত ভূভাগের অংশ, যার মৃত্তিকা ওচতা একই প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং উত্তর-পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের :ক প্রসারিত। আটিয়া পরগণার বেশ কিছু অংশ এর অন্তর্ভুক্ত এবং ঢাকা দক্ষিণ-পূর্বস্থান থেকে উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত মধুপুর পর্যন্ত এ সমগ্র অঞ্চল পশ্চিমে চামতারা এবং পূর্বে নান্দিয়া পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে ৭০ মাইল ও প্রস্থে ৩০ মাইল জুড়ে বিস্তৃত। ছোট ছোট পাহাড় এ অঞ্চলের পশ্চিমাংশ হতে ক্রমাগত আকারে ও অধিক পরিমাণে উচুঁ হয়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে এবং শেষ প্রান্ত সমাধিক উচ্চতায় ত্রিপুরা পাহাড়ের সমান্তরালে উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত হয়েছে।

এ সমস্ত পাহাড় লৌহ আকর সংমিশ্রিত লাল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত এবং ২০ থেকে ৫০ ফুট পর্যন্ত উচুঁ। উত্তরাঞ্চলের এ সমস্ত উচ্চভূমি কাঁকর-মিশ্রিত মৃত্তিকা বিশিষ্ট ও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এবং ব্রহ্মপুত্র ও এর প্রধান শাখানদী ঝিনাই-এর মধ্যে অবস্থিত। এর প্রাকৃতিক গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ অংশ ছোট ছোট নদী নালার দ্বারা বিধৌত; বিশেষ করে আশেপাশে বড় বড় নদ-নদীর অববাহিকা ও পলি অঞ্চলের সঙ্গে এ অংশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ফলে এর অধিকাংশ অঞ্চলই অনুর্বর ও অনাবাদী এবং ঘন বনাঞ্চল ও

অভ্যন্তরভাগ বিশাল বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ঘন-সন্নিবিষ্ট। বহু সংখ্যক হাতী, বাঘ, নেকড়ে ও ভালুক এ অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। কিছু কিছু আবাদী ভূমি এই জঙ্গলের আশেপাশে সীমাবদ্ধ এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত অভ্যন্তরভাগের ছোট ছোট নদীনালার তীরবর্তী এসব কর্ষিত ভূমি কিছুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আরো দক্ষিণে শহরের দিকে চাষাবাদ অধিক বিস্তার লাভ করেছে। এখানকার লাল মৃত্তিকা ছোট ছোট খাল-নালা এবং আরো অভ্যন্তর ভাগে বড় বড় জলা-ভূমির দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। এগুলোর আশে পাশে ধান, সরিষা ও তিল উৎপন্ন হয়। অপর দিকে, শহরের পূর্বদিকে পলিমাটি অঞ্চল দেখা যায়। এ অংশে বিস্তীর্ণ সমতল আবাদী ভূমি শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্বাঞ্চলীয় উপবিভাগ

পূর্বাঞ্চলীয় উপবিভাগ মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। বর্ষাকালে এর অধিকাংশ স্থান জলপ্লাবিত থাকে। ফলে পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় এর অধিকাংশ ভূমিই পলল মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত। এভাগের উত্তরাংশেই প্রধানতঃ লাল মৃত্তিকা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। মেঘনা নদীর সন্নিকটস্থ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত সমগ্র উচ্চভূমি অঞ্চলেও এই লাল-মাটি দৃষ্টিগোচর হয়। এই উপ-বিভাগে খুব কমই প্রাচীন বনাঞ্চল দেখা যায় এবং পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় এখানে অধিকতর চাষাবাদ পরিলক্ষিত হয়। এককালে এ অঞ্চল প্রাচীন সোনার গাঁয়ের অংশে ছিল। বর্তমানে এর অনাবাদী স্থানসমূহ ঝোপঝাড়ে আবৃত এবং এর ফাঁকে ফাঁকে ফলের গাছ, দীঘি ও মাটির ঢিপি দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, কোন এক সময়ে এ সমস্ত জায়গা ঘন বসতিপূর্ণ গ্রাম ছিল।

দক্ষিণাঞ্চল

দক্ষিণ বিভাগীয় অঞ্চল প্রায় ৮৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। জেলার এ অঞ্চলই সর্বাপেক্ষা উর্বরা। এর সীমানা—পূর্বে ইছামতী ও মেঘনা নদী, পশ্চিমে গঙ্গা নদী; উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আড়িয়েল খাঁ বা চড়ান জলাভূমি, আড়িয়েল খাঁ ও তুলসী গঙ্গার শাখানদীসমূহ এবং ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদী। দক্ষিণে ইহা বাকেরগঞ্জ থেকে একটি সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত

রয়েছে ; এই সীমানা অবশ্য খুব সুনির্দিষ্ট নয় এবং ইহা মেঘনার তীরবর্তী সিদ্দিকপুর অতিক্রম করে গঙ্গাতীরের মাছুয়াখালি হয়ে এর গতিপথে সিদ্দা, চাগঞ্জ ও দুবাই গ্রাম অতিক্রম করে রসুলপুর পরগণার খোসালবাগের মধ্য-দিয়ে চলে গেছে। এই সমগ্র অঞ্চলই উর্বরা পললভূমির অন্তর্গত। এর স্থানসমূহ বর্ষাকালে দু'থেকে চৌদ্দ ফুট পর্যন্ত গভীর জলে প্লাবিত থাকে।

ভূমিরূপ

এই বিভাগের উত্তরাংশের পার্শ্ববর্তী এলাকা—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত জাফরগঞ্জের সমতুল্য উচ্চভূমি এবং গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগ অপেক্ষা বেশ নীচু। বর্ষাকালের প্রারম্ভেই এ সমস্ত জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় এবং এই প্লাবিত অবস্থা পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা অধিক দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরিপূর্ণ বর্ষার সময়ে এ অঞ্চলের জলের গভীরতা আট থেকে চৌদ্দ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, কিন্তু নদীর তীরবর্তী এলাকায় সচরাচর জলের গভীরতা দুই হাতের অধিক দেখা যায় না। নদীর তীর আভ্যন্তরীণ অঞ্চল অপেক্ষা উঁচু হওয়াতেই এই পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্ষার পানি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব কথিত জায়গাসমূহে নতুন মাটির স্তর পড়তে থাকে এবং এ মাটি নদীর তীর থেকে অধিক দূর পর্যন্ত দেখা যায় না। প্রথমতঃ ভারী ও মোটা বালি ও কাদাপিণ্ড নদীর আশে পাশেই জমা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে, সিলিকা জাতীয় বালুকণা ও পচা-গলা উদ্ভিজ্জসমূহ ভাসমান অবস্থায় দেশের অভ্যন্তরে বাহিত হয়ে সেখানে প্রধানতঃ ভূ-ভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। এভাবে পূর্বে ঢাকা থেকে শুরু করে পশ্চিমে ফরিদপুর পর্যন্ত ৪০ মাইল এবং দক্ষিণে বিক্রমপুর থেকে শুরু করে জাফরগঞ্জ পর্যন্ত এবং সেখান থেকে উত্তর-পশ্চিমে নাটোর জেলা পর্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল বিস্তৃত—এই সমগ্র অঞ্চলই জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে জলমগ্ন হয়ে যায়। বছরের এই সময়ে এ অঞ্চল সবুজ ধানে ভরা বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে পরিণত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে নৌকা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করে। অদূরে নদীতীরে সারিবদ্ধ ও মনোরম বৃক্ষশ্রেণীর অবস্থান থেকেই নদীর গতিধারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। অন্যদিকে, সমতল ভূমির অভ্যন্তরভাগে ঘনবদ্ধ অসংখ্য গ্রাম পরিলক্ষিত হয়। এ সমস্ত গ্রাম বা বসতি-বাড়ীঘর কৃত্রিম উপায়ে মাটি ফেলে উঁচু করা হয়েছে—যাতে সেগুলোর 'ভিটি' বন্যার পানির উপরিভাগের চাইতেও উর্ধে থাকে। বর্ষাকালে দ্বীপ-

সদৃশ এ সকল বসতি-এলাকা ছোট আকারে ২/৩ রায়ত এবং তাদের গবাদি-পশু রাখার মত জায়গা, অথবা কয়েকটি গ্রাম ও বাগানবাড়ীসমূহ জুড়ে বেশ বড় আকারেরও হয়ে থাকে।

উত্তরাঞ্চলের পলল ভূমি অধিক পরিমাণে অভ্র ও সিলিকার সংমিশ্রণে গঠিত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার চরাঞ্চলের ভূমি তুলনামূলকভাবে গঙ্গার চরাঞ্চল অপেক্ষা শুষ্ক ও কম ঘনত্ববিশিষ্ট হয়ে থাকে। এই মাটিতে সিলিকা ও অভ্রের ভাগ অধিক এবং এঁটেল মাটির পরিমাণ কম থাকার দরুন ব্রহ্মপুত্র নদের পানি গঙ্গা নদীর পানি অপেক্ষা এত বেশী স্বচ্ছ বলে মনে হয়। প্রধানতঃ লৌহ আকর-যুক্ত মাটিই উত্তরাঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য। জেলার এ অংশে চুণ-মিশ্রিত মাটির প্রাধান্য দেখা যায় এবং এর দ্বারা স্থান বিশেষ এবং বানার ও বংশী নদীর তলদেশ গঠিত হয়েছে। কোথাও তলদেশের চতুষ্পার্শ্বেও এ মাটি দেখা যায়, আবার কোথাও বা সাদা এবং কালো মাটির কিছু অভ্যন্তরেও এ মাটি পরিলক্ষিত হয়। আবার অন্যত্র বিভিন্ন পরিমাণ গভীরতাবিশিষ্ট মাটির বিভিন্ন স্তরেই বেশ কিছুটা গাঢ় এবং বিস্তৃত কালো উদ্ভিজ্জ আস্তরণ দেখা যায়। এ মৃত্তিকা অনেকটা পিট কয়লার মত। দক্ষিণাঞ্চলের গভীর জলাভূমির তলদেশে পচা-উদ্ভিজ্জ মিশ্রিত সবুজ মাটির স্তর পরিলক্ষিত হয়। এগুলো শক্ত ও ঘনকৃষ্ণ বর্ণের হয়ে থাকে; এবং উহা এত মসৃণ যে গ্রামের লোকদেরকে এ মাটি বিচূর্ণ করে লেখার কালি প্রস্তুত করতে দেখা যায়। ফরিদপুরের সন্নিকটে বৃহদাকার হ্রদের ধারে কুপ খনন করার সময় প্রায় ৩০ ফুট অভ্যন্তরে এমাটি দেখা গেছে। উত্তর ভাগে সাদা, হলুদ ও নীল-এ তিন প্রকারের মৃত্তিকা দেখা যায়। ভূমির ১৫ ফুট অভ্যন্তর পর্যন্ত লাল কাঁকর মাটি দ্বারা শহরাঞ্চল গঠিত; এর নিম্নভাগে ৫/৬ ফুট স্তরের হলদে মাটি এবং এর পরে মসৃণ বালির স্তর পরিলক্ষিত হয়। নদীর গভীরতা ও পলল মৃত্তিকায় গঠিত উপরিস্তরের ঘনত্ব ভেদে ১৮ হতে ২২ ফুট গভীরে পানির সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরাঞ্চলে কিছু সংখ্যক ঝর্ণা আছে। মধুপুরের শেষপ্রান্ত কাঁকর অঞ্চলে, শহরের উত্তরে মির্জাপুরে এবং সম্ভবতঃ বারমিঁয়া বা পলাশে এরূপ ঝর্ণা আছে।

নদনদীসমূহ

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর শাখা-প্রশাখা দ্বারা এ জেলা বহুধাবিভক্ত। অসংখ্য নদী নালা অভ্যন্তর ভাগে জালের মত ছড়িয়ে আছে। রেনেল

সাহেবের ১৭৮০ সালের জরিপ অনুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, ঐ জেলার দক্ষিণাঞ্চলের কিছু সংখ্যক বৃহদকারের নদী উহাদের গতি পথের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে। এর ফলে যে সমস্ত ছোট-খাট নদী-নালা ও বিস্তৃত পলল ভূমির সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভূমিভাগের এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ, জেলার দক্ষিণাঞ্চলের স্থান-বিশেষেও (রেনেল সাহেবের মানচিত্রে প্রদর্শিত) অনুরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গঙ্গা বা পদ্মা এক জায়গায় জেলার পশ্চিম সীমা নির্দেশ করছে এবং এ জেলার চড়ান-জলা-ভূমিও কেদারপুর নালার সংযোগস্থল থেকে শুরু করে দক্ষিণে মাছুয়াখালী পর্যন্ত এ অঞ্চল ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলা দু'টিকে পৃথক করেছে। রেনেল সাহেবের বক্তব্য অনুযায়ী—গঙ্গানদী মেহেদীগঞ্জে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে, কার্যতঃ ঐ স্থানের বেশ কিছুটা উত্তরে বর্তমানে উহার বিপুল জলরাশি দু'টি পৃথক নদীর জলধারায় প্রবাহিত। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে প্রথমোক্ত যে নদীকে কালিগঙ্গা নামে অভিহিত করা হয়েছে, বর্তমানে তা কীর্তিনাশা বা শ্রীপুর নদী নামে পরিচিত। কীর্তিনাশা মলফৎগঞ্জ ও রাজনগরের অদূরে কিছুটা উত্তর দিক দিয়ে প্রবাহিত। এটাই গঙ্গার প্রধান শাখা। এর প্রশস্ততা ৩/৪ মাইল। রাজনগর খালের মোহনা এবং এর অপর তীরে অবস্থিত শ্রীপুর সংলগ্ন অগ্রবর্তী তীরভূমি—এ দুয়ের মধ্যবর্তী সর্বাপেক্ষা অপ্রশস্ত অংশে নদীর বেগ এত প্রবল যে, বর্ষাকালে সে স্থান দিয়ে ছোটখাট নৌকা নিয়ে যাতায়াত করা বিপজ্জনক। কীর্তিনাশা কার্তিকপুরের উত্তরে মেঘনার সহিত মিলিত হয়েছে এবং এর মধ্যবর্তী অঞ্চল (রেনেল সাহেবের মানচিত্রদৃষ্টে জয়রামপুর, কৃষ্টনাপুর ও পোমোমরা দ্বীপ সমূহ) বর্তমানে বালিশিয়া নামে বিস্তৃত সমভূমিতে পরিণত হয়েছে। গঙ্গার দ্বিতীয় বৃহৎ শাখাটির নাম নয়াভাঙ্গনী। এ নদীটি ঢাকা জেলার কোল ঘেঁসে বাকেরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। মাছুয়াখালীর নিম্ন দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এ নদী সাদেকপুরের (জেলার সীমা নির্দেশক একটি গ্রাম) সামান্য দক্ষিণে মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। প্রায় মাঝামাঝি গতি পথ থেকে উহা দু'টি বৃহৎ জলধারায় প্রবাহিত হয়ে বিস্তৃত সমতলভূমি অতিক্রম করে দাদপুরের নিকট পুনরায় মিলিত হয়ে লাইতু নদীতে মিশেছে। নয়া ভাঙনী নদী দৈর্ঘে প্রায় কীর্তিনাশার সমান। গঙ্গার মূল শাখা গৌরনদী থেকে বরিশাল ষ্টেশনের (রেনেলের মানচিত্রে যে ভাবে এর গতিপথ প্রদর্শিত হয়েছে) সন্নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত গ্রীষ্মকালে প্রায়

শুকিয়ে যায়, এবং উহা বহুলাংশে পললভূমির ড়া পড়ে বর্তমানে প্রায় ভরাট হয়ে গেছে। অবশ্য, এর মাঝে মাঝে 'চত্বর' বা অগভীর জলমগ্ন স্থান দিয়ে এবং কিছু সংখ্যক খাল-নালা দিয়ে ছোট আকারে নৌকা যাতায়াত করে থাকে।

ব্রহ্মপুত্র ঃ টোক্ নামক স্থান থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ এ জেলার উত্তর-পশ্চিমের সীমা নির্দেশ পূর্বক প্রবাহিত হয়ে—সিলেট সমভূমি হতে উৎপন্ন মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। বর্ষাকালে প্রস্থে এ নদীপ্রায় দু'মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে থাকে। কিন্তু বছরে প্রায় চার মাস কাল পার ওপার হেটে পার হওয়া যায় এবং স্থান বিশেষে প্রায় শুকিয়ে যায়। এঃসময়ে ঝিনাই, বংশী ও বানার নদী দিয়ে এর অধিকাংশ জল প্রবাহিত হয়ে যা।

মেঘনা ঃ মেঘনা নদী (টলেমীর বর্ণনায় এর নাম মাগুর) ঢাকা এবং এর পূর্ব দিকে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলার সীম নির্দেশ করছে। উত্তরে গারো ও কাছাড় পাহাড় হতে অসংখ্য উপনদী এং পূর্বে কাছাড় ও সিলেট হতে মনিপুরকে বিচ্ছিন্নকারী পাহাড়ী অঞ্চল থেকেনির্গত অসংখ্য জল স্রোতের সম্মিলিত প্রবাহে এ নদীর সৃষ্টি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কিছু পূর্বে, এর বিস্তৃতি প্রায় এক মাইল এবং নদীটি এখানে বেশ গভীর। মেঘনা নদীর অববাহিকা অঞ্চল প্রায় ৬০০০ বর্গ মাইল। যে বিপুল পরিমাণ জল এই সীমাবদ্ধ অববাহিকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে তা সম্ভবতঃ বঙ্গ-ভারতের যে-কোন নদীর চাইতে বেশী। ব্রহ্মপুত্রই এ জেলার অন্যান্য নদী সমূহের প্রধান উৎস।

ঝিনাই বা যমুনা ঃ জামালপুর সেনানিবাসের অদূরে ব্রহ্মপুত্রের দু'টি শাখা বের হয়ে দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত হয়েছে এবং চৌদ্দ মাইল প্রবাহিত হয়ে এ দু'টি ধারা পুনরায় মিলিত হয়ে প্রশস্ত আকার ধারণ পূর্বক ঝিনাই বা যমুনা নামে প্রায় ৫০ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। পরে এ নদী দু'টি শাখায় বিভক্ত হ'য়ে একটি ভুবনেশ্বরী নামে জাফরগঞ্জে গঙ্গার সহিত মিলিত হয়েছে এবং বৃহত্তর শাখাটি কনাই ও লৌহজং এর সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্মিলিত স্রোত ধারা ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হয়েছে।

ধলেশ্বরী ঃ একদা ধলেশ্বরী গঙ্গানদীরই শাখা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি ঝিনাই নদীর জলধারায় পরিপুষ্ট। এ নদী পূর্ব দিকে গতি পরিবর্তন করে গৌরিখালি নালার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। রেনেলের বর্ণনায় এই নদীটিকে স্বল্প-পরিসর বলা হয়েছে, কিন্তু বর্তমানে এটি বর্ষাকালে প্রস্থে দু'মাইল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বুড়ি গঙ্গা ঃ বুড়িগঙ্গা পূর্বে গঙ্গানদীরই মূল ধারা ছিল। বর্তমানে এটি ধলেশ্বরীর শাখা বিশেষ। প্রায় ২২ মাইল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে এ নদী পুনরায় ধলেশ্বরীর সঙ্গেই নারায়ণগঞ্জের সামান্য উত্তরে মিলিত হয়েছে।

শহরের অবস্থান ঃ ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান জল নির্গমন পথ। ঢাকা শহর শেষোক্ত নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত। এখন তা' অতীতের গঙ্গার পূর্বতীরের পরিবর্তে ব্রহ্মপুত্রের দু'টি শাখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পড়ে গেছে।

বংশী নদী ঃ এ জেলার উল্লেখযোগ্য অন্যান্য নদী হচ্ছে বংশী, বানার শীতলক্ষা ও ইছামতি। জামালপুরের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র হতে বংশী নদীর উৎপত্তি হয়েছে। কাঁকর মাটির মধ্য দিয়ে প্রবহিত হয়ে আটিয়া বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এটি ক্রমাগত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে সাভারের নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ জেলার মাঝারী ধরনের নদীসমূহের মধ্যে বংশীই সব চাইতে দীর্ঘ। উৎপত্তিস্থল হতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এটি দৈর্ঘে ১০০ মাইল।

বানার নদী ঃ বানার নদী ব্রহ্মপুত্র ও শীতলক্ষা নদীদ্বয়কে সংযুক্ত করেছে। উত্তরাঞ্চলের শক্ত কাঁকর মাটি এ নদীর গভীর তলদেশের সৃষ্টি করেছে। কোথাও কোথাও এ নদী ৫০ ফুটের চাইতেও অধিক গভীর।

শীতলক্ষা ঃ শীতলক্ষা নদী, এর পানির স্বচ্ছতার জন্যে শীতল (রৌপ্য সদৃশ) লক্ষা নামেও অভিহিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ দেশের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ নদী সমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরস্থ সারগদী হতে একডালা পর্যন্ত এই নদীর প্রাথমিক গতিপথ গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকিয়ে যায়, কিন্তু একডালাতে বানারের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর থেকে নারায়ণগঞ্জের নিকট ইছামতির সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত এ গতিপথটি সারা বছরব্যাপী নাব্য থাকে।

ইছামতী ঃ ইছামতি গঙ্গার শাখা নদী। এটি গঙ্গা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্তী নিম্নভূমি দিয়ে আঁকা-বাঁকা গতিতে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। পরে এটি (বর্তমান নাম ইলশামারী) চড়ন খালের মোহনার বিপরীতে ইছামতির সঙ্গে মিলিত হয়েছে, এবং ঐ সম্মিলিত স্রোত দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে একটির নাম তুলশী গঙ্গা। রেনেল সাহেবের মানচিত্রে এটিকে একটি ছোট্ট নদী হিসেবে দেখানো হয়েছে। কিন্তু, বর্তমানে এটি ইলশামারীর

প্রধান শাখা। অপর শাখাটি ইছামতি নাম ধারণ করে পাটেরগোটার নিকট ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী, এবং শীতলক্ষার সম্মিলিত স্রোত ধারাকেও ইছামতি নামে অভিহিত করা হয়। এ নদী পাটেরগোটা হতে কয়েক মাইলের ব্যবধানে ফিরিঙ্গি বাজারে মেঘনার সহিত মিলিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালে অমাবশ্যা পূর্নিমাতে এতে দু' হতে চার ফুট পর্যন্ত জোয়ার ভাঁটা হয়ে থাকে এবং শহর থেকে বিশ মাইল পর্যন্ত এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। লক্ষা নদীতেও একডালা পর্যন্ত অনুরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়ে থাকে। গঙ্গার পানি বৃদ্ধির পূর্বেই মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি বাড়তে শুরু করে এবং জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের আগে প্রায়শই পানির সর্বোচ্চ সীমার মাত্র কয়েক ফুটের ব্যবধানে চলে আসে। অপর দিকে, ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখায় মিলিত হওয়ার পূর্বে গঙ্গা নদীতে তখন ৩/৪ ফুটের অধিক জল থাকে না। আসাম ও সিলেটের পাহাড়ে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে সঞ্চিত জলরাশি অজস্রধারায় প্রবাহিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় নদী সমূহে এর ফলে দ্রুত জলস্ফীতি দেখা যায় এবং কখনও কখনও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য ঐ একই রকম গতিতে জল আবার নেমেও যায়।

জলবায়ু

মে জুন মাসে দক্ষিণা বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বারিপাত না হলে এর পরের মাসের মাঝামাঝি অথবা শেষার্ধে সাধারণতঃ পূর্বাঞ্চলীয় নদীতে পানি বৃদ্ধি পায়।

এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক হতে বায়ু প্রবাহিত হয়। শেষোক্ত মাসে মৌসুমী ঋতু শেষ হওয়ার সাথে সাথে বায়ু-প্রবাহের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। কখনও বা উত্তর দিক, কখনও বা পশ্চিম দিক আবার কখনও বা পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বায়ুপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। এ মাসের শেষের দিকে মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা পূর্ব দিক হতে প্রবল বায়ু প্রবাহ অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে থাকে। সবচেয়ে আরামপ্রদ, অপর দিকে সবচেয়ে নিষ্প্রভ এ দু' ধরনের আবহাওয়া মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ কালেই অনুভূত হয়। এ বায়ু প্রবাহিত হয় পূর্ব দিক হতে।

এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই মাসে সাধারণতঃ দিনের প্রথমার্ধে এবং রাত্রিকালে শান্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু প্রবাহ নদীনালার উপর দিয়ে

অতিক্রম করার জন্য এতে প্রচুর জলীয় বাষ্প সংমিশ্রিত থাকে। ফলে বছরের এসময়ে উত্তাপ অনেকাংশে প্রশমিত হয় এবং অন্যান্য ঋতুর তুলনায় তা' অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও মনোরম থাকে। পূর্বদিক হতে প্রবাহিত বায়ুর প্রভাবে এ সময়ে বৃষ্টিপাত তত হয় না। যদি ঝড়ো হাওয়াও বয়ে যায় তবে তা'ও প্রায়শঃ ঐ একই দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং তা উত্তর-পূর্ব দিকে দিক-পরিবর্তন করে নিকটবর্তী পাহাড়ে বাধা প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে আগত বায়ুর প্রভাবেই সাধারণতঃ এ অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং এ বায়ু কদাচিৎ ঝড়ো হয়ে থাকে।

নভেম্বর হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বায়ু উত্তর, পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। প্রথমতঃ এ বায়ু পশ্চিম দিক হতে প্রবাহিত হয়, এবং পরে শীতল বায়ু প্রবাহের সাথে সাথে এর গতি পরিবর্তন করে কিছুদিন যাবৎ উত্তর দিক হতে বইতে থাকে। এর পর গতি পরিবর্তিত হয়ে কখনও বা উত্তর-পশ্চিম আবার কখনও দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে এ বায়ু প্রবাহিত হতে দেখা যায়। নিম্নের তালিকায় বিগত ১১ বছরের বায়ুপ্রবাহের অবস্থা সন্নিবেশিত করা হলো।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষার্ধে সাধারণতঃ বারিপাতসহ কালবোশেখীর ঝড় শুরু হয়ে থাকে এবং এর পরের দু'তিন দিন পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব দিক হতে বায়ুপ্রবাহ দেখা যায়।

সুবৃহৎ নদী সমূহ ও অসংখ্য বিস্তীর্ণ জলাশয়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত জলকণা সম্পৃক্ত বায়ু উত্তপ্ত আবহাওয়াকে বহুল পরিমাণে প্রশমিত করে এবং এর ফলে বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা এখানকার আবহাওয়া কিছুটা ঠাণ্ডা অনুভূত হয়।

বিগত দশ বছরের সর্বোচ্চ ৯ মাসের গড়পড়তা উত্তাপ নিম্নরূপ ছিল ঃ

এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগষ্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
৮৫·৩৮	৮৭·৩৯	৮৬·১৬	৮৬১৮	৮৫·৪৬	৮৮·৩৪	৮৩·৭৫	৭৬·৭৯	৭২·২৫

প্রতি বছরের ১৫ই জুলাই তারিখে প্রতি ঘণ্টা হিসেবে পাঁচ বছর পর্যন্ত সেই তারিখের দৈনিক গড়পড়তা তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয়েছে ৩·৪৪ এবং বিগত চার বছরে ১৫ই জানুয়ারীর প্রাত্যহিক গড়পড়তা উত্তাপ ছিল ১৫·৪৩।

নিম্নের তালিকা থেকে দিবা ভাগের ৫টি বিভিন্ন সময়ের ঐ বছরগুলোর গড়-পড়তা উত্তাপ পাওয়া যায় ঃ

বছর	র্যোদয়	বেলা ১০ ঘটিকায়	দুপুরে	বেলা ৩ ঘটিকায়	বিকেলে
১৮৩২	৭০'৯	৭৫'৭	৭৮'৪	৭৯'২	৭৮'২
১৮৩৩	৭০'১	৭৬'২	৮০'২	৮১'৬	৮০'১
১৮৩৪	৭০'২	৭৭'৪	৮০'৬	৮১'২	৭৯'১
১৮৩৫	৭০'০০	৭৬'৩	৭৯'১	৮০'৮	৭৮'৩
১৮৩৬	৬৯'৭	৭৬'২	৭৮'৬	৮২'১	৭৯'৭

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেই বছরের সবচেয়ে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া পরি-লক্ষিত হয়। এ সময়ে বাতাস সাধারণতঃ হাল্কা ও গতিপরিবর্তনশীল হয়ে থাকে। বায়ু তখন বেশ আদ্র থাকে ও বাষ্পীভবন কার্য অতিমাত্রায় পরি-লক্ষিত হয়। উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা প্রকার অসুখ-বিসুখ দেখা যায়। শীতঋতুতে রাত্রিকাল সাধারণতঃ নিষ্প্রভ এবং অস্বস্তিকর বলে মনে হয়। কখনও কখনও আকাশ উন্মুক্ত ও শুষ্ক থাকে এবং এ সময় রজনীতে স্বল্পগভীর 'চিতান' পাত্রে রক্ষিত পানি জমে বরফ হতেও দেখা যায়। মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে অধিক মাত্রায় বাষ্পীভবন হতে থাকে এবং এ সময়ে প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহও এই কাজে বিশেষ সহায়ক হয়ে থাকে। থার্মোমিটারে কয়েক বছরের শুষ্কতা ও আদ্রতার সর্বোচ্চ গড়পড়তা পার্থক্য দেখা যায় ২১। বায়ুর আদ্রতাই বঙ্গ-দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরই প্রভাবে দেশের এই অংশে ঘন বনাঞ্চল ও উদ্ভিদরাজি শোভা বিস্তার করেছে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে এখানে কুয়াশা সৃষ্টি ও শিশির পড়া নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। ফেব্রুয়ারী মাসে কাল বৈশেখীর সুচনা হয়ে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কমবেশী বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। ১৮২৭ থেকে ১৮৩৪ সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলের গড়পড়তা বৃষ্টিপাত নিম্নরূপ ছিল ঃ

মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর
৩'৬	৭	৯'৬	১২'	৯	১২'৫	১০'৮	৬'৮

এ সময়ের বাৎসরিক সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন ও গড়পড়তা বৃষ্টিপাত ছিল যথাক্রমে ৯৩'৯ ইঞ্চি, ৪৬' ৮ ইঞ্চি ও ৭০'৩ ইঞ্চি।

মার্চ মাস থেকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়া অবধি ঘন ঘন বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয় এবং মাঝে মাঝে তা প্রচণ্ড হয়ে থাকে। শিলাবৃষ্টি ও ঘূর্ণিঝড় এ ঋতুতেই পরিলক্ষিত

হয়। শিলাবৃষ্টি সময়ে সময়ে ফসলের সমূহ ক্ষতি সাধন করে থাকে ; বিশেষ করে আউস ধান ও 'স্যাফ্রন্' (জাফরান) গাছের ক্ষতির কারণ হয়। জলবায়ু প্রসঙ্গে ভূমিকম্পের বিষয়ও উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সাধারণতঃ ভূ-কম্পন মৃদু আকারের হয়ে থাকে। কখনও কখনও তা প্রবলভাবে অনুভূত হয় এবং জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১৭৬২ সালের এপ্রিল মাসে এ অঞ্চলে যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল, তাতে মেঘনার পূর্বতীর ধরে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। ঢাকা জেলাতে নদীনালা ও বিল-ঝিল প্রবলভাবে আন্দোলিত হয়ে এ গুলোর জলরাশি স্ফীত হয়ে যায়। পানি সরে গেলে সেই সকল উচ্চভূমিতে অনেক মরা মাছ এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। নিম্নভাগের ভূমিস্তর থেকে একটা তীব্র আওয়াজসহ ভূ-কম্পন এত প্রবল হয় যে বেশ কিছু সংখ্যক বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণ ধ্বসে যায় এবং এর ফলে প্রায় ৫০০ লোক প্রাণ হারায়। নোয়াখালী জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরের ১৫ মাইল এলাকা জুড়ে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল সমস্ত লোকজন ও গবাদিপশুসহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় যায়।[১] ১৭৭৫ এবং ১৮২২ সালেও প্রবল ভূমিকম্প হয়। শেষোক্ত সালের ১০ই এপ্রিল ও ১১ই মে শহরের ও তেজগাঁওয়ের[২] বেশ কিছু সংখ্যক সরকারী দালান-কোঠা ও অন্যান্য বাড়ী ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

১ "East Indian Chronologist" দ্রষ্টব্য।
২ জেলার নথিপত্র (রেকর্ডস)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[জীব–জন্তু–উদ্ভিদ–খনিজ দ্রব্য ।]

জীব-জন্তু

কয়েকটি ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে দেশের এই অংশের জীব-জন্তু গাঙ্গেয় বদ্বীপের অপরাপর অংশের অনুরূপ। এই জেলার দুই অংশের প্রাকৃতিক গঠনে যেমন বিরাট পার্থক্য বর্তমান তেমনি জীব-জন্তুর বৈচিত্র্যও সুস্পষ্ট। উত্তরাংশে সাধারণতঃ শিকারী প্রাণী এবং বিভিন্ন প্রকারের চতুষ্পদ প্রাণী বাস করে। দক্ষিণাংশে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম। এখানে জলচর পাখী, সরীসৃপ আর বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রাধান্য। দুগ্ধপায়ী (Mammalia) শ্রেণীতে নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলোর উল্লেখ করা চলেঃ সিমিয়া সারকোপাইথিকাস (Simia cercopithecus) জাতীয় বানর সাধারণতঃ শহরের আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় আর ফলের বাগান ধ্বংস করে। গণ কেইরোপটেরার (Cheiroptera) অন্তর্গত চারটি প্রজাতি দেখা যায়, এগুলো হচ্ছে (১) হার্ডউইকের ডাইসোপিজ মুরিনাস (Dysopes murinus) বা সাধারণ বাঁদুড়। চালা ঘরের ছাউনীতে এরা বাস করে। (২) টেরোপাস রাউসেটি (Pteropus roussette) বা উড়ন্ত শেয়াল (flying fox): ভাট, পিপুল আর তেঁতুল গাছের ছায়া-ঢাকা শাখা-প্রশাখা হচ্ছে এদের প্রিয় বাসস্থান। গোধূলি-লগ্নে এরা খাদ্য সংগ্রহে বেরোয় এবং কলা ও অন্যান্য ফলের গাছে ঘুরে বেড়ায়; এদের ধ্বংস-যজ্ঞ বানরের চেয়ে কম নয়। (৩) ম্যাগাডারমা (Magaderma): এই বাদুড় অন্যান্য প্রজাতির বাদুড় থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র। এদের সম্প্রসারিত বহিঃকর্ণদ্বয় ঠিক মাথার উপরিভাগে সংযুক্ত থাকে। এছাড়াও এদের নাসা অস্থির ওপরে পাতা আকৃতির পাতলা পর্দা থাকে। এদের লেজ নেই। ওপরের রঙ ইঁদুরের রঙের মত আর নীচের গাত্র বর্ণে থাকে একটা হাল্‌কা আভা। অন্যান্য বাদুড়ের মত এদের স্তন বক্ষ-ফলকের কাছে অবস্থিত নয়, বরং রিনোলফি

(Rhinolphi) গোত্রের মত বক্ষস্থলের মধ্যভাগে অবস্থিত ; স্তনবৃন্ত সাধারণতঃ বক্ষস্থলের উপরে দেখা যায়। ম্যাগাডারমা সাধারণতঃ শহরের আশেপাশে পরিত্যক্ত মন্দিরে আর জঙ্গলে শুকনো গর্তে বাসা বাঁধে (৪) ভেসপারটিলিও-পেকটাস (Vespertilio pectus) বা পিনাটের ডোরাকাটা বাদুড় (striped bat of Pinnat) ঃ রমনীয় এই ক্ষুদে বাদুড়গুলো জঙ্গলের অভ্যন্তরভাগে সচরাচর দেখা যায়। জঙ্গলে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে এই ছোট প্রাণীগুলো উড়ে বেড়ায়। দূর থেকে এগুলোকে প্রজাপতি বলে ভ্রম হতে পারে। মনোরম কমলা রঙের পশমে এদের অতি চমৎকার দেখায়। এই বাদুড়ের আরেক নাম কমলা-বাদুড়। ডানাগুলো কালো রঙের, কালোর ওপর থাকে হলদে রঙের ডোরা। মণিবন্ধ থেকে এই ডোরাগুলো শুরু হয়ে ক্রমে হালকা হয়ে আঙ্গুলের পাশ দিয়ে ছোট ছোট ফোটার আকারে সংযুক্ত পর্দায় ছড়িয়ে পড়ে। এ অঞ্চলে কস্তুরী ইঁদুর বা ধূর্ত সোরেক্স্ ইণ্ডিকাস (Sorex indicus) বেজী, গন্ধ গোকুল (খাটাশ) (Vivera bengalensis) প্রভৃতি প্রাণী সচরাচর দেখা যায়।

উত্তরাংশের জঙ্গল বাঘ এবং চিতাবাঘ অধ্যুষিত। বন্যা আর অনাবৃষ্টির সময় এরা গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এদের ধ্বংস করার জন্য সরকার পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হতো। মোগল আমলে বাঘ শিকারের জন্য জায়গীর বরাদ্দ করা হতো। এদের পীড়া-পীড়ির ফলে ১৭৭১ সালে সরকার পুনরায় এ ব্যাপারে অনুমোদন দান করেন এবং জমিদারদের লোক সরবরাহের নির্দেশ দেন। ১৮০৩ সালে সরকারী পুরস্কারের জন্য মোট ২৭০ টি বাঘের চামড়া শহরে আনা হয়েছিল। কিন্তু পুরস্কারের জন্য ধার্য অঙ্ক থেকে পাঁচ টাকা কমানোর ফলে এই সংখ্যা নেমে গিয়ে বছরে গড়ে ৩৫টিতে দাঁড়িয়েছিল। আর বিগত তেরো বছরে সামগ্রিকভাবে অনধিক একশত বারো জন পুরস্কার গ্রহণ করেছে। এই অঞ্চলের শিকারীগণ বাঘ শিকারে সাধারণতঃ বিষ মাখানো তীর ব্যবহার করতো। উইলিয়ামস এর "ফিল্ড স্পোর্ট্স্ অব ইণ্ডিয়া" (Field Sports of India) বই থেকে জানা যায় যে বন্য শুয়োরের সংখ্যাও বড় কম ছিল না, আর অন্যান্য পশুদের-তুলনায় সম্ভবতঃ তারাই ফসলের সর্বাধিক ক্ষতি সাধন করতো। উত্তরাংশের জংগল, বিশেষ করে আটিয়ার পরগণা ছিল হাতীর বাসভূমি। এই বিরাটকায়

জীবগুলো প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে হানা দিয়ে গাছপালা ও ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করতো। হাতীগুলো এ-অঞ্চলেরই আদি বাসিন্দা, কিন্তু অনেক সময় পোষা হাতীও জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে এদের সংখ্যা বাড়িয়েছে। কাশিম আলীর শাসনকালে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শৈথিল্য আসে, অনেকেই কাশিমপুর এবং ভাওয়াল পরগণা ছেড়ে চলে যান। ১৭৯১ সালে সরকারী ব্যয়ে কাশিম-পুরে একটি খেদা তৈরি হয় এবং ২১ টি হাতি ধরা হয়। সরকারী হিসাবে জানা যায়, একমাত্র চট্টগ্রাম থেকেই বছরে ৮০ টি হাতি ধরা হতো আর সেখান থেকে সেগুলো কাশিমপুর ডিপোতে আনা হতো। গড়ে প্রায় ২০০ টি হাতি এই কেন্দ্রে জমা হতো। ছোট ছোট বাচ্চাসহ স্ত্রী হাতীই সাধারণতঃ ধরা পড়তো। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে কয়েক বছর পূর্বে একটি মৃত গর্ভবতী হাতীর জরায়ু নিরীক্ষণের সুযোগ হয়েছিল। হাতীর জরায়ু দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট (double), প্রতিটি কক্ষে একটি করে কর্ণু থাকে, কর্ণুর মুখে ফেলোপিয়ান টিউব (fallopian tube) লাগানো থাকে। এর ডিম্ব অনেকটা আয়তাকার আর অমরা দিয়ে দুই ভাগে বিভক্ত। অমরা (placenta) দেখতে অনেকটা বেল্টের ন্যায়, যা ডিম্বকে আটকে রাখে। প্লাসেণ্টা, ভ্রূণ-পর্দা আর অন্যান্য পর্দার গঠনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সে সবের আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। ধড়ের তুলনায় ভ্রূণের মাথা কিছুটা পেছনের দিকে হেলান থাকে। ভ্রূণের অংশসমূহ, বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের অরিকল দুটোর মধ্যবর্তী ফোরামেন ওভেলি (farame ovale) আর থাইমাস গ্রন্থি পূর্ণ বিকশিত ছিল। থাইমাস গ্রন্থি ত্রিভুজাকৃতির, সামনের মেডিয়াস্টিনাম (anterion mediastinum) সম্পূর্ণরূপে এর দ্বারা অধিকৃত। সাদা তরলে পূর্ণ অসংখ্য কোষ সমন্বয়ে এই গ্রন্থি গঠিত। জরায়ু আর অমরার (Placenta) ওজন ছিল প্রায় ১৩৬ পাউণ্ড; ভ্রূণের ওজন ছিল ২২ পাউণ্ড এর মত, কাজেই গর্ভবতী জরায়ুর সর্বমোট ওজন ছিল ৩৪৮ পাউণ্ড।

হরিণ

উত্তরাংশের জঙ্গলে হরিণের চারটি প্রজাতি সচরাচর দেখা যায়। এগুলো হচ্ছে—গোস হরিণ (Gous deer) সারভাস হিপপেলাপাস (Cervus hippelaphus), সাম্বু (Sumbu), সারভাস এরিসটোটিলিজ (Cervus aristotelis) অথবা "ব্ল্যাক রুশা অব বেঙ্গলি" (Black Russa of Bengali), ডোরা যুক্ত হরিণ, সারভাস একজিস্ (Cervus axis) এবং হগলা বা মুনজ্যাক সারভাস মুণ্টজ্যাক (Cervus muntjack)। শেষোক্ত প্রজাতিটি বাংলায়

খুব কম দেখা যায়, এর কণ্ঠস্বর অনেকটা কুকুরের মত। তাই স্থানীয় শিকারী-দের কাছে ডাক-হরিণ (Barking Deer) নামেই ইহা সমধিক পরিচিত। এদের উপরের চোয়ালের শ্বাদন্ত (Canine teeth) অনেকটা বাইরে বেরিয়ে থাকে, আর মাথার উপরে ডাঁটার মত কতগুলো উপাঙ্গ থাকে; এই উপাঙ্গের উপরই শিংয়ের অবস্থান। এই ডাঁটার ন্যায় বস্তুটি মুখের সাথে প্রায় একই লাইনে অবস্থান করে। আর এর উপরে দুটো আলিতে বিভক্ত হয়ে যায়, ললাট আর নাসা অস্থির কাছাকাছি অংশে তারা সংযুক্ত হয়। শিং ক্বচিৎ তিন ইঞ্চির বেশী লম্বা হয়, দুই আলির মাঝখানে কপালের ওপর চামড়ার দুটো খাঁজ থাকে। এই চামড়ার খাঁজে কস্তুরী জাতীয় সুগন্ধি দ্রব্য থাকে; কস্তুরীর জন্য নেপালের মুনজ্যাক্ কস্তুরী-মৃগ নামেই সমধিক পরিচিত। গাছতলায় পড়ে থাকা আমলকী, আম ও পেয়ারা প্রভৃতি ফলই এদের খাদ্য। এছাড়া দীর্ঘ দাঁত দিয়ে এরা ছোট ছোট শেকড় তুলে খায় বলেও জানা গেছে। উত্তরাঞ্চলে হরিণ সর্ষে আর তিলের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। ভাওয়াল অঞ্চলের কৃষকগণ কুকুরকে হরিণ শিকারের তালিম দেয়। হরিণ শিকারের জন্য জমিদারগণ সাধারণতঃ বড় বড় জালের ফাঁদ ব্যবহার করেন। হরিণ শিকারের একটা চমকপ্রদ পদ্ধতি এখানে প্রচলিত আছে। এই শিকারে বাঁশ ও মাদুর দিয়ে তৈরি একটা ঝুড়ি বা ডালা ব্যবহৃত হয় বলে এ ধরনের শিকারীদের নাম "ডালা শিকারী"। ঝুড়ির প্রস্থচ্ছেদ্ ৪ ফুটের মত। খুব হালকা করে তৈরী হয় এটা। ঝুড়িটিতে কাদা মাটির প্রলেপ দেওয়া থাকে, মাঝখানে থাকে মশাল রাখার জন্য ছোট একটু জায়গা। মশাল স্থাপন করে ঝুড়িটি হ্যাটের মত মাথায় দিয়ে শিকারী জঙ্গলের পথে অগ্রসর হয়, তার হাতের ঘণ্টা অবিরাম ঝংকার তুলতে থাকে; ঝুড়ির ছায়ার অন্তরালে দু-তিন জন অস্ত্র সজ্জিত লোক তাকে অনুসরণ করে। ঘণ্টা ধ্বনি আর মশালের চোখ ঝলসানো আলোর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে হরিণ ক্রমেই শিকারীদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং বিমোহিত হয়ে একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ফলে অতি সহজেই শিকারীদের নাগালে এসে যায়। ডালা শিকারীগণ বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্র পাঠ ও অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে থাকে। জলাভূমির আশে পাশে বন্য-মহিষ দলে দলে ঘুরে বেড়ায়, শেয়াল আর খেঁক-শেয়াল শহরের আশে পাশের জঙ্গলে দেখা যায়। মেঘনার পূর্বাংশে খরগোস

পাওয়া যায়না বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু খরগোস, কালো খরগোস বা শশক (লেপাস হিসপিডাস অব পিয়ারসন, Lepus hispidus of Pearson), বাণ্ডিকুট ইঁদুর, শজারু প্রভৃতি এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কালো খরগোস বা শশক আর হার্ড উইকের লেপাস সাইনেসিস (Lepus sinesis)-এর মধ্যে মিল বিশেষ লক্ষনীয়। উত্তরাংশে প্রচুর কালো খরগোস পাওয়া যায়। স্থানীয় এবং ইউরোপীয় শিকারীগণ প্রায়ই খরগোস শিকার করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ খরগোসের মাংস খায়, কিন্তু কালো শশককে তারা অশুচি মনে করে। বাণ্ডিকুট ইঁদুর ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। তারা ক্ষেতের ধান নিয়ে মাটির নীচে তাদের কুঠরীতে সঞ্চয় করে এবং এই সব কুঠরীর সাথে বাইরের জগতের যোগাযোগ রক্ষার জন্য মাটি খুঁড়ে পথ তৈরী করে। গরীব গ্রামবাসীগণ প্রায়ই এই সব ইঁদুরের বাসার সন্ধান করে, আর এক একটা বাসা থেকে অনেক সময় ১ মণ থেকে ২ মণ ধান পেয়ে থাকে। শজারু হিষ্টিক্স ক্রিস্টাটার (Histix cristata) বাসভূমি হলো বাগান আর গ্রামের আশে পাশের উঁচু ঢিবি। বাণ্ডিকুট ইঁদুরের মত এরাও মাটি খুড়ে বাসা বাঁধে আর আখ, লাউ, কুমড়া, কচু প্রভৃতি নষ্ট করে। এরা বাঁশ গাছের শেকড়ও নষ্ট করে ফেলে। গর্তের মুখে খড়ের ধোঁয়া দিয়ে শজারুকে তার আশ্রয় থেকে তাড়ানো হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকেরা শজারুর মাংস ভোজন করে থাকে। শজারুর কাঁটা অনেক প্রকার কাজে ব্যবহৃত হয়। চিরুণী ও গহনাপত্র তৈরীর কাজে আর কান ফোড়ানোর জন্যও এই কাঁটা ব্যবহার করা হয়। ভালুক উরসুজ নাইজার (ursus niger) উত্তরাংশের উঁচু পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে। ভোঁদড় বা উদ্‌বিড়াল (otter), লুটরা ভালগ্রেইজ (Lutra vulgrais) দেশের নদীগুলোতে বাস করে। এদের পার্থক্য গাত্র বর্ণ নিয়ে—কোনটা হালকা বা ধূসর বর্ণের কোনটা বা গাঢ় খয়েরী রঙের। ভোঁদড় সব কটি নদীতেই দেখা যায়, তবে ফরিদপুর, ময়মনসিংহ আর সিলেটের নদীগুলোতে এদের সংখ্যা একটু বেশী। নদীতীরে সাধারণতঃ জল থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে ভোঁদড় তার আশ্রয় তৈরী করে, আর এক একটি আশ্রয়ে একসাথে প্রায় ১২-১৫টি ভোঁদড় বাস করে। চামড়ার জন্য প্রতি বছর বহু সংখ্যক ভোঁদড় হত্যা করা হয়। এই চামড়া ভুটান এবং চীন দেশে

রপ্তানী করা হয়। ভোঁদড়কে গর্ত থেকে বাইরে নিয়ে আসার জন্য অন্য একটা শিক্ষিত পোষা ভোঁদড়কে কাজে লাগানো হয়। এভাবে তাকে গর্তের বাইরে এনে গারুড়ীগণ বল্লম দিয়ে এগুলোকে হত্যা করে। হালকা রঙের ভোঁদড়কে জেলেরা মাছ তাড়িয়ে জালের মধ্যে নিয়ে আসার কাজে তালিম দেয়। দেশের নদীগুলো শুশুক বা প্লাটামিস্‌টা গানজেটিকা (Platamista gangetica) অধ্যুষিত। গারুড়ীগণ শীতকালে শুশুক শিকারে লিপ্ত হয়। ভোঁদড় আর শুশুক শিকারই এদের প্রধান পেশা। তারা শুশুকের মাংস ভোজন করে আর এর তেল জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে অথবা গ্রাম্য ডাক্তারদের কাছে বিক্রি করে দেয়। শুশুকের তেল বাত-রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পাখী

পাখীর মধ্যে বহু সংখ্যক প্রজাতি এই অঞ্চলে সচরাচর দেখা যায়। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এই অঞ্চলেও শকুন, কাক, চিল আর ঈগলের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। স্ট্রিক্‌স্‌ ক্যানডিডাস্‌ (Strix candidus) আর স্ট্রিক্‌স্‌ নোকচুয়া ইণ্ডিকা (Strix noctua indica) এই দুটো হলো এই অঞ্চলে পেঁচার সব চেয়ে সাধারণ প্রজাতি।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত এখানকার অধিবাসীগণও এই পাখীগুলোকে ভীতির চোখে দেখে, এদের বাসার সন্নিকটে উপস্থিত হওয়ার অর্থই হলো সমূহ অমঙ্গলের আশংকা। প্যাসারিন (Passarine) বা ইনসিজরিয়াল শ্রেণীর প্রজাতিগুলোর মধ্যে মাছরাঙ্গা বা আলসেডো (Alcedo) হলো সবচেয়ে সাধারণ। দোয়েল পাখীও এই শ্রেণীরই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রজাতির দুটো রকম হচ্ছে নীল এবং লাল রঙের মাছরাঙ্গা। এ দুটোই তাদের চামড়ার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। শীতকালে মগ উপজাতীয়গণ এই অঞ্চল এবং বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলায় এই পাখী শিকারে লিপ্ত হয়। পাখীগুলোকে ফাঁদে ফেলার জন্য খাঁচায় করে একটা পোষা মাছরাঙ্গা তারা সাথে রাখে। এর দেহ রোদে শুকিয়ে নানা প্রকার ধারক পদার্থের সাহায্যে তারা রপ্তানীযোগ্য চামড়া প্রস্তুত করে এবং প্রচুর পরিমাণে তা চীন দেশে প্রেরণ করে। সেখানে এই চামড়া থেকে রাজকর্মচারীদের পোশাক তৈরী হয়। মাছরাঙ্গার সাথে

সম্পর্কিত আরেকটি প্রজাতি হচ্ছে মেরোপস্ ভাইরিডিস (Merops viridis) বা মৌমাছি-খেকো। প্রজাতিটি এই জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে দেখা যায়। এই পাখীটিও নদীতীরে বাসা তৈরি করে। নচট-বিল (Notched-bill) গোত্রের দুটো প্রজাতি দেখা যায়, এরা হলো মোটাচিল্লা পাইকাটা (Motacilla pica-ta) এবং সিল্ভিয়া সিউটোরিয়া (Sylvia sutoria) বা টেলর বার্ড। এই পাখীটি বাসা তৈরীতে এর অনুপম স্থাপত্য প্রতিভার জন্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেনুইরোসট্রিস (Tenuirostres) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সারথিয়াডি (Certhiadoe) বা ক্রীপার পাখি (Creepers) এবং সিনিরিডু বা সান বার্ড, তাদের অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সারথিয়া পুরপুরাটা এবং সারথিয়া অবসকিউরা (Certhia obscura) হলো সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতি। শেষের-টিকে হিন্দুগণ দুর্গাপূজায় উৎসর্গ করে। তাই এর সাধারণ নাম হলো দুর্গাটুন-টুনি। সিনিরিডু (Cinnyridoe) বা মধুচোষার দুটো প্রজাতি। দক্ষিণ-আমে-রিকার ট্রাকিলিডু (Trochilidoe) বা হামিং পাখীর মত এরা উজ্জ্বল ঝলমলে পালকের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই পাখীগুলো ফুলের আশেপাশে উড়ে বেড়ায় আর মধু পান করে। অধিবাসীরা এই ছোট আর সুন্দর পাখীগুলোকে খাঁচায় রেখে পালন করে এবং ময়দা ও মধু খেতে দেয়। কনিরোসট্রিজ (Conirostres) বা শংকু চঞ্চু (conical beak) গোত্রের পাখীগুলোর মধ্যে প্লাসিয়াস (Plocius) বা বাবুই পাখী সর্বাধিক পরিচিত। এরা দোদুল্যমান বাসা তৈরী করে। লম্বা গাছের সাথে নদীতীরে কিংবা জলাভূমির কিনারায় নল খাগড়ার সাথে এই বাসাগুলো ঝুলতে দেখা যায়। এদের স্থানীয় নাম হলো ভুই পাখী। ধানের ক্ষতিকর পাখীদের মধ্যে বাবুই পাখী একটি। কাঠ ঠোকরার প্রজাতিগুলো হচ্ছে ঃ পিকাস ভাইরিডিস (Picus viridis), পি, টিগা (P. tiga), পি, এ্যামানটিয়াস (P. amantius), পি, মেসী (P. mecei), পি, বেংগালেনসিস (P. bengalensis), আর পি, রুফাস (P. rufus)। শংকু চঞ্চু গোত্রের অপরাপর প্রজাতিগুলো কুকুলাস লেথামী (Cuculus lathami), কু, অরিয়ে-ণ্টালিস (C. orientalis), কোরেসিয়াস বেংগালেনসিস (Coracias benga-lensis), কোরভাস কোরাক্স (Corvus corax) আর দোয়েল বা গ্রাকুলা রিলিজিওসা (Gracula religiosa)। এখানে সবুজ তোতার দুটো রকম (varicty) দেখা যায়। হিন্দুগণ এগুলোকে দেবতার নাম উচ্চারণ করতে শিক্ষা দেয়। এ বিশেষ তোতাগুলো সিলেট এবং ত্রিপুরা থেকে আনা হয়।

গ্রালাটোরিজ (Gralatores) বা দীর্ঘপাদ জলচর পাখী (Waders) গোত্রের মিশ্র প্রজাতিগুলো জেলার উভয়াংশের জলাভূমি অঞ্চলে পাওয়া যায়। যেগুলো অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে এসে বর্ষার আগমনের সাথে সাথে চলে যায় সেগুলো হচ্ছে প্লেটাটোয়া (Platatoea) বা স্পুনবিল (Spoon bill) বা চামচে ঠোঁঠা, আরডিয়া এন্টিগনি (Ardea antigone) বা সিরিজ (Siris) সিকোনিয়া লিউকোসেফালিয়া (Ciconia leucocephalia) বা মানিকজোড় এবং সি, মাইটেরিয়া অস্ট্রেলিজ (C. myeteria austrelis)) । বকের পাঁচটি প্রজাতি এখানে দেখা যায়ঃ আরডিয়া অরিয়েণ্টালিজ (Ardea Orientalis) বা ভারতীয় সাদা বক, আরডিয়া মডেসটা ((Ardea modesta of Gray) বা ধবধবে সাদা বক, আরডিয়া নেগ্রিওরোসট্রিজ (A. negriorostris) বা কালো চঞ্চু বক এবং আঃ ফ্লেবিয়াকোলিস (A. flaviacollis) বা হলদে-গলা বক। এরা গাছে বাসা তৈরি করে। 'অক' নামের এক রকম বক আছে সেগুলো নিশাচর। সিকোনিয়া আরগেলা (Ciconia argala) বা হাড়গিলা এই জেলায় অতি পরিচিত, তবে শহরাঞ্চলে এর বড় একটা দেখা মিলে না। নয়ন লোভনা পাখী চীনা-জেকোনা (Chinese jacana) বা প্যারা সাইনেনসিস (Para sinensis) জলাভূমির বাসিন্দা। যেখানে শাপলা গাছ প্রচুর জন্মে সেখানেই এরা বাসা করে। শাপলা পাতায় অসংখ্য কীট জন্মে আর এই কীট গুলোই হচ্ছে জেকানার অতি প্রিয় খাদ্য। লম্বা ধানের ডাটা বাঁকিয়ে জট পাকিয়ে শাপলা-পাতার ওপর এরা বাসা তৈরি করে। পরফাইরিও সুলতানা (Porphyris sultana) বা বেগুনি গেলিনুল ও (Gallinule) জলাভূমির বাসিন্দা। এদের সংখ্যা খুব বেশী, আর এরা ফসলের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে। জঙ্গলের মধ্যে কোন খাদের কাছে মাটি খুড়ে তারা বাসা তৈরি করে। কোন একটা কলিম পাখী (এ পাখীর স্থানীয় নাম) মারা গেলে বা আহত হলে দলপতি মৃত দেহটি কোন আশ্রয়স্থলে পৌঁছে দেয়। কলিমের ডিম দেখতে মুরগীর ডিমের মত। এক রকম গেলিনুল কোড়া নামে পরিচিত; কপালে লালরঙের পর্দা আর হলদে ঠোঁট এদের বিশেষত্ব। মুসলমানগণ কোড়াকে যুদ্ধ শিক্ষা দেয়। একটা ভাল শিকারী কোড়া ১৫ থেকে ২০ টাকায় বিক্রি হয়। যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এই পাখীর ডাক খুব অদ্ভুত। গলা ফুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গভীর ফাঁপা শব্দ উৎপন্ন করে, এর পরেই আমেরিকার ট্রামপিটার পাখীর

মত হঠাৎ তীব্র কাঁপুনী বিশিষ্ট শব্দে সবাইকে সচকিত করে তোলে। কোড়ার-স্বরযন্ত্র কেটে পরীক্ষা না করলেও এর গঠন যে অনেকটা ট্রাম্‌পিটার পাখীর মতই তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। এ অঞ্চলে নিম্নোক্ত পাখীগুলো সচরাচর দেখা যায়ঃ ফুলিকা ক্রিস্‌টাটা (Fulica cristata) বা ঝুটিধারী কুট, ক্যারাড্রাস ভেনট্রালিস (Charadrus ventralis) বা টিট্টিভ পাখী (Spur-winged plover) এবং কাদা খোঁচা (Scolopax gallingo) কুক্কুট জাতীয় পাখীর মধ্যে রয়েছে ফ্লোরিকান ওটিস হনথুরা (Florican otis honthoura) ময়ূর, চকোর বা তিত্‌ পাখী, কোয়েল, কোটারনিক্‌স্‌ এর (Coturnix) তিনটা প্রজাতি আর বন কবুতর।

লিপ্তপাদ (Palmipedies) পাখীদের মধ্যে রিন্‌কপ্‌স্‌ নাইগ্‌রা (Ryncops nigra) বা কাঁচি-চঞ্চু অতি পরিচিত পাখীগুলোর একটি; প্রতিটি বড় নদীতে একে দেখা যাবে ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য তীক্ষ্ণ চঞ্চুর সাহায্যে জলে স্কিমিং করছে। পানি মোরগের মত কাঁচি-চঞ্চু পাখী বালুচরেই ডিম দেয়।

পেলিকানাস অনোক্রাটুলাস (Pelicanus onocratulus) বা পেলিকানকে অধিকাংশ জলাভূমিতেই দেখা যায়। বিভিন্ন প্রকার মাছ যেমন কই, খলসে প্রভৃতি ধরার জন্য ফাঁদ হিসেবে এই পাখীটি ব্যবহার করা হয়। এদের চামড়ায় এক প্রকার তেল জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই তেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন প্রকার মাছ এর অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। এই উদ্দেশ্যে কৃষকগণ বর্ষার আগমনে পেলিকান পাখী ধরে আর শীত কালে এদের মুক্ত করে দেয়। ফাঁদ হিসেবে পাখীগুলোকে নৌকার সাথে বেঁধে রাখা হয়। মাঝে মাঝে মাছ ধরার মৌসুমে কৃষকগণ নিষ্ঠুরভাবে সেলাই দিয়ে এদের চোখ বন্ধ করে রাখে। জলাভূমিগুলোতে প্রায়ই পেলিকানের আর একটা প্রজাতি দেখা যায়। এই প্রজাতিটি সিরিস (siris) এবং অন্যান্য বকের সাথে দেশান্তরী হয়ে আসে। এর রঙ ধবধবে সাদা, তবে বুকের ও পাখার নিচের পালক আর অক্ষিগোলক পাটলবর্ণের। এদের চামড়া থেকে তেল নিঃসৃত হয় না। এই সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট স্পুনবিল বা চামচে ঠোঁটার মত একেও 'রোজিয়েট' (Roseate) বা 'লোহিত' নামে সনাক্ত করা চলে। প্লটাস ভেলেনটি বা বর্শাধারী (Darter) যুক্তপাদ পাখীকে প্রায়ই নদী তীরে ঝুলন্ত বৃক্ষশাখা অথবা জেলেদের

বাঁশের মাচানে শিকারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখা যায়। এ্যানাটিডি বর্গের (Anatidae) সবচেয়ে সাধারণ প্রজাতিগুলো হচ্ছে: এ্যানাস ইণ্ডিকা (Anas indica) বা ডোরা-মাথার হাঁস, এ্যানাস ক্লাইপিয়াটা (Anas clypeata) বা Shoveller, এ্যানাস ক্রিকা (Anas crecca) বা সাধারণ বালি হাঁস, আর এ্যানাস গিরা (A. girra) বা গিরা বালি হাঁস। স্থানীয় বাসিন্দাগণ শেষোক্ত প্রজাতিটিকে বালিহাঁস বলে। এরা সাধারণতঃ প্রাচীন মঠ আর ভাঙ্গা দালানে বাসা বাঁধে। এছাড়াও এখানে প্রচুর আন্‌সার ইণ্ডিকাস (Anser indicus) পাওয়া যায়।

সরীসৃপ

পাখীর তুলনায় সরীসৃপের প্রকারভেদ অপেক্ষাকৃত কম। কিলোনিয়ান (Chelonian) বর্গের কচ্ছপদের মধ্যে এমিস হামিলটনী (Amys hamiltoni) বিশেষ সুপরিচিত। এর খোলস আয়তাকার, শক্ত ও ধূসর; পাগুলো হলদে দাগ বিশিষ্ট। ট্রাইনিক্সন-এর চারটি প্রজাতি দেখা যায়। এদের মধ্যে ট্রাইনিক্স গেনজেটিকাস (T. gangeticus)-এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এর শক্ত আবরণের চারপাশে নমনীয় কোমলাস্থি থাকে; এর লিপ্তপদ ধূসর বর্ণের এবং মাথা জলপাই আকৃতির (Olivaceous)। এই কচ্ছপগুলো অতিশয় পেটুক; এরা নদীতে নিক্ষিপ্ত জীব-জন্তুর মৃতদেহ ভোজন করে। অন্যান্য যে সব প্রজাতি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে ট্রাইনিক্স্ সাবপ্লানাস (Trinix subplanus) বা প্রশস্ত নরম জাতের কচ্ছপ। ট্রাইনিক্স্ পাংটেটাস্ (T. punctatus) এটিও নরম কচ্ছপ। এর মাথায় সাদা ডোরাকাটা থাকে। ট্রাইনিক্স্ ইণ্ডিকাস (Trinix indicus) এই কচ্ছপের রঙ সবুজ তবে এর গায়ে বিক্ষিপ্ত সাদা সাদা ডোরা থাকে। জেলেরা বাজারে কচ্ছপ বিক্রি করে। হিন্দু অধিবাসীগণ কচ্ছপের মাংস খায়। সুরিয়ান রেপটাইলদের (Surian reptiles) মধ্যে নদীতে অসংখ্য কুমীর আর বিশেষ করে বড় বড় গেড়িয়াল (Garial) বাস করে। স্টেলিও গেক্কো (Stellio gecko) বা সাণ্ডা, লোফিরাস এগামিডিস (Lophyrus agamoides) বা গিরগিটি, লেসারটা স্কিন্‌কাস্ (Lacerta scincus) বা ভেমানি সেম্প (Bhamanee samp), সাধারণ মনিটর, মনিটর পালশের (Monitor palcher) প্রভৃতি প্রাণীগুলো বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের জঙ্গলে পাওয়া যায়। সানডা বা

গেক্‌কো স্ফীত দেহী, চোখ বড় বড়, বিক্ষি (tubercles) লালচে গোলাকার এবং বিক্ষিপ্তভাবে সাদার মাঝে ছড়ানো। পায়ের আঙ্গুলের নীচে চামড়ায় আড়াআড়ি ভাঁজ আছে, যা তলকে আঁকড়ে ধরতে সাহায্য করে। এই প্রাণীর গলায় দুটো ছোট থলে আছে। থলে দুটোতে খড়ি-গোলা পানির মত সাদা তরল পদার্থ থাকে। একটা প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করার সময় এর খানিকটা আমার হাতে লেগে যায় এবং পরিণামে একটা ছোট ফোস্কা দেখা দেয় ; সেই সাথে সমস্ত বাহুতে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়।

সর্প বর্গের অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত প্রজাতিগুলো সচারাচর দেখা যায়। অনেক পাইথন টাইগ্রিস শহরের আনাচে-কানাচে জঙ্গলে বাস করে। এই সাপ লম্বায় প্রায় বিশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ওফিডিয়ান সরীসৃপের শিরা বিন্যাস বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোপেন হেগেনের জ্যাকোবসন যে বর্ণনা দিয়েছেন, এই প্রজাতিতে তা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। এখানে ভেনা পোর্টা শুধুমাত্র এবডোমিন্যাল ভেইন দিয়েই তৈরি হয়নি, এর বহিঃ মাংসপেশী এবং মেডুলা স্পাইনালিজও রয়েছে, যার ফলে পরিপাকতন্ত্র স্নায়ুতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এ থেকে সাপের খাদ্য ভক্ষনের নিষ্ক্রীয়তা সুপরিস্ফুট। টিফ্‌লোপ্‌স্‌ লুমব্রিকেলিজ (Typhlops lumbricalis) সাধারণতঃ পাললিক মাটিতে পাওয়া যায়। এদের কেঁচো বলে ভুল করা অসম্ভব নয়। এই সাপ লম্বায় কখনো কখনো এক ফুটের মত আর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের মত মোটা হয়, দেহের আঁশগুলো একটি অপরটিকে সামান্য ঢেকে রাখে। এদের চোখ অতি ক্ষুদ্র আর লেজ মাথার মতই মোটা হওয়ায় অনেক সময় দুই-মাথার সাপ নামে পরিচিত। পাইথন টাইগ্রিস আর টিফ্‌লোপ্‌স্‌ লুমব্রিকেলিজ সাপে বিষ থাকেনা। সচরাচর দৃষ্ট অন্যান্য প্রজাতিগুলো হচ্ছেঃ কলুবার ঢুম্‌না (Coluber dhumna) (নির্বিষ), কলুবার গ্যালাথিয়া (C. gaia-thaea), কলুবার মোয়েজট্রিস (C. moestris), মেরেমের ড্রাইনাস (Dryinus of Merrem) অথবা রাসেলের কলুবার নাসেটাস (C. nasatus of Russel)। শেষোক্ত এই সাপটি সরু আর লম্বা, নাকের প্রান্তে ছোট সুচালো উপাঙ্গ আছে। মেরেমের ডেনড্রোফিজ বা রাসেলের ক্যাটেনুলেটাস (Dendrophis of Merrem or C. caterulatus of Russel), মেরেমের কোফিয়াস্‌ ভাইরিডিস্‌ (Cophias viridis of Merrem) বা রাসেলের বুডুপার (Boodoapeur of Russel)—

এইগুলো বিষাক্ত সাপ। এদের বাস কচু ক্ষেতে। কচু গাছের সাথে এদের গাত্র বর্ণের আশ্চর্য মিল রয়েছে। মেরেমের নেট্রিক্স্ স্টোলেটাস্ (Natrix tollatus) বা লিনের কলুবার ফেসিয়েটাস্কে পিঠের দুটো সাদা লাইন আর আড়া আড়ি কালো দাগ দেখে সনাক্ত করা যায়। হাইড্রোফিজ অব্স্কিউরাস (Hydro phis obsercus) আর হাঃ নাইগ্রোসিংটাস্ (H. nigrocinctus) এই প্রজাতি দুটো দানাগ্নি নামে পরিচিত। মৌসুমের শুরুতে মেঘনায় এদের দেখা যায়, আর প্রায়ই জেলেদের জালে এরা ধরা পড়ে। হাইড্রোফিস হলো সত্যিকার জল সাপ। এদের লেজ চেপ্টা ; দেখতে অনেকটা বাইন মাছের মত। এই সাপের আঁশগুলো ছোট, কালো অথবা ধূসর বর্ণের। এই সাপের ফুস্ফুস্ লেজের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত, যেখানে এটা অতি পাতলা পর্দার মত। অন্যান্য সাপের ন্যায় ফুস্ফুস্ শিথিল অবস্থায় পেটের কুঠরীর মধ্যে ঝুলে থাকেনা, বরং পর্দার যোজন দিয়ে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত থাকে। বায়ু থলের ন্যায় ফুস্ফুস্ সাঁতারে সাহায্য করতে পারে।' হাইড্রোফিস লবণাক্ত পানি ছাড়া বাঁচে না বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে তা সত্য নয়। কারণ উভয় প্রজাতিকে মিঠা পানিতে দু'মাসেরও বেশী জীবিত অবস্থায় খোলস পাল্টাতে দেখেছি। হাইড্রোফিস্ বিষাক্ত সাপ রঙীন নাগ বা কোব্রা ডায়সেফালো (Cobra dicephalo) খুব কম দেখা যায়। বর্ষার শুরুতে অথবা বন্যার সময় সাপের প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় তারা আশ্রয়স্থল ত্যাগ করে উঁচু স্থানে কৃষকদের বাড়ীর আশে পাশে চলে আসে এবং বহু সংখ্যক সাপ কৃষকদের হাতে মারা পড়ে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সর্প দংশনে ছাপ্পান্ন জন লোক মারা যায়। সাধারণ ব্যাঙ আর হাইলা (Hyla) বা গেছো ব্যাঙ হলো এই অঞ্চলের দুটো মাত্র ব্যাট্রাশিয়ান প্রজাতি।

নানা প্রকার মাছ

নদীতে প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন প্রকারের মাছ পাওয়া যায়। রে (Ray) বা শাপলাপাতা , রাইয়া ফ্লুভিয়াটিলিস (Raïa fluviatilis.) এবং সাধারণ হাঙ্গর বা স্কোয়ালাস ক্যারক্যারিয়াস (Squalus carcharias) প্রভৃতি মাছ মেঘনা ও গঙ্গা নদীর গভীর পানিতে দেখা যায়। ১৮৩৬ সালের শীতকালে ঢাকার বিশ মাইল উজানে মেঘনার মোহনা থেকে একশত বিশ মাইল দূরে

একটি জলাভূমিতে দশ ফুট লম্বা একটা তিমি মাছ শিকার করা হয়েছিল। স্কোয়ালাস প্রিসটিস বা করাত মাছ বসন্তকালে বড় নদীতে দেখা যায়। আমি সবচেয়ে বড় পাঁচ ফুট লম্বা করাত মাছ দেখেছি। জেলেরা হাঙ্গর আর রে মাছকে কুমীরের চেয়েও বেশী ভয় করে। রে মাছ তার লেজের অগ্রভাগের কাঁটা দিয়ে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে; এমনকি এর ফলে মৃত্যু ঘটা অসম্ভব নয়। গণ-টেট্রোডন (Tetrodon) এর দুটো প্রজাতি টেট্রোডন পোটকা (Tetrodon Potca) আর টেট্রোডন কুট কুটিয়া (T. cutcutia) বাজারে পাওয়া যায়। বিষাক্ত টেট্রোডন টেপাও এই অঞ্চলে দেখা যায়।

অস্থিবৎ মাছের অ্যাপোডিস (Apodis) বর্গের প্রজাতিগুলো হচ্ছে: ম্যারিনা (Maraena), ম্যাক্রোগনেথাস্ (Macrognathus), ওফিসুরাস্ (Ophisurus) এবং ইউনিব্র্যাংকাপারচুরা (Unibranchapertura)। প্রথমোক্ত মাছ বাজারে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু ম্যাক্রোগনেথাস্ বা বাইন মাছ সুলভ। নিউট্রিক্যাপারচুরা জলাভূমি ও খাঁড়িতে বাস করে। এদের দেহ নলাকৃতি; প্রায় দুই ফুট লম্বা। লেজের দিকে চাপা আর মাথাটা ছোট এবং গলার চেয়েও সরু। এদের গায়ের রঙ লাল, তবে পিঠে বিক্ষিপ্ত হলদেটে রেখা আছে, কিন্তু বুকের নিম্নাংশ তেলতেলে। মাঝে মাঝে সাদা বা খয়েরী রঙের কুচিয়ার সাক্ষাৎ মেলে। কয়েক বছর পূর্বে মাটি খুঁড়ে একটা খয়েরী কুচিয়া পাওয়া গিয়েছিল। কারনিওলা হ্রদের তলদেশের ধূসর বর্ণের প্রোটিয়াস্ এ্যাংগুইনাস্ (Proteus anguinus) এর মত আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ায় এদের রঙ হালকা। কুচিয়ার শ্বাসতন্ত্র এবং রক্ত পরিবহনতন্ত্র অদ্ভুত। এদেরকে উভচর প্রাণীর সাথে তুলনা করা চলে। ফুলকার ঝিল্লিতে জলীয় শ্বাস ক্রিয়া অতি সামান্যই হয়, আর ইহা প্রধানত প্রথম ও দ্বিতীয় খিলান (arches) এর সাথে যুক্ত থাকে। এই অভাব পূরণের জন্য গলার দুই পার্শ্বে একটি করে ছোট পাতলা থলে আছে, যা মুখ গহ্বরে প্রবিষ্ট হয়েছে। কুচিয়া পানির উপরে উঠে এই থলে বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে। একটি পূর্ণ-স্ফীত থলে দেখতে আখরোট দানার মত। এই থলের বাতাস দীর্ঘ সময় পানির নীচে ব্যবহার করা চলে। মাছে সাধারণতঃ ফুস্কা-শিরা হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দ থেকে উৎপন্ন হয়ে ফুস্কা বা শ্বসন ঝিল্লি সমূহে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু কুচিয়ার ক্ষেত্রে এই শিরা আংশিক ভাবে এই অঙ্গ সমূহে এবং আংশিকভাবে শ্বসন

থলেতে ছড়িয়ে আছে। দুটো বড় শাখা কোন শাখা-প্রশাখা বিস্তার না করে একত্রে যুক্ত হয়ে মহাধমনী সৃষ্টি করেছে। কিছু রক্ত অক্সিজেনের সংস্পর্শে না এসেই প্রবাহিত হয়। ঝিল্লি ধমনীর বাল্বের মধ্যে পারদ অন্তক্ষেপ করে শিরার এই বণ্টন প্রমাণ করা যায়। বদ্ধ-জলাশয়ের কর্দমাক্ত গর্তের অনেক গভীরে কুচিয়া লুকিয়ে থাকে। এরা অতি মন্থর ও নিস্তেজ, পক্ষান্তরে বাইন মাছের সজীবতা চমকপ্রদ। থোরাসিক বর্গের অন্তর্ভুক্ত গোবিয়স (Gobios), অফিওসেফালাস্ (Ophiocephalus), কইয়াস্ (Coios), ট্রাইকোপোডাস (Trichopodus), ল্যাবরাস্ (Labrus), বোলা (Bola) আর চান্দা (Chanda) প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে দেখা যায়। অফিউ মেফালাস্ লাটা, কইয়াস্ কবোজিয়াস্ আর ট্রাইকোপোডাস্, খলিসা প্রভৃতি মাছ সব জলাশয়েই পাওয়া যায়। পত্রবিন্যাসের ন্যায় সজ্জিত অতিরিক্ত শ্বসনাঙ্গ থাকায় এরা কঠিন জীবন ধারণে সক্ষম এবং পানি ছাড়া অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে। কই ও খলিসা মাঝে মাঝে ডাঙ্গায় পাওয়া যায়; মনে করা যায় যে, এরা মেঘ থেকে পড়েছে। মার্চ এবং এপ্রিল মাসে জলাশয় শুকিয়ে গেলে মাছগুলো দলে দলে নতুন জলাশায়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলে তারা রওয়ানা হয়, আর অনেক সময় পানি থেকে দূরে মাঠের মধ্যে পাওয়া যায়। কানসার তীক্ষ্ণ খাঁজের সাহায্যে মাটি আঁকড়ে ধরে আর লেজের মাংস পেশীতে ঝাক্ড়ানি বা সংকোচন সৃষ্টি করে এরা এগিয়ে চলে। এই দেশান্তর অভিযানে কোন কোনটা আধা মাইল পর্যন্ত পাড়ি দেয়, কতগুলো আবার পাখীর কবলে পড়ে তাদের উদর পূর্তি করে। ফলে এদের অর্ধেকও গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারেনা। এই জিলায় প্রচুর পরিমাণে বোলাপমা পাওয়া যায় আর সামান্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অধিবাসীদের খাদ্য তালিকায় স্থান লাভ করে। বর্ষাকালে বড় বড় বোলা পমা বাজারে সুলভ। এদের মাথার উপরের বিভিন্ন প্রকার কুঠরীর ব্যবহার জানা যায়নি। কুঠরীগুলো পরস্পর যুক্ত আর এদের মধ্যে কিছুটা জলীয় পদার্থ থাকে। টর্পেডো বা এই জাতীয় অন্যান্য মাছের সাথে এর সম্ভবতঃ কোন মিল নেই। এ্যাবডোমিন্যাল (Abdominal) বর্গ সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়। এর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতিতে যথেষ্ট প্রকারভেদ আছে। ম্যাকরোপটেরাস মাগুর (Macropterous magur) প্রচুর পাওয়া যায়। এদেরও অতিরিক্ত শ্বসনাঙ্গ

(arborescent organ) রয়েছে। গন শিলুরাস্-এর বহু প্রজাতি আছে। শিলুরাস্ সিংগিও (Silurus singio) অনেকটা মাগুর মাছে মত ; এরও অতিরিক্ত শ্বসনাঙ্গ আছে। শ্বসন যন্ত্রের পরিপূরক হিসাবে মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুটো নালা আছে। মাগুর, সিং, খলিসা আর কই একত্রে একই জলাশয়ে বাস করে আর স্থল অভিযানে কম বেশী অংশ নেয়। বোয়াল সমস্ত বাংলায় এবং বিশেষ করে এই জেলায় প্রচুর পাওয়া যায়। এরা খুব বড় হয় আর নদীর পেটুক মাছের মধ্যে এই মাছ একটি। বোয়াল মাছের চোয়াল প্রশস্থ, মুখের খিলান উপবৃত্তাকার, কতকটা হাঙ্গর মাছের মত। ভিতরে ধারালো বক্র দাঁতের পাটি। এই মাছ পিত্তধারী। অন্যান্য যে সব প্রজাতি সচরাচর দেখা যায় তা হচ্ছে, সিলুরাস্ পাব্দা (Silurus pabda), শিলুরাস্ গেরুয়া। গণ পাইমেলোডাস্ (Pimalodus) এর মধ্যে আছে, পাঃ এ্যায়োর বা পাংগাস ; পাঃ টেংরা, পাঃ বাতাশিয়া (P. batessia), পাঃ রিতা (P. rita) পাঃ বাঘারিয়া (P. bagharia), পাঃ গাগোর (P. gagaré) আর পাঃ সিলোনা ডিয়া (P. silondia)। শেষের প্রজাতিটি বড় নদীতে গভীর পানিতে বাস করে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ইসোকস্ কাউসিলা (Esox Caucilla) বেশী পাওয়া যায়। এই মাছের তীক্ষ্ণ দাঁতে সজ্জিত চোয়াল চামড়া কেটে ফেলতে পারে। মিউজিল করসুলা বা আন্দারী বা মুলেট নদীতীরের কাছাকাছি অগভীর পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ে বেড়ায়। শীতকালে এই মাছের বাজার বেশ গরম। পলিনেমাস্ রিসুয়া (Polynesmus risua) বা তপসে মাছ এপ্রিল-মে মাসে প্রচুর পাওয়া যায় ; এই মাছ স্বাদ ও আয়তনের বিচারে নিকৃষ্ট মানের। এই মাছে সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন সাতটি লম্বা পেক্টোরাল রে (Pectoral ray) আছে, যা লিউস্ সিলিয়ারিস (Lews ciliaris) এর ন্যায় গাছের গুঁড়ি বা শেওলা আকড়ে ধরে এবং খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে।[১] এই তন্তুগুলো বড় নাড়ী বহন করে, যা পঞ্চম নাড়ীর একটি শাখার সাথে মেডুলা স্পাইনালিজের শাখা যুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে। এরা কানুসার গোড়ায় জড়িয়ে উভয় পার্শ্বে একটি করে প্লেক্সাস্ তৈরী করেছে। এই প্লেক্সসাস্ প্রত্যেক রে-তে একটা করে শাখা উৎপন্ন করে। ক্লুপিয়া ফ্যাসা (Clupea phasa) বা ভারতীয় হেরিং গঙ্গা এবং মেঘনার মোহনায় পাওয়া যায় এবং বর্ষা শেষে বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়।

১ Sir Clarles Bill's "Treatise on the Hand."

হিলসা আর ক্লুপ্যানাডোন ইলিসা (Clupanadon ilisha) পাওয়া যায় প্রচুর ; আকারে বড় আর স্বাদে অতুলনীয়। বর্ষাকালে গঙ্গানদীতে এই মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এই সময় প্রজননের জন্য এরা নদীতে আসে এবং জালে ধরা পড়ে। লবণ দিয়ে এই মাছ সংরক্ষণ করা হয় এবং বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া হয়। মিস্টাস্ চিতালা (Mystus chittala) আর মিসটাস্ রামকরাতি (M. ramkarati) নদী ও পুকুরে পাওয়া যায় এবং বাজারে সুলভ। গ্রামবাসীদের প্রধান আমিষ জাতীয় খাদ্য তালিকায় এই প্রজাতিগুলো অন্তর্ভুক্তঃ কইয়াস কবযোথিয়াস্ (Coius cobjojeus) টুকোপোডাস্ কলিসা (Tuchopodus colisha), শিলুরাস সিন্গিও (Silurus singio) আর মিস্টাস্ মাগুর (Mystus magore)। অন্যান্য বৃহদায়তন প্রজাতিগুলোর মধ্যে আছে সাইপ্রিনাস রোহিতা (Cyprinus rohita) বা রুই, সাইপ্রিনাস্ কাতলা (C. catla), বা কাতল, সাইপ্রিনাস কালবাসিয়া (C. culbasia) বা কালিবাউস, আর সাঃ পুটিটরিয়া (C. putitoria) বা পুঁটিমাছ এগুলো কয়েক ফুটের বেশী লম্বা হয় না। এদের কানসা দিয়ে চিরুণী তৈরী হয়। হেমিলটনের একরকম সাইপ্রিনাসকে পুঁটি বলা হয়। শীতকালে এই মাছ প্রচুর পাওয়া যায়। এই মাছ সিদ্ধ করে তেল পাওয়া যায়। এই তেল সাধারণতঃ গরীব মুসলমানগণ জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে। টাকায় পনের সের পর্যন্ত এই তেল বিক্রি হয়। বেশ কিছু পরিমাণ তেল কোলকাতায় রপ্তানী করা হয়। এ্যাবডোমিন্যাল বর্গের বিভিন্ন মাছ যেমন, ইসোকস্, পলিনেমাস্, (Polynemus) আর মিউজিল (Mugil) মাছে শ্রবনেন্দ্রিয় ও ও এয়ার ব্লাডার বা বায়ুথলের মধ্যে অদ্ভুত সংযোগ রয়েছে। সাইপ্রিনাস্, শিলুরাস্, পাইমেলোডাস্, ম্যাকরোপটেরোনটাস্ (Macropterontus) আর কবিটিস (Cobitis) প্রভৃতিতে ম্যামালের ন্যায় কতগুলো অসিকুলা (Ossicula) দ্বারা এই সংযোগ রক্ষিত হয়। এই মাছগুলোর মধ্যে এয়ার ব্লাডারের আকৃতি ও গঠনগত পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা এত ছোট যে চলাফেরায় কোন সাহায্য করে না। ; যেমন পাইমেলোডাস্ বাঘারিয়া মাছের ওজন যেখানে ১০ পাউণ্ড, সেখানে এয়ার ব্লাডার দুটো এক একটি মটর দানার মত। বোলা পোমা, মিসটাস্ চিতালা আর ক্লুপ্যানাডন ইলিসায় এয়ার ব্লাডারের লম্বা নল দিয়ে এই সংযোগ রক্ষিত হয়। এয়ার ব্লাডার শ্রবনেন্দ্রিয়ের সাথে প্রায় মিশে গেছে, যদিও একটা পাতলা পর্দা এদের পৃথক

করে রাখে। মিসটাস্ করস্থলা আর ক্লুপ্যানাডন ইলিসার মধ্যে পরিপাক তন্ত্রের গঠন প্রণালীতে সাদৃশ্য আছে, যেমন পাকস্থলী গোলাকার, মাংসপেশী যুক্ত যা খাদ্য বিচূর্ণকের কাজ করে। পাকস্থলীতে বালু থাকে যা খাদ্য চূর্ণ করতে সাহায্য করে। পাকস্থলীর পাতলা আবরণীতে যথেষ্ট মিউকাস্ আছে; পাইলোরাসের (pylorus) চারদিকে সিকার (coecal appendages) সংখ্যা অনেক। ক্লুপ্যানাডোন ইলিসায় খাদ্যনালীতে মিউকাস মিশ্রণের জন্য ব্রোংকিয়াল খিলানের পেছনে দুটো থলে আছে। এই মাছের মুখের মধ্যে কোমলাস্থির সূক্ষ্ম প্রাচীর থাকে। ইহা ছাকুনীর ন্যায় সূক্ষ্ম ফুলকাগুলোকে বালুর সুরসুরি থেকে রক্ষা করে। বৈধ সীমানার মধ্যে মাছ ধরার অধিকার জমিদারের হাতে ন্যস্ত। মৎস্য খাতে তাদের আয় নির্ভর করে মৌসুমের উপর। অক্টোবর থেকে মে মাস পর্যন্ত জেলেকে প্রতি মাসে নৌকা পিছু ১ থেকে ৫ টাকা পর্যন্ত দিতে হয়। এই কর জলাশয়ের সীমার উপর নির্ভরশীল। বর্ষাকালে এই হার কমে গিয়ে চার আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত হয়। পানি কমে গেলে এক একটি জলাশয় ৫ থেকে ৫০০ টাকায় বিক্রি হয় আর প্রায়ই জেলেগণ যৌথভাবে জলাশয় ক্রয় করে। মাঝে মাঝে অন্য পেশার লোকও এই কাজে অংশ গ্রহণ করে। মাছ ধরার জন্য প্রায় ১৮ প্রকার জাল ব্যবহৃত হয়। জালগুলো লম্বায় ৪ থেকে ২৫০ হাত এবং প্রস্থে ২ থেকে ২৪ হাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। এই জালের বিভিন্ন নাম আছে যেমন, তপসে মাছের জন্য গুন্‌তি জাল, হিলসা, চিতা, বোলা প্রভৃতি মাছের জন্য কোনাজাল ইত্যাদি। এছাড়াও পোলো, কোচ, বর্শা, গঁড়া ইত্যাদিও মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়। এখান থেকে প্রচুর শুকনো মাছ বিদেশে চালান দেওয়া হয়। ক্রাস্‌টাসিয়া এবং শামুক এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার নদীতে মায়া (Mya) প্রজাতির একটি ঝিনুক পাওয়া যায়। এই ঝিনুকে মুক্তা উৎপন্ন হয়। শীতকালে এগুলো সংগ্রহ করা হয়। বেদে (Rudiyas) নামক মুসলমানগণ এই ঝিনুক সংগ্রহ করে। এই ব্যবসায়ে সাধারণতঃ ৮০—১০০ খানা নৌকা খাটানো হয়। এই ঝিনুকের মুক্তা ছোট বলে দাম কম; গ্রামবাসীগণ চামচের পরিবর্তে ঝিনুক ব্যবহার করে।

পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ থেকে আগত জীবজন্তু

পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের যে সব জীবজন্তু ঢাকা জেলায় দেখা যায় তারা হচ্ছে ত্রিপুরা পাহাড়ের গয়াল আর প্যাঙ্গোলিন; সিলেটের ছুঁচো ও বানর

জাতীয় প্রাণী আর শজারু। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার পাখী যেমন আরগোজ (Argos) বা ময়ুর, হুপু, বুছেরোজ (Buceros) প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে এখানে আনা হয়। ট্যালপা ইউরোপীয়া (Talpa europia) নামের একটা ছুঁচোকে আমি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলাম। এটা ছিল ইউরোপের সাধারণ ছুঁচো। এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস গারো পাহাড়ে ওরাং ওটাং আছে। এই প্রাণীকে তারা বলে বন-মানুষ। তাদের মতে এরা উল্লুক বা 'জিবন' থেকে স্বতন্ত্র। গাড়ো পাহাড়ের মানুষ উল্লুক বা 'জিবন' ধরতে অভ্যস্ত। তাদের চিনতে ভুল হবার কথা নয়। সেখানে ওরাং ওটাং আছে এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত। পরলোকগত কাকুথারস ১৮৩৭ সালে এই অঞ্চল পরিদর্শনের সময় এই ব্যাপারে বিশেষ অনুসন্ধান চালান। তিনি জানান যে, বন-মানুষ বা ওরাং ওটাং এখানে দেখা গেছে, তবে তারা অতি বিরল। অনেক বছর পূর্বে এই জাতীয় একটা প্রাণী ধরা হয়েছিল। আবুল ফজল এই বন মানুষটিকে বানর জাতীয় প্রাণী বলে উল্লেখ করেছেন। বানরের সাথে এর মুখমণ্ডলের আশ্চর্য মিল আছে; তবে এর কোন লেজ নেই। এরা সোজা হয়ে হাটে, গায়ের চামড়া কালো ও লোমশ। এই জাতীয় একটি প্রাণী বাংলা থেকে আবুল ফজলের নিকট পাঠানো হয়েছিল। প্রাণীটি ছিল অদ্ভুত[১] চামড়ার রঙ কালো, (ওরাং ওটাং এ নীল আভাযুক্ত) লোমের আবরণ কমে গিয়েছিল (ওরাং ওটাং এ পুরু ও লোমশ)। এ থেকে নিশ্চিত প্রমাণ হয় যে এ বন-মানুষই প্রকৃত ওরাং ওটাং।

উদ্ভিজ্জ

উত্তর বিভাগের উচ্চ কাঁকর অঞ্চল আর পলিগঠিত জলাভূমি অঞ্চল উদ্ভিজ্জের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন বর্গ, প্রকার ও প্রজাতির বৈচিত্র্য হেতু সব গুলোর বর্ণনা দেখা সম্ভব নয়। এখানে উপযোগিতার ভিত্তিতে সাজিয়ে কেবল মাত্র অতি পরিচিত কয়েকটির আলোচনাই করবো।

ভোজ্য উদ্ভিদ—জলাভূমি ও আশে পাশের উদ্ভিদ

মিশরীয় পদ্মা, নিমফিয়া লোটাস (Nymphaea lotus বর্গ Nympheaceae Salisb.) অথবা জল কমল। এই গাছের কন্দাকৃতি মূল শালুক আর বীজ ও

১ আইন-ই-আকবরী : গ্ল্যাডউইন অনূদিত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০০।

ডাঁটা শাপলা নামে খাদ্য হিসেবে বাজারে বিক্রি হয়। কৃষকগণ জমি চাষ দেবার সময় শালুক সংগ্রহ করে এবং সেদ্ধ করে ভোজন করে। শালুক থেকে একপ্রকার শ্বেতসার পাওয়া যায়—যা স্থানীয় ডাক্তারগণ এরারুটের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করেন। বীজ থেকে খৈ তৈরি করা হয়। পানি কলা বা ওয়াটার প্ল্যানটেন (Desmonium indicum of Roxb, Steatistes alismoides, Linn)। একে প্রশস্ত পত্র জলসৈনিকও (Broad leaved water soldier) বলা হয়; যেহেতু এর কাঁটাগুলো দেখতে ঠিক জলের উপর শ্রেণীবদ্ধ সেনা বাহিনীর মত। শাপলার মত এটাও ঝিল অঞ্চলে জন্মে। এই গাছের বীজ সংগ্রহ করে তা বিক্রি করা হয়। সিংগারা Trapa বর্গের (Onagrise water cattrops)। এটার রয়েছে দুটো প্রজাতি; Trapa pispinosa, আর T. quadrispinosa। দুটোর প্রাচুর্যই সমান আর উপরোক্ত উদ্ভিদগুলোর সাথে একই পরিস্থিতিতে পাওয়া যায়। এর বাদামের শাস প্রচুর পরিমাণে বাজারে বিক্রি হয়। কমল গুটা বা রক্ত কমল (Nelumbium speciosum, বর্গ Nympheaccae, juss.)। এই গাছের বড় সড় লম্বা কন্দ মূল আর ফলের বীজ শাপলার মতই গ্রামবাসীদের খাদ্য। হিন্দুগণ এই ফুল পূজায় ব্যবহার করে আর বাজারে মোড়কের কাজে এর পাতা ব্যবহৃত হয়। মুকানা বা পকল (Anneslia spinosa, Roxb.)। বাংলার পূর্বাঞ্চলের দেশ গুলোতে এই উদ্ভিদ্‌টি বিশেষ ভাবে দেখা যায়। নিম্নভূমিতে যেখানে জলের গভীরতা যথেষ্ট সেখানে এই গাছ জন্মে। ফল কালো রঙের সুতীক্ষ্ণ কাঁটায় আবৃত, ভেতরে স্বচ্ছ মণ্ডযুক্ত কয়েকটা কোষ থাকে, যাদের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ফলের বীজ। অধিবাসীগণ বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। মে মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত মুকানা বাজারে পাওয়া যায়। ঘেচু (Aponogeton monostachion, বর্গ Niades, juss.) বা এক কীলকী এ্যাপনোজিটন। নিচু ধানের জমিতে সচরাচর এদের দেখা মেলে। শালুকের মতই জমি চাষ দিবার সময় কৃষকগণ খাদ্য হিসেবে এই গাছের কন্দ মূল সংগ্রহ করে। দীর্ঘ দিন জলমগ্ন অবস্থায় এই উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখা যায়, আর বন্যা থেকে উদ্ভূত খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের সময় ঘেচুই হলো অপেক্ষাকৃত গরীব গ্রামবাসীদের প্রধান খাদ্য বস্তু।

আর্দ্র ও শুষ্ক ভূমির উদ্ভিজ্জ : যে গুলোর পাতা ও শাখা-প্রশাখা সব্জি রূপে ব্যবহৃত হয়

কলমী শাক (Convobulus repens)। এই উদ্ভিদ জলের উপরিভাগে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। কচি ডাটা আর গাছের অগ্রভাগ শাক রূপে ভোজন করা হয়। হেলেঞ্চা (Jussicn repens, বর্গ Onagr.) সচরাচর জলা-ভূমিতে দেখা যায়। গাছের ডাঁটা ও পাতা তেতো এবং সর্বসাধারণের একটি রুচিকর সব্জি উপকরণ। পুঁই শাক (Basella llcida বর্গ Atriplices juss) বা ঝলমলে মালাবার নাইটসেড (Shining Malabar Nightshade)। এর কচি শাখা প্রশাখা একটি উপাদেয় সব্জি। আগার্ক (Agarh, Achyranthes alternifolia, বর্গ Amaranth) লুনিয়া (Protulacea oleracea) অথবা Garden purslane এবং চৌলি (Protulacea quadrifolia) অথবা Crceping anual pruslane) এই গুলো শাক সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গন্ধ বেধালী (Oldenlandia alata বর্গ Saxifrag juss) আর মুন্দি (Sphaeranthus mollis বর্গ সিনারোসেফালী Cinarocephaloe. juss) এখানে প্রচুর জন্মে। এদের পাতা কটু গন্ধযুক্ত। দেশীয় খাদ্য তৈরিতে পাতার ব্যবহার আছে।

ফলের গাছ—শুষ্ক ও আর্দ্র ভূমি অঞ্চলের গাছ পালা

পানিজোলা (Paniyola ফ্লেকোরসিয়া Flacourtia ক্যাটাফ্রাকটা cata-fracta, বর্গ টিলিয়াসি Tiliacae juss.)—আকার ও আয়তনে কুলের মত ; ফল বেগুনি রঙের, বর্ষাকালে শহরের বাজারে এই ফল প্রচুর পাওয়া যায়। চড়ক পূজার সময় প্রায়শ্চিত্তকারীগণ দৈহিক নিপীড়নের জন্য এই গাছের কাঁটা যুক্ত শাখা ব্যবহার করে। মুনফুল বা ময়না (বাংগুয়েরিয়া Vangueria স্পিনোজ spinose, বর্গ রুবিয়াসি Rubiaceae, juss) এই গাছ জঙ্গলে প্রচুর জন্মে। বর্ষা-কালে প্রচুর ফল শহরের বাজারে নেওয়া হয়। এই ফলই হচ্ছে ইণ্ডিয়ান প্লাম। ফল আয়তাকার, রসালো, এর মধ্যে থাকে দুই বীজ যুক্ত একটা রুক্ষ শুপারী। সফরিয়াম (সিসিয়াম পিরিফেরাম Psidium pyriferum, বর্গ মিরেটাছি Myrtaceae, juss) শ্বেতপেয়ারা (White guava), জঙ্গলের একটি সাধারণ বৃক্ষ। পেয়ারা হলো বাজারের সবচেয়ে সস্তা ফলগুলোর একটি। আমলকী বা আমলা (ফিলানথাস Phyllanthus এমলিকা emblica, Linn. মাইরোবা-লানাস এমলিকা Myrobalanus emblica, Rumph, বর্গ, Euphorbiaceae,

juss.) ফলটি আয়তনে প্রায় গুজবেরী ফলের সমান। শহরের বাজারে প্রচুর বিক্রি হয়। ক্ষীরণী (মিমোসপস কন্‌কি Mimussops Kanki বর্গ, স্যাপোটাছি Sapotaceae, juss) ঃ এই গাছ থেকে এক রকম ক্লান্তি নাশক ফল পাওয়া যায় যা গ্রামবাসীদের কাছে খুব প্রিয়। লুডকা (পিরারডিয়া সাপিড়া, Pierardia Sapida Roxb.) পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে এই গাছ সচরাচর দেখা যায়। এই অঞ্চল আর পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায় এই গাছ প্রচুর জন্মে। এটি হলো চীনের লুডকা। ফলগুলো গুজবেরী ফলের মত, কিছুটা হলদেটে আর সামান্য টক স্বাদ বিশিষ্ট। কামরাংগা (অ্যাভেরহোয়া ক্যারমবোলা Averrhoa Carambola, Rump, বর্গ অক্সলিডি Oxalidae, Decandolle) ঃ এটি জঙ্গলের একটি সাধারণ গাছ পেয়ারা গাছের সাথে একই পরিস্থিতিতে জন্মাতে দেখা যায়। কাঁচা ফল একটি সব্জি উপকরণ। বর্ষাকালে এই ফলটি প্রচুর পাওয়া যায়। জলপাই (ইলিও কারপাস সেরাটা Elococarpus serrata, বর্গ ইলিওকার্পি, Eloecarpi, juss.) ইণ্ডিয়ান অলিভঃ শুষ্ক ও উচ্চভূমি অঞ্চলে এই গাছটি দেখা যায়।

কাঁচা ফলই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, ফল দিয়ে আচার তৈরি হয়। ডেফুল (আরটোকারপাস লাকুচা, Artocarpus lacaocha) ঃ এই গাছের কাঁচা ফল থেকে একরকম সাদা আঁঠালো রস পাওয়া যায়। পাকা ফল ফালি ফালি করে কেটে গরম পানিতে কিছু সময় ডুবিয়ে রাখলে এক প্রকার ক্বাথ বের হয়, এই ক্বাথের মধ্যে চাল সেদ্ধ করে চাটনী প্রস্তুত হয়। চালতা (ডিলেনিয়া স্পিসিওজা Dillenia spiciosa, Thumb) ঃ জেলার উত্তরভাগে গভীর জঙ্গলে এই গাছ প্রচুর জন্মে। ফলের আয়তন বড় একটা আপেলের মত, স্বাদ খুব টক। দেশীয় রান্নায় চালতার যথেষ্ট ব্যবহার আছে। ইমলি (টামারিনডাস ইণ্ডিকা, বর্গ লিগিউমিন, Tamarindus indica, ord. Legumin) ঃ জঙ্গলের একটি সাধারণ বৃক্ষ, গ্রামাঞ্চলে এর চাষ হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পরিমাণে তেতুল রপ্তানী হয়। কদবেল বা কবিথ্‌ (ফেরোনিয়া এলিফ্যানটাম Ferónia clephantum, বর্গ Aurantea ceae, corr, de serr) এলিফ্যাণ্ট আপেল ঃ এই গাছটি সাধারণতঃ জেলার উত্তরাঞ্চলে জন্মে। এ গাছের ফল হাতির অতি প্রিয় খাদ্য। এর শাঁসের সাথে লবণ, তেল, লংকা মিশিয়ে রসনাতৃপ্তিকর খাদ্য তৈরি হয়। গন ফিকাস এর

অন্তর্ভুক্ত তিনটি প্রজাতি দেখা যায়, গুলার, ফিঃ গ্লুমেরাটা ; ডুমুর, ফিঃ কারিকা ; আরলুটা, ফিঃ ভ্যাগানস। এগুলো খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমুর (আমরা রহিতোকা এবং ওয়াইট আওারসনিয়া কুকুলাটা)ঃ এই গাছের ফল ও ফুল দুটোই রান্নার উপকরণ। আম (ম্যাংগিফেরা ইণ্ডিকা, বর্গ টেরিবিনথাসি, জাস)ঃ উত্তরাংশের অতি পরিচিত বৃক্ষ। কাঁচা ফল দেশী খাদ্য প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয়। জংলী খেজুর (ফোয়েনিক্স্ ফারিনিফেরা, রোক্সঃ বর্গ, Palmae)ঃ এই জাতের খেজুর গাছ প্রায় তিন ফুট লম্বা হয় ; জঙ্গলেই এদের সচরাচর দেখা যায়, ফল বাজারে বিক্রি হয়। বেত (ক্যালামাস রোটাং, রোক্স)ঃ গাছের কচি কাণ্ড সব্জি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ফল খাওয়া হয়। জংলী বা বন হলদী (কারকুমা জেডোরিয়া, বর্গ ক্যানো, Canoe, জাস)ঃ জেলার উত্তরাংশে প্রচুর জন্মে। অতিরিক্ত মুনাফার জন্য আসল হলুদের সাথে বন হলুদ মিশিয়ে বিক্রি করা হয়। 'নামান' (Naman)ঃ গাছের ফল আর শতমূলীর (অ্যাসপারাগাস রেসেমোসাস) শেকড় সিরাপের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও আদা আর লেবু অনুরূপ পদ্ধতিতে তৈরি করে দেশের বিভিন্ন অংশে পাঠানো হয়। কঁঠাল আর বেল এই জেলার সর্বত্রই বিদ্যমান।

ঔষধ গুণ সম্পন্ন গাছপালা

জয়ন্তী (এস্কিনোমিন সেসবান) নামক গাছের পাতার রস athelmintic। প্রতি মাত্রার জন্য দুই আউন্স পরিমাণ রস প্রয়োজন। সোনালী (ক্যাসিয়া ফিসটুলা)ঃ শাঁসের সাথে তেতুল, চিনি ও গোলাপ জল মিশিয়ে তা রেচক ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। জ্বরের রোগীর জন্য শীতলকারী পানীয় তৈরিতে শুটীর খোসা ব্যবহারের রেওয়াজ আছে। সোনা (বহিনিয়া পুরপুরিয়া) অথবা পাহাড়িয়া বেগুনী আবলুস (Purple mountain ebony)ঃ জ্বরের প্রতিকারে এর কাঠ ব্যবহৃত হয়। কট কলেজা (সিজালপিনিয়া বণ্ডুচেল্লা)ঃ এই গাছটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রচুর দেখা যায়। গাছের বীজ উপকারী টনিক, পাতা থেকে প্রস্তুত ক্বাথ জ্বরে উপকারী। কয়েক প্রকার তরল মলম প্রস্তুতে এটি দরকার হয়। অপরাজিতা (ক্লিটোরিয়া টারনাটা)ঃ মলুক্কা দ্বীপ পুঞ্জের টারনেট দ্বীপ এই গাছের আদি ভূমি। ক্ষয় জ্বরে আক্রান্ত রোগীর

অনবরত ঘাম ঝরলে এই পাতার রসের সাথে আদার রস মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। রক্ত চন্দন (এডিনানথিরা প্যাভোনিয়া) বা ব্যাস্টার্ড ফ্লাওয়ার ফেন্স (Bastard flower fence) ঃ এই গাছ অনেক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। ফুসফুসের রোগে আর বিশেষ করে হিমোপটিসিস্ (haemoptypis) রোগে বীজ এবং কাঠ থেকে প্রস্তুত ক্বাথ অথবা তরল মলম বিশেষ উপকারী। বীজ এবং কাঠ ঘষে একটা মণ্ড প্রস্তুত করা হয়; এই মণ্ডের সাথে শুকনো হলুদ বাটা আর মধু মিশিয়ে কঠিন চক্ষুরোগে মণ্ডের সাথে চোখের পাতায় লেপন করার রীতি আছে। খাদিরা (অ্যাকাসিয়া ক্যাটেচু) ঃ কঠিন চর্ম-রোগে এই গাছের কাঠের মণ্ড প্রয়োগ করা হয়। গুলঞ্চ, বাস্তুত, পলতা মুথা, চুল্লানী প্রভৃতি গাছের সাথে খয়ের কাঠ মিশিয়ে একপ্রকার নির্যাস প্রস্তুত করা হয়, তাছাড়া ওসের আর নিমপাতার সাথে নির্যাস তৈরিতে এই গাছের উপাদান ব্যবহৃত হয়। এক পাউণ্ড জলে প্রতিটি উপাদান আধা ড্রাম করে নিয়ে উত্তাপ দিয়ে চার আউন্সে পরিণত করা হয়। মাশানী (গ্লাইসিন লাবিয়ালিজ) ঃ বাত্তারি নামে এক রকম তরল মলম তৈরিতে এই গাছের উপাদান দরকার হয়, দীর্ঘস্থায়ী চর্মরোগে এই মলম ব্যবহৃত হয়। কালো কালকাসুন্দা (ক্যাসিয়া পুরপুরিয়া) ঃ এই গাছের পাতা, বিচূর্ণীকৃত বীজ আর গন্ধক সহযোগে মলম তৈরি হয়—খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি চর্মরোগে এগুলো বিশেষ উপকারী। গুলঞ্চ (মিনিসপারমাম গ্ল্যাবরাম) ঃ কুষ্ঠ রোগে এই গাছের ঠাণ্ডা ক্বাথ ব্যবহারের রীতি আছে। গাছের শাখা টুকরো টুকরো করে কেটে থেতলান হয়, তারপর ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। কাণ্ড ও জলের অনুপাত ১ ঃ ৫। তিন দিন ভিজিয়ে রাখার পর থেতলানো কাণ্ড তুলে নেওয়া হয়, জল অতি সতর্কতার সাথে ঢেলে ফেলা হয়, পাত্রের নীচে একরকম সাদা পাউডার সঞ্চিত থাকে। এই গুড়ো পাউডার রোদে শুকিয়ে নিয়ে কুষ্ঠ রোগের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়। চিত্রা (প্লামবাগো জেলামিকা) বা সিংহলী লীড ওয়ার্ট (Ceylon lead wart) ঃ কুটীর এবং বাগানের চারপাশে বেড়া হিসেবে এই গাছের আবেষ্টনী অতি মনোরম। প্লীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এই গাছের শেকড় থেকে প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ উপকারী। তাছাড়া অজীর্ণ রোগে টনিক হিসেবে এই ওষুধের ব্যবহার রয়েছে। প্লামবাগো রিজিয়া বা গোলাপী লীড ওয়াট এর প্রাচুর্য দেখা যায় এই জেলায়। এর স্থানীয় নাম চিত্রা। উভয় প্রজাতির কাঁচা শেকড় চূর্ণ করে ব্যবহৃত হয়।

বিচিত্তি (ট্রাজিয়া ইনভলুক্রাটা ; ক্যালিসাইন ট্রাজিয়া) ঃ কুষ্ঠ রোগে এই গাছের শেকড় বাহ্যিকভাবে প্রয়োগ করা হয় ; গাছের পাতা আদা এবং কাইফুলের (Kyphul) সাথে মিলিয়ে মাথা ব্যাথার ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। বাসক বা এরুস (জাষ্টিসিয়া আধা টোডা) মালাবারের বাদাম (Malabar nut) ঃ পাতার রস কাশিতে শ্লেষ্মা নির্গমনী ওষুধ (expectorant) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এক মাত্রা ওষুধের জন্য দুই ড্রাম পাতার রস এবং এক ড্রাম আদার রস প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার তেল প্রস্তুতে বাসক একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। মুথা (সাইপেরাস রোটানডাস) ঃ জঙ্গলে আগাছার আকারে এই গাছ প্রচুর ছড়িয়ে আছে। এর কন্দমূল চেঁছে নিয়ে টাটকা আদার সাথে গুড়ো করা হয়। মধু সহযোগে এই ওষুধ রক্ত আমাশয় রোগীর পক্ষে উপকারী। ৮ রতি বা ২০ গ্রেনের মাত্রা ব্যবহার করাই রীতি। শ্যামলতা (ইচিটিজ ফ্রুটেসছেন্জ) ঃ একটা লতানো গাছ। গাছের কাণ্ডে এক প্রকার তেতো রস থাকে। পাতা আর ডাঁটা থেকে তৈরি ক্বাথ জ্বরের রোগীকে খাওয়ানো হয়। ভুঁই কুমড়া (ট্রিকো জানথিজ টিউবারোজা) ঃ এই গাছের কন্দ মূল শুকিয়ে গুড়িয়ে পাউডারে পরিণত করা হয়। প্লীহা, যকৃত ও অন্ত্রের প্রদাহে ১০ গ্রেনের এক এক মাত্রা করে এই ঔষধ খাওয়ানো হয়। তেলের সাথে মিশিয়ে কাঁচা কন্দ কুষ্ঠের ঘা এর উপর প্রলেপ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। সাঁচি (একিরান্থিজ ট্রেইনড্র।) ঃ নিম ও হেলেঞ্চর সাথে সেদ্ধ করে বাত রোগে মেডিকেটেড ভ্যাপারা তৈরী হয়। বালা (প্যাভোনিয়া ওডোরাটা) ঃ সুগন্ধি প্যাভোনিয়া বাগানের শোভাবৃদ্ধি করে। মোথা, বেল, ধনে অথবা রাধুনী এবং বালা পাতা প্রতিটি দুই ড্রাম করে এক পাউণ্ড জলের সাথে সেদ্ধ করা হয়, তাপ দিয়ে এই পরিমাণকে চার আউন্সে পরিণত করা হয়। এটি একটি ধারক ঔষধ (astringent), রক্ত আমাশয় রোগীকে এই ঔষধ দেওয়া হয়। নাগ কেশর (মেজুয়া ফেরিয়া) ঃ একটি বিরাট বৃক্ষ। সাধারণতঃ জেলার উত্তরভাগে দেখা যায়, বাগানেও রোপন করা হয়। কাশি রোগে এই গাছের ফুল তেলের সাথে মিশিয়ে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীন উভয় পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা হয়। বীজ থেকে এক প্রকার দাহ্য তেল পাওয়া যায়। পুনুরনবা (বোয়েরহিবিয়া প্রোকামবেনজ) ঃ মূত্র বৃদ্ধিকারী, শোথ রোগেও পুনুরনবার ব্যবহার হয়। বাত

রোগের প্রতিকার হিসেবে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। রসুন, সজ্জী (subzee) গুড় আর চাল ভাজার সাথে এটা ব্যবহার করতে হয়। এক ভাগ পুনুরনবা পাতার সাথে তিনভাগ রসুন, চারভাগ সজ্জী পাতা আর আট ভাগ গুড় ও চাল ভাজা নেওয়া হয়। সমস্ত অংশটাকে ২০ গ্রেনের ছোট ছোট 'পিল' এ ভাগ করা হয়, প্রতিরাতে দুটো করে পিল সেব্য। তরুকা (অ্যালথিয়া এ্যালুগেজ)। এই নল জাতীয় গাছ জলাভূমিতে সচরাচর দেখা যায়, গ্রামবাসীগণ দড়িদড়া প্রস্তুতে ব্যবহার করে। শেকড়ের রস অর্শ রোগে উপকারী। হাড়জোড়া (সিজাস কোয়াড্রাং গুলারিজ): এ গাছের ডাটা চূর্ণ করে আদা অথবা সর্ষের সাথে মিশিয়ে ক্ষতের উপর প্রলেপ দেওয়া হয়। বোগরা (ভারবিসিয়ান প্রোসট্রাটা): এর কাণ্ডের রস চিনি সহযোগে জান্ডিস বা কামলা এবং গণোরিয়া রোগে ব্যবহৃত হয়। জিরজুল (ওডিনা উইডিয়ার) বমি কারক: গাছের সবুজ শাখার চার আউন্স রসের সাথে দুই আউন্স তেতুল মিশিয়ে আফিম অথবা অপর কোন নেশার ফলে অচেতন ব্যক্তিকে বমি করানোর প্রয়াসে খাওয়ানো হয়। তুলসী (ওসিমাম ভিলেজাম): মিষ্টি তুলসী। তুলসীপাতার রস আদা আর গোল মরিচ মিশিয়ে সবিরাম জ্বরের রোগীকে খাওয়ানো হয়। জ্বরের বিরাম পর্যায়ে এই ঔষধ সেব্য। এছাড়া, বমি উপশমের কাজেও এটির ব্যবহার আছে। শিমূল (বোমবাক্স হেপটাফিলা) শিমূল তুলা (Silk cotton): এই গাছ সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হয়। শিমূল ফুল, আফিম, ছাগলের দুধ ও চিনি একত্রে সেদ্ধ করে অর্শ রোগের ওষুধ তৈরী হয়। এই ওষুধ দুই ড্রাম করে দিনে তিনবার সেব্য। চম্পা (মিকেলিয়া চম্পকা): মিষ্টি হলদে চম্পা। শিরঃঘূর্ণনে তিল তেলের সাথে ফুল বেটে ললাটে প্রলেপ দিলে তা প্রশমিত হয়। পেটের বেদনায় চম্পা পাতার রস মধু সহযোগে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়। নাগফনী (কাগটাস ইণ্ডিকাস): গাছের সাদারস রেচক গুণসম্পন্ন। ১০ ফোটা রস চিনি সহযোগে সেব্য। শেফালিকা (নিক্টান্থিজ আরবোর ট্রিস্টিজ): এই গাছের ফুল দিনের বেলা নেতিয়ে পড়ে, তাই এর নাম হয়েছে দুঃখী উদ্ভিদ বা ভারতের বিলাপী (Indian mourner)। এ গাছের পাতা জল ও চিনির সাথে সেদ্ধ করে জ্বরের সময় ঘাম বৃদ্ধিকারী ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাদ আর হলদেটে ফুলগুলো জুঁই ফুলের মত সুগন্ধ উৎপাদন করে। জবা (হিবিসকাস্ রোজা সিনেন্সিস): ঠাণ্ডাজলে প্রস্তুত জবা ফুলের নির্যাস Menorrhagia

রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। পলিতা মান্দার (ইরিথিনা ইণ্ডিকা) ঃ সবুজ পাতার রস ক্রিমিনাশক ও রেচক গুণ সম্পন্ন। প্রতি মাত্রায় দুই আউন্স করে রস সেব্য। আকন্দ (ইসক্লেপিয়াস জাইগানটিয়া) সোয়ালো ওয়ার্ট অব ব্রাউন (Swallow wart of Brown) ঃ সাদা রকমের (Variety) গাছই এই অঞ্চলে বেশী দেখা যায়। সিফিলিস এবং কুষ্ঠরোগে শেকড়ের ছাল ব্যবহৃত হয়। সীজ (ইউফোরবিয়া নারসি ফলিয়া) ওলিয়াণ্ডার লিভ্‌ড্‌ স্পার্‌জ্‌ (Oleander leaved spurge)ঃ এ গাছের সাদা রস রেচক গুণ সম্পন্ন। এর কাণ্ড থেকে প্রস্তুত মণ্ড আদার সাথে মিশিয়ে পাগলা কুকুরে দংশিত ব্যক্তিকে খাওয়ানো হয়। তাতে জলাতংক সৃষ্টির ভয় থাকেনা।

ইশরমূল (এরিস্টোলোকিয়া ইণ্ডিকা) বা ইণ্ডিয়ান বার্থ ওয়ার্ট (Indian birth wart) ঃ জিলার উত্তর ভাগে এই গাছটি প্রচুর জন্মে। গাছের শেকড়ের রস কাশি ও হাঁপানী রোগের ঔষধ। কদম্ব (নাউক্লিয়া কদম্বা) শোথ্‌ ইত্যাদি রোগে এই গাছের পাতা বেটে প্রয়োগ করা হয়। ফুল আদার সাথে বেটে ভগন্দর রোগে ব্যবহৃত হয়। মাতুরা (ক্যালিকার্পা ইনক্যানা) ঃ এ গাছ থেকেই সুপ্রসিদ্ধ শীতল পাটি তৈরী হয়। ফুলের ক্বাথ Menorrhagia রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। দুই ড্রাম ফুল ও দুই আউন্স জল এই অনুপাত ব্যবহার করা হয়। এক মাত্রার জন্য এক আউন্স ক্বাথই যথেষ্ট। ভিকা পুর্ণি বা থানকুনি (হাইড্রোকোটাইল এশিয়াটিকা) ঃ এই গাছের রস আদার রসের সাথে রক্ত আমাশয় রোগের প্রতিকারে ব্যবহৃত হয়। যষ্টি মধু (ক্যালিসি রইজা গ্ল্যাবরা) ঃ উত্তর ভাগে সাধারণত দেখা যায়। জ্বরের সময় তৃষ্ণা প্রশমিত করার জন্য শেকড় ব্যবহৃত হয়, তাছাড়া অন্যান্য উপাদান সমন্বয়ে সিফিলিসের প্রতিকারেও এর প্রয়োগ করা হয়। বকুল (মিমোসপজ্‌ এলেন্‌জি) ঃ গাছের বীজ গুড়া করে পোটাই করা হয়, দুরারোগ্য কোষ্ঠবদ্ধতায় এই পোটাই চমৎকার ফলদায়ক। জাম্প টোকোরী (Zamp tokuri) (সিডা এশিয়াটিকা) ঃ গাছের পাতা আর শাখার সেদ্ধ পানি বিশেষ ধরনের ক্ষতে (Phagedenic sore) সেক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। সজনে (হিপেরানথিরা মরিংগা) ঃ গাছ দেশের সর্বত্রই দেখা যায়। শেকড়ের ছাল সর্ষে বীজ আর কাঁচা আদার সাথে বেটে বাতের বেদনায় প্রলেপ দেওয়া হয়। অজীর্ণ ও প্লীহার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কুম্ভুরী (ব্রায়োনিয়া গ্রানজিজ) ঃ এই গাছের শেকড়ের ছাল শুকিয়ে

গুড়া করা হয়, এই পাউডার ভাল বিরেচক, প্রতি মাত্রায় ৩০ গ্রেন করে সেব্য। পাতরচুর (প্লেকট্রানথাস এ্যারোমাটিকাস): শিরার রোগে (Stranguary & chardes) পাতার রস উপকারী। রক্ত কমল (নিমফিয়া রুবরা) : অন্ত্র ও পাকস্থলী থেকে রক্ত ক্ষরণে ফুল ও ডাঁটা থেকে প্রস্তুত পাউডার বিশেষ উপকারী। সুন্দী শাপলা (নিমফিয়া সায়েনিয়া) : বা নীলাভ ফুলের শাপলা এক রকম তেল তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই তেল পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয়। আরো কতকগুলো ঔষধ গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ হচ্ছে জমল গুটা (ক্রোটন টিগ্লিয়াম), কুচিলা স্টিকনোজ নাক্স ভমিকো), নিম (মিলিয়া আজাডি রাক্টা) ধুতরা (ধাতুরা মেটাল), ভেরেণ্ডা (রিসিনাস কমিউনিজ)। এগুলো সাধারণতঃ পতিত জমির গাছপালা।

পশুর খাদ্য ও বিবিধ কাজে ব্যবহৃত উদ্ভিদ

বীণা এনাড্রোপগোন মিউরিকাটাস নামক ঘাস উত্তর ভাগে যে সব জায়গা জলে নিমজ্জিত হয়না সেখানে জন্মে। অপেক্ষাকৃত গরীব শ্রেণীর লোকেরা কুঁড়ে ঘরের ছাউনি তৈরির কাজে এই ঘাস ব্যবহার করে। কিন্তু এটা তত টেঁকসই বা উপযোগীনয়। উলু (স্যাকারাম সিলিণ্ডিকাম বর্গ, গ্রামিনী) : উত্তরাঞ্চলে এই ঘাস প্রচুর জন্মে এবং ছাউনি তৈরির কাজে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কাশ বা কাগরা (স্যাকারাম স্পনটেনিয়াম বর্গ, গ্রামিনী) বা বোনা আঁখ: বাচ্চা প্রসবের পরে গো-মহিষকে এই ঘাস খেতে দেওয়া হয়। নল আরুণ্ডো কারখা, বর্গ, গ্রামিনী) : চর ও জলাভূমিতে এই জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে। উচ্চতায় আট দশ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। কুঁড়ে 'ঘরের চালা তৈরিতে এটা কাজে লাগে। মুলোয়া বা পুরু মাদুর তৈরি করতেও এটা ব্যবহৃত হয়। বক্ষা (রট-বিলিয়া গ্লাবরা, বর্গ, গ্রামিনী) : এর আরেক নাম 'শক্তবাস'। এই ঘাস এখানে প্রচুর জন্মে, ইহা পশুর প্রধান খাদ্য। কুশা (পোয়া সাইনোস্যুরইডিজ, রোক্স, বর্গ, গ্রামিনী) : তৃণভূমির ঘাসের (meadow green) একটা প্রজাতি। কুড়ে ঘরের দেওয়াল ও দরজা তৈরিতে ইহার ব্যবহার আছে। কচি ঘাস পশুর খাদ্য। দুবলা (পেনিকাম ডাক্টিলোন) বা (Creeping panick grass) : এই ঘাস এখানে প্রচুর জন্মে। পশ্চিমের জেলাগুলোর চেয়ে এখানকার দুবলা ঘাস উন্নত মানের। দক্ষিণ ভাগে নদীতীরের হালকা মাটিতে এই ঘাসের প্রাচুর্য বিশেষ লক্ষণীয়। এই তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চল

হচ্ছে জেলার উত্তম চারণ ক্ষেত্র। এর পাতার রস হিন্দু ডাক্তারগণ ঔষধরূপে ব্যবহার করেন। হোগলা (টাইফা এলিফ্যানটিনা, বর্গ টাক্কুফি, জাস) ঃ ইংরেজীতে বলা হয় Elephant grass বা "reed mace"। সদ্যজাত চর অঞ্চলে হোগলা গাছ প্রচুর জন্মাতে দেখা যায়। জউ (টামারিক্স্ ইণ্ডিকা) ঃ এই গাছও সদ্যজাত চর অঞ্চলের হালকা মাটিতে প্রচুর জন্মে। জউ আর হোগলা জালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হিজল গাছ হলো পতিত জমির একটি সাধারণ উদ্ভিদ। এটাও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এখানে বাঁশের চারটি রকম (variety) দেখা যায়। এদের বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চলে উৎপাদিত হয় কিন্তু এখানকার উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর বিধায় পার্শ্ববর্তী সিলেট জিলা থেকে প্রতি বছর বেশ কিছু বাঁশ আমদানী করতে হয়। বোনা বাঁশ (অরুনডিনাছি স্পিনোজা) দক্ষিন ভাগের জঙ্গলে প্রচুর জন্মে, অন্যান্য রকমের সাথে প্রধান পার্থক্য হলো এর শেকড় থেকে অসংখ্য কাঁটা চার দিকে সঙ্গীনের ন্যায় শোভা পায়। এই জেলার বাঁশে প্রায়ই 'তাবাশির' থাকে, তবে সিলেট অঞ্চলের বাঁশেই বেশী দেখা যায়। কর্পূরের সাথে সাদৃশ্য হেতু বালু জাতীয় এই বস্তুকে 'বাঁশ কফুর' বলা হয়। ইহা পরকলা গুন (optical property) সম্পন্ন। ঔষধ হিসেবেও এর ব্যবহার আছে।

গুরুত্বের বিচারে বাঁশের পরেই গড়ালী গাছের স্থান। জঙ্গলের সেরা গাছগুলোর মধ্যে গড়ালী একটি। সাধারণতঃ জঙ্গলের উচ্চ ভূমি অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর আকারে এই গাছ শোভা পায়। বর্ষাকালে জলপথ সম্প্রসারিত হলে কাঠুরেগণ গড়ালী গাছ কেটে নিয়ে আসে। ঘর তৈরিতে ও জ্বালানী হিসেবে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বন্য উদ্ভিদের মধ্যে আম, হিজল, বড়ই ও গাব গাছ লাঙ্গল তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। তেল নিষ্কাশন, হামানদিস্তা, স্ট্যাম্পার ও কাগজ তৈরির জন্য তেঁতুল গাছ ব্যবহৃত হয়। তাঁতের মাকু, ডিংগী নৌকা ও জলাধার তৈরির কাজে তালগাছ এবং বাক্স, বারকোস, পেয়ালা আর বিভিন্ন প্রকার গার্হস্থ্য বাসন-পত্র তৈরির কাজে কদম গাছ ব্যবহৃত হয়। ঢেঁকি ও স্ট্যাম্পার তৈরির জন্য গাব (ডিওস্পিরোজ ক্রুটিনোজা) কাঠ ব্যবহার করা হয়। হরিতকি ও বয়রা কাঠ থেকে নৌকা, ঘরের খুঁটি ও কড়ি-বরগা তৈরি হয়। কাঁঠাল গাছের কাঠ হালকা হওয়ায় বড় বড় নৌকার অগ্রভাগ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ট্রাংক, আলমারী, চেয়ার

ইত্যাদি তৈরির জন্য মিস্ত্রিগণ এই কাঠ ব্যবহার করে। লোহার বদলে বেতের বন্ধনী দ্বারা তৈরি ঢুরী ও ভাদু নামের ছোট ছোট নৌকাগুলো আমকাঠ দিয়ে তৈরি হয়। ডাব গাছের ছাল (বুটিয়া ফ্রানডোজা) ধারক গুণ সম্পন্ন এই গাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা আছে।

খনিজ দ্রব্য

লোহাই এই জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ। উত্তর ভাগের কাঁকর অঞ্চলের লাল মাটিতে পিণ্ড ও দানার আকারে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। মাটির উপরিভাগে এদের নিশানা দেখা যায়। দেশের এই অঞ্চল সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবুল ফজলের সময় এই অঞ্চলে লৌহ খনিজের জন্য বিখ্যাত ছিল বলে উল্লেখ আছে। এই খনিগুলোর অবস্থান সম্পর্কে সরকারী তথ্যে তখনকার কালেকটর মিঃ ম্যাশাই ১৮০০ সালে উল্লেখ করেছেন যে, উক্ত খনিগুলো খুব সম্ভবতঃ জঙ্গলাবৃত অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। এখানকার লোহা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মানের।

তৃতীয় অধ্যায়

[জেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : বিক্রমাদিত্য—বানিয়া ও পাল রাজবংশ—আদিশূর রাজবংশ—বল্লাল সেন—মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গবিজয়]

রাজা বিক্রমাদিত্য

জেলার দক্ষিণাংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রাচীনতম ঐতিহাসিক কিংবদন্তীতে বিখ্যাত রাজা বিক্রমাদিত্যের কথা জানতে পারা যায়—যিনি খ্রীষ্ট-অব্দের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে রাজ্য শাসন করে ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এই যুবরাজ ভারতের বহু দূরদূরান্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে এবং দেশের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ কালে তিনি গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত একটি দ্বীপে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে কয়েকবছর যাবৎ রাজ্য শাসন করেছিলেন বলেও কথিত আছে। বিদ্যাবত্তা ও জ্ঞানের জন্যে তিনি হিন্দুদের মধ্যে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন এবং উজ্জয়িনীতে তাঁর রাজত্বকাল থেকে অদ্যাবধি তাঁর সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এই জেলার সঙ্গে জড়িত তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। বস্তুতঃ তাঁর এস্থানে আগমনের সঙ্গে জড়িত একমাত্র স্মারক হচ্ছে বিক্রমপুর নামটি। বিক্রমাদিত্যের রাজধানীর অবস্থান হিসাবে এখনও এস্থানটি বিদ্যমান আছে। পরবর্তী রাজন্য বর্গ, যাঁদের কথা আমরা শুনতে পাই, তাঁরা ছিলেন বানিয়া বা বৌদ্ধরাজা। এঁরা ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে গঙ্গার পূর্বদিকে অবস্থিত নদীগুলোর কোন একটিতে ধর্মীয় কৃত্যাদি সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন এবং দিনাজপুর, রংপুর ও পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি জেলাতে বসতি স্থাপন করেছিলেন। এ সকল নৃপতির আগমনের তারিখ জানা যায়নি। কিন্তু তারা কোন এক সুদূর অতীতে আগমন করেছিলেন বলে কথিত আছে। এটাই সম্ভাব্য যে, তাঁরা অন্ততঃ বিক্রমাদিত্যের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন।

বানিয়া ও পাল রাজবংশ

বাঙলার রাজন্যবর্গের মধ্যে পাল-বংশের রাজাদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন বানিয়াগন এবং 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থানুসারে প্রতীয়মান হয় যে, এরা ১৪২০

বছরেরও অধিককাল পূর্বে রাজত্ব করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সম্ভবতঃ এদেশে তাদের আধিপত্য লাভের পূর্বে আদি প্রবাসী ও তাদের বংশধরগণ রাজ্যের পূর্বাংশে সামান্য মাত্র উপনিবেশের অধিকারী হয়েছিলেন। বানিয়া রাজাদের তিনজন মাত্র এ জেলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলে তাদের রাজধানী সমূহের অবস্থান এখনও দৃষ্ট হয়। যশপাল তালিপাবাদ পরগনার মধুপুরে, সাভারের সন্নিকটবর্তী কুঠীবাড়ীতে হরিসুন্দর, এবং ভাওয়ালের কাপাসিয়াতে শিশুপাল বসবাস করেন। এই সকল রাজার নামের সঙ্গে রংপুরে বসতি স্থাপনকারী বানিয়া রাজাদের নামের সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকায় অনুমান হয় যে, তাঁরা এক এবং অভিন্ন বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এটা উত্তম রূপে জানা যায় যে, রংপুর শাখার বানিয়াগন একদা প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বা নিম্ন আসামের অধীশ্বর ছিলেন এবং এ জেলা সেই রাজ্যের একটি অংশ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। আবুল ফজল উল্লেখ করেন যে, ব্রহ্মপুত্র থেকে শীতলক্ষার শাখা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই স্থান পর্যন্ত কামরূপ প্রথমে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু বর্তমানকালেও এখানে বেশ কিছু পরিমাণ কোচ ও রাজবংশী উপজাতিদের অস্তিত্ব থেকে এটা নিশ্চিত বুঝা যায় যে, এই রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা, ধলেশ্বরী ও যমুনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এই এলাকা নিঃসন্দেহে বঙ্গরাজ্য ও উপরিউক্ত রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা নির্দেশ করেছিল, এবং বিক্রমপুর ছিল এরই কেন্দ্রস্থান।

আদিশূর রাজবংশ

'আইন-ই-আকবরী'তে আদিশূর রাজবংশকে পাল রাজবংশের পূর্বের বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু দেশের এ অংশে সাধারণতঃ অনুমান করা হয় যে, তাঁরা সমসাময়িক ছিলেন এবং একই সময়ে বুড়িগঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করেন। কনৌজ শহর থেকে পাঁচটি ব্রাহ্মণ পরিবার আনিয়ে ব্রাহ্মণ্যবর্ণের সংস্কার সাধনের জন্য আদিশূর খ্যাতি অর্জন করেন; কিন্তু এই ব্যবস্থা অবলম্বন এবং তাঁর সময়ে সমগ্রদেশ বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র ইত্যাদি রাজ্যে বিভক্ত হওয়া ছাড়া—তাঁর রাজত্বের আর কোনো কিছু জানা যায় না। তাঁর পূর্ব-পুরুষরূপে অনুমিত বিক্রমাদিত্যের মতই তদীয় ইতিহাসসম্পূর্ণরূপে অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা রয়েছে।

বল্লাল সেন

বল্লান সেন, যার বংশ বা কুল্‌জী বিষয়ে 'আইন-ই আকবরী' ও দেশের কিংবদন্তীতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, এখানে তাকে সাধারণতঃ বিক্রমপুর রাজসরকারে আদিশূরের পরবর্তী উত্তরাধিকারী বলে ধরা হয়, এবং তিনি সেখানকার রাজা ছিলেন বলে কথিত হন। মুসলমানগণ কর্তৃক বাংলার এই অংশ জয় করার প্রাক্কালেও বানিয়া রাজন্যবর্গ বুড়িগঙ্গার উত্তরাংশে তাদের রাজ্য শাসন করছিলেন। এই জনপ্রিয় কিংবদন্তি বা জনশ্রুতি অবশ্য-ব্রাহ্মণদের বিবাহের ঘটকদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, যাদেরকে দেশের অন্য যে-কোনো শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বল্লাল সেনের কুল্‌জী ও ইতিহাসের সঙ্গে সাধারণতঃ অধিকতর সুপরিচিত বলে অনুমান করা হয়। এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার সঙ্গে আবুল ফজলের বর্ণনার পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু বল্লাল সেনের একজন বংশধর রাজা ছিলেন। তিনি গৌড় শাসন করতেন এবং তার সময়ে সেই শহরের পতন ঘটে—এ ধরণের বর্ণনার সঙ্গে আবুল ফজলের মতের সাদৃশ্য রয়েছে। অন্যদিকে তাদের মতে, বল্লাল সেনের দৌহিত্র্য দনুজ মাধব (দনুজ মর্দন দেব ?) ছিলেন যুবরাজ, যিনি সেই সময়ে বিক্রমপুরে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। এখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুরা বল্লাল সেনকে আদিশূরের জনৈক স্ত্রীর গর্ভজাত এবং একজন ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রহ্মপুত্রের সন্তানরূপে অভিহিত করে থাকেন। তিনি বুড়িগঙ্গার উত্তরে জঙ্গলে জন্মলাভ করেন ও লালিত পালিত হন। এখানে তাঁর মা আদিশূর কর্তৃক নির্বাসিত হয়েছিলেন। আরো জনশ্রুতি আছে যে, এ অবস্থায় দূর্গার নিকট তিনি বা আদিশূর যে আশ্রয় লাভ করেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এই দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করেন, যার মূর্তি বল্লালসেন এই জঙ্গলে আবিষ্কার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বল্লালসেন আদিশূর কর্তৃক দত্তকরূপে লালিত পালিত হন। এই স্থান তার লুক্কায়িত অবস্থান রূপে ঢাকেশ্বরী (Dehaka Iserry) নামে খ্যাত হয়েছিল। কিন্তু এই জঙ্গল পরবর্তীকালে পরিষ্কার করার ফলে সেখানে একটি শহর গড়ে ওঠে যার নাম হয় ঢাকা। রাজা বল্লাল সেনই হিন্দুদের বিভিন্ন বর্ণের পুনর্বিন্যাস করেন। হিন্দু সমাজ আজও সেইভাবেই আছে।

মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়

১২০৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পর পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর শাসনভার কয়েকজন কাজীর উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এরা বিক্রমপুর, সাভার ও সোনার গাঁয়ে বসবাস করেন। তৎকালীন ধর্মীয় প্রশাসকদের মধ্যে 'পীর আদম' ছিলেন সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। তিনি বিক্রমপুরের প্রশাসনকার্যে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি ধর্মান্ধতা ও অত্যাচারের জন্য কুখ্যাত হয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়।

পরবর্তীকালে সেখানে বিভিন্ন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিল। দেশের এ অংশে প্রথম যে ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন, তিনি সুলতান উদ্দিন তুঘ্‌রিল। ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই শাসনকর্তা ত্রিপুরায় অভিযান চালান এবং সেখান থেকে ধন-সম্পদ ও হস্তিসহ প্রচুর দ্রব্য লণ্ঠন করে ফিরে আসেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর একসময়ের প্রভু বালিমের (বলবন) বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করেন এবং সম্রাট সোনারগাঁও পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদধাবন করেন। অতঃপর তিনি সেখনে থেকে পলায়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু সম্রাটের সেনাবাহিনীর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশটাকে লক্ষণাবতী ও সোনারগাঁও—এ দুটো প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করা হলে, বাহাদুরখান সোনারগাঁও সরকারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে ফিরিস্তার বর্ণনানুসারে[১] সোনার-গাঁও ও লক্ষণাবতী থেকে অভিযোগ আসছিল যে, আমীর ওমরাহ্ ও শাসকগণ অধিবাসীদের প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা ও অবিচার করছেন। এতদ্ শ্রবণে সম্রাট তুগ্‌লিশাহ্ একদল সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং আলিফ্‌ খানকে দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল পরিদর্শনে যাত্রা করেন। দিল্লী থেকে অগ্রসরমান সৈন্যবাহিনীকে বাধা প্রদান সম্ভব নয় ভেবে বাহাদুর খান অগত্যা তুগলিশাহ বা তুঘলিকের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁকে বন্দীভাবে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাতার বৈরম খান উপাধি

১ মার্কোপোলো উল্লেখ করেন যে, ১২৭২ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি তার্তার বংশীয় প্রসিদ্ধ-খানের রাজদরবারে অবস্থান করছিলেন, তখন সেই সেনাপতি কর্তৃক বাঙালা রাজ্য বিজিত হয়। এ দেশে একজন রাজা ছিলেন এবং এর নিজস্ব ভাষা ছিল। এখানে প্রচুর তুলো উৎপন্ন হতো এবং ব্যাপক ও বিরাট আকারের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো।" —মাস ডেনের অনুবাদ

ধারণ করে তাঁর উত্তরাধীকারী হন ও চৌদ্দ বছর যাবৎ দেশ শাসন করেন। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈরম খানের মৃত্যু হলে, তার সিলাহ্‌দার বা অস্ত্রবাহক ফকরুদ্দিন সুলতান সিকান্দর উপাধি নিয়ে রাজকীয় লাল ছত্র ও অন্যান্য প্রতীকচিহ্ন ধারন করেন এবং নিজেকে স্বাধীন নরপতি হিসাবে ঘোষণা করেন। তিনি সোনারগাঁয়ের সৈন্যদেরকে হাত করে কাদের খানকে নিহত করতে সমর্থ হন। (এই কাদের খানের নিকট একদা তিনি পরাজিত হয়েছিলেন) এবং এভাবে তিনি প্রায় আড়াই বছর যাবৎ পূর্বাঞ্চলীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা আলী মোবারক কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন।

স্বাধীন নরপতিগণ কর্তৃক রাজ্য শাসন

সুলতান সিকান্দরের উত্তরাধিকারী স্বাধীন রাজাদের মধ্যে এই জেলা প্রসঙ্গে যাঁদের নাম ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়, তাঁরা হচ্ছেন ইলিয়াস, খাজা সুলতান শামসুদ্দিন ভাঙ্গর, তদীয় পুত্র ও উত্তরাধিকারী সুলতান সিকান্দর শাহ্‌ ও সুলতান আলা উদ্দীন হুসেন শাহ্‌। এঁরা সবাই জেলার উত্তর ভাগে অবস্থিত একডালা নামক শক্তিশালী দূর্গে বসবাস করতেন। এখানে দু'দুবার সম্রাট ফিরোজ কর্তৃক ইলিয়াস খাজা ও তদীয় পুত্র অবরোধ অবস্থার সম্মুখীন হন। কিন্তু দু'বারই দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যর্থ অভিযান চালানোর পর, সম্রাট তাঁর সৈন্য বাহিনী নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। এবং শেষ পর্যন্ত সুলতান সিকান্দর শাহের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন। একডালা দূর্গ থেকে হুসেন শাহ্‌ কামরূপ অভিযান করতঃ কামরূপের রাজধানী দখল করেন। স্বাধীনভাবে বাঙলা শাসনকারী রাজন্যবর্গের মধ্যে হুসেন শাহ্‌কেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নরপতিরূপে ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন। ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্তমানসের এ দেশ পরিভ্রমণ কালে সুলতান হুসেন শাহ নরসিঙ্গার (উড়িষ্যা) রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। এ সময় তাঁর রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল, এবং তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ২,০০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং মাহুত ছিল বলে উক্ত পরিব্রজক বর্ণনা করে গেছেন।[১]

১ লুইস ভার্তামানস কৃত নেভিগেশন এণ্ড ভয়াজেজ, জেনটেলম্যান অব রোম—রিচার্ড ইডেন কর্তৃক অনুদিত।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকা

বাংলার স্বাধীন নরপতিগণের পরবর্তী শেরশাহী রাজবংশের অধিপত্যের অবসানে এবং ষোড়শ শতকের শেষভাগে ঢাকার সন্নিকটবর্তী অঞ্চল কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরকার বা রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এগুলো এক একটি রাজ্য নামের মর্যাদায় বিভূষিত ছিল। ত্রিপুরাও তখন একটি স্বাধীন এলাকারূপে গঠিত হয় (বর্তমান কালে যেমন আছে) এবং এর রাজারা পূর্বে আরাকানী রাজাদের অধীন ছিলেন। তখন তারা 'মানিক' উপাধি ধারণ করতেন; অন্যদিকে অভিজাত ব্যক্তিরা নিতেন 'নারায়ণ' উপাধি। এর রাজধানী বাক্‌লা—বাকেরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপ পরগণায় অবস্থিত ছিল। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিচ[১] এটিকে একটি সম্পদশালী দেশরূপে বর্ণনা করেন এবং এদেশ—প্রচুর পরিমাণ ধান চাল, তুলো ও পশমজাত দ্রব্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল বলেও তিনি উল্লেখ করেন। শহরের কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে "রাস্তাগুলো বৃহৎ এবং বাড়ীগুলো সুন্দর সাজানো ও উচ্চকারে নির্মিত।" তিনি স্পষ্টতঃ উল্লেখ করেন যে, "রাজা খুব ভদ্র, ও স্বভাব সুন্দর ব্যক্তি। তিনি বন্দুক নিয়ে শিকার করতে যথেষ্ট আনন্দ পান। মেয়েরা তাদের গলায় ও বাহুতে রৌপ্য-নির্মিত প্রচুর গোলাকার অলংকার পরিধান করে থাকে। তাদের পা'গুলো রৌপ্য ও তাম্র-নির্মিত অলংকারাদি দ্বারা সজ্জিত এবং আংটিগুলো হস্তিদন্ত-নির্মিত।" এ সব রাজ্যের মধ্যে একটি ছিল শ্রীপুর। এটি সোনারগাঁও এর প্রায় ছ 'লীগ' দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পর্তুগীজরা এখানে বসতিস্থাপন করেন বলে জানা যায় এবং ফিচের পরিভ্রমণ কালে দেশের এ অংশে সম্পূর্ণ না হলেও তাদের বেশ কিছুটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সোনার গাঁয়ের কথা বলতে গিয়ে, ফিচ্ আরো উল্লেখ করেন যে, এ সকল দেশের প্রধান রাজা ঈশা খান নামে অভিহিত, এবং তিনিই অন্যান্য রাজাদের নেতা। তিনি খ্রীষ্টানদেরও প্রধান বন্ধু।" চণ্ডীখান শহর বাক্‌লার দক্ষিনে মেঘনার মোহনা সংলগ্ন সুন্দরবন অংশে অবস্থিত ছিল। এর রাজা জলদস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতো বলে প্রতীয়মান হয়।

---

১ র‍্যাল্‌ফ ফিচ ছিলেন চীন সম্রাট ও কম্বে রাজার নিকট রাণী এলিজাবেথ কর্তৃক পত্রসহ প্রেরিত দূতগণের অন্যতম ব্যক্তি। 'প্‌রকাস কলেকসন অব্ ট্রাভেলস' দ্রষ্টব্য।

আরাকান রাজ্যের চাটিগাঁ ও সন্দ্বীপ এলাকা

চাটিগাঁ ও সন্দ্বীপ আরাকান রাজ্যের অংশ ছিল। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ভেনেসীয় পরিব্রাজক সিজার ফ্রেডারিক সন্দ্বীপকে সমগ্রদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উর্বর, ঘনবসতি পূর্ণ ও উত্তমরূপে আবাদকৃত এলাকা হিসেবে বর্ণনা করেন। এখানে খাদ্যদ্রব্য অসাধারণ সস্তা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বছরে প্রায় ২০০ জাহাজ লবন দিয়ে বোঝাই করা হতো। দেশের এ অংশে জাহাজ নির্মাণের জন্য এত প্রচুর পরিমান কাঠের উপকরণ পাওয়া যেত যে, কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া অপেক্ষা এ'স্থানে তাঁর জাহাজ নির্মাণ ব্যয় অপেক্ষাকৃত সস্তা দেখতে পান। দীর্ঘ ৮০ বছর পরেও এই দ্বীপের উর্বরতা ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করেন এবং, ভূখণ্ডকে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও ফলপ্রসূ স্থান রূপে বর্ণনা করেন।[১]

আফগানদের বিতাড়ন

সম্রাট আকবরের সৈন্য বাহিনী কর্তৃক বাংলার অভ্যন্তর ভাগ থেকে বিতাড়িত আফ্‌গানদের বেশীর ভাগ লোক উড়িষ্যা ও ঢাকা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখানে তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক সম্মিলিত হয় এবং উত্তর ভাগের বন-জঙ্গলে তাদের আশ্রয় স্থান নির্মাণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজা মানসিংহ আটিয়া পরগণার শ্রীপুরে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তারা অবশ্য শীঘ্রই এই পরাজয়ের হাত থেকে উদ্ধার লাভ করে, এবং অত্যল্পকালের মধ্যে ডেমরার সন্নিকটে গণকপাড়া ও গৌরীপুরে দূর্গ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। কথিত আছে, সেখানে তাদেরকে দমন করতে না পেরে হতাশ হয়ে রাজা মানসিংহ আফগান-দের উৎপীড়ন করা থেকে বিরত থাকেন। ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যু হলে, আফগানদের অন্যতম সেনাপতি ওসমান খান ২০,০০০ হাজার আফগান সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি বাংলার নিম্নাঞ্চল জয় করেন। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দেশের এ অংশে তার আধিপত্য বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে (১৬১২ খ্রীঃ) প্রদেশের (বাংলার) শাসনকর্তা ইসলাম খান কর্তৃক দু'জন মুঘল রাজকর্মচারী সুজাত খান ও ইত্‌মান খান—ওসমান খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা

১ স্যার থমাস হার্বার্টের 'ট্রাভেলস্'। হার্বার্ট ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ পরিভ্রমণ করেন।

নদীর তীরে দীর্ঘস্থায়ী ও তুমুল যুদ্ধের পর ওসমান খান নিহত হন ও তাঁর সৈন্য-বাহিনী পরাজয় বরণ করে। গ্লাডউইন লিখেছেন যে, এই বিজয়লাভের পর, ইসলাম খান তার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। স্টুয়ার্ট কর্তৃক বর্ণিত তারিখ থেকে এটা প্রায় চার বছর পরের ঘটনা, যিনি রাজধানী স্থানান্তরের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উপকূলভাগে মগদের অতর্কিত আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করেন।[১] অন্যদিকে হার্বাটের মতে, আফগানরা ১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে পরাজয় বরণ করেন।[২] তিনি বর্ণনা দেন যে, তারা "প্রধান নগর 'ঢায়েক' (ঢাকা) অবরোধ করে তা জয় করেন," কিন্তু পূর্বোল্লিখিত সুজাত খান ও ইতিমাম খান (Ethamam Khan) "১৫,০০০ সৈন্য নিয়ে ওসমানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। উভয়পক্ষে সাহসিকতাপূর্ণ লড়াই চলে। কিন্তু ওসমানের ব্যবহৃত পাগলা হস্তীর কারণে ইজ্জত খান অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত ও আহত হন। সত্য বটে, মুঘল সৈন্যবাহিনী অপ্রতিভ হয়ে পড়ে; কিন্তু ওসমানকে পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে দেখে আহত ব্যক্তি আশ্চর্য একটা সুযোগ নিয়ে বল্লম দিয়ে তাকে এফোড় ওফোড় করে দেন। এই দুর্ভাগ্যের দরুন পাঠানগণ পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন এবং অবশেষে পলায়ন করেন। অতঃপর মুঘলগণ শুধু ঢাকাই পুনরুদ্ধার করেন নি, পৌত্তলিকদের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক স্বেচ্ছাচার ও লুণ্ঠনকার্য চালান। অতঃপর সমস্ত ধনসম্পদ (এখান থেকে বিপুল ধন সম্পদ আগ্রায় প্রেরণ করা হয়) তাদের সাহসিকতা ও বিজয়ের প্রমাণস্বরূপ স্তূপীকৃত করা হয় এবং ওসমানের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের বন্দী করা হয়"। এ জেলা থেকে আফগানদের বিতাড়নের অত্যল্পকালের মধ্যে ইসলাম খান মগ ও পর্তুগীজগণকে পরাজিত করেন। আরাকানের রাজা পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাসতিয়ান গঞ্জালেসের সঙ্গে আঁতাত করেন।

এ সময়ে সন্দীপ গঞ্জালেসের অধীনে ছিল এবং বিভিন্ন আকারের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ৮০টি যুদ্ধ জাহাজ ছাড়াও, এদের সৈন্য বাহিনী ১০০০ পর্তুগীজ, ২০০০ হাজার অন্যান্য সিপাই, ২০০ শত অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে গঠিত ছিল। এই সেনাবাহিনী নিয়ে তারা প্রদেশের দক্ষিণাংশের উপর আক্রমণ চালায়। মেঘনার পূর্বতীর বরাবর গ্রাম-নগর ধ্বংস করে তাদের সম্মিলিত বাহিনী জল

১ স্টুয়ার্ট কৃত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল'।

২ হার্বাট ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে পরিভ্রমণ করেন।

ও স্থলপথে লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সেখানে মোঘল সৈন্যদলের সঙ্গে তাদের প্রবল যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে তাদের প্রচুর সৈন্য নিহত হয় ও তারা পরাজিত হয়। এই ঘটনার পর ইসলাম খান প্রায় এক বছরকাল যাবৎ ঢাকার শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা কাসিম খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। শাসনকর্তার পদ সৃষ্টির সময় থেকে সুলতান সুজা কর্তৃক রাজধানী স্থানান্তর পর্যন্ত (২৬ বছরের এই মধ্যবর্তী সময়) সম্ভবতঃ এই জেলা আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহ ও বহিরাক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান উড়িষ্যা থেকে অভিযান করেন এবং বেশ কিছু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য ও হস্তীবাহিনী নিয়ে তিনি শহরে উপস্থিত হন। তাঁর আগমনে প্রদেশের শাসনকর্তা ইব্রাহীম খান রাজমহলে পালিয়ে যান। সেখানে বিদ্রোহী যুবরাজ তার অনুগমন করেন। অতঃপর রাজকীয় বাহিনীকে পরাজিত করে এবং নওয়ারা বা নৌবাহিনী দখল পূর্বক (এই সময়ে ইব্রাহিম খান নিহত হন) তিনি উড়িষ্যার সুবাদার আহমদ বেগের পশ্চাদ্ধাবন করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। হার্বাটের বর্ণনায় জানা যায়, এই সমগ্র সম্পদশালী প্রদেশটি লুণ্ঠন ও ধ্বংস করে, এর স্বর্ণ ও মণিমুক্তাদি হস্তগত করে এবং ব্যাভিচার চালিয়ে তিনি অধিবাসীদের নিকট থেকে বলপূর্বক শপথ ও জামিন-স্বরূপ অর্থ আদায় করেন। যুবরাজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আহমেদ বেগ তার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং বিরাট মূল্যের মসলিন বস্ত্রাদি ও আগর কাঠ ছাড়াও, তদীয় চাচা ইব্রাহীম খানের ২৫ লক্ষ টাকা, ৫০০ হস্তি এবং ৪০০ অশ্ব ইত্যাদি সমস্ত সম্পত্তি ও চার কোটি টাকা, সঞ্চিত সরকারী অর্থ-সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেন। শাহজাহানের জবর-দখলের স্বল্পকালীন সময়ে আমীর-ওমরাহ্‌গণের প্রধান খান খানানের পুত্র দরাব খানের হস্তে দেশের সরকার পরিচালনার ভার ন্যস্ত করা হয়। তিনি কয়েক মাসকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁর প্রভুর সাহায্যার্থে সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করায়, যুবরাজ পারভেজ কর্তৃক (প্রভুর পরাজয়ের পর) তিনি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষিত হন এবং তাঁকে ধরার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। হার্বাটের বর্ণনানুযায়ী, এ জেলার জমিদারগণ কর্তৃক তিনি ধৃত ও সম্রাটের শিবিরে প্রেরিত হন। অতঃপর সেখানে সঙ্গে সঙ্গে তার শিরশ্ছেদ করা হয়। দরাব খানের ইতিহাস সম্বন্ধে এটা হচ্ছে হার্বাটের বক্তব্য। কিন্তু অন্য বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি শাহজাহানের নিকট বিশ্বাসঘাতক

প্রমাণিত হন এবং জামিন স্বরূপ তদীয় পুত্র যুবরাজের হস্তে অর্পিত হয়। অবশেষে পুত্রকে পিতার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে জীবন দিতে হয়। আরো জানা যায় যে, দরাব খান পিতার স্বার্থে ও যুবরাজ পারভেজের অনুকম্পার উপর নির্ভর করে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর নিকট আত্মসর্পণ করেন ও বন্দী হন। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীর তাকে রেহাই দিতে অস্বীকার করেন এবং আগ্রায় তার শির পাঠাবার নির্দেশ দেন। খানারিদ খান, মুকাররম খান ও ফিদাঈ খানের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহে অপেক্ষাকৃত শান্তি-সৌহার্দ বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তী কাসিম খান জবঙ্গ, আজিম খান ও ইসলাম খান মাশহাদীর শাসনামলে—তাঁরা পুনরায় তাঁদের সীমান্ত শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমিতে আসামীয়গণ আক্রমণ চালায় এবং প্রায় ঢাকার সন্নিকটে পৌঁছে যায়। এই মুহূর্তে নওয়ারার সাহায্যে ইসলাম খান মাশহাদী তাঁদের মোকাবিলা করেন। এখানে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং এতে আসামীয়দের ৪,০০০ লোক নিহত হয়। মুঘল শাসনকর্তা তাঁদের পশ্চাধাবন করে শত্রুদেশের অভ্যন্তরে ভাগে ঢুকে পড়েন এবং তাঁদের পনেরোটি দুর্গ দখল করেন। পূর্বে বহু বছর যাবৎ জেলার দক্ষিণাঞ্চল সমূহে অতর্কিত আক্রমণ চালানোর ব্যাপারে মগরা কম দুর্ধর্ষ ছিলো না এবং এ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর জঘন্যতম নিষ্ঠুরতা ও বহু লোককে ধরে নিয়ে দাসে পরিণত করার অভ্যাস তাদের ছিল। মগদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এ সময়ে দেশের বিধিবদ্ধকৃত খাজনা সম্পূর্ণরূপে জায়গীরে পরিণত করা হয়। রাজস্ব হ্রাসের পরিমাণ এরূপ ছিল যে, ফিদাই খান বার্ষিক দশ লক্ষ টাকা প্রদানের শর্তে শাসনকর্তার পদ লাভ করেন; এর মধ্যে ৫ লক্ষ দিতে হতো সম্রাটকে এবং আর বাদ বাকি ৫ লক্ষ দিতে হতো নূরজাহান বেগমকে। আরও কথিত আছে যে, আসামীয়দের আক্রমণের সময়ে একটি কানাকড়িও দিল্লীতে পাঠানো হয়নি। কাসিম খান জঙ্গ ও আজিম খানের শাসনামলে মগেরা ভীষণ উৎপাত শুরু করে, কিন্তু ইসলাম খান মাশহাদীর সময়ে আরাকান সেনাপতি মুকুট রায়ের সদ্ব্যবহারের ফলে এ জেলা তাদের আক্রমণের হাত থেকে কিছুটা অব্যাহতি লাভ করে। ইনি তার মালিক আরাকান রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং মুঘল সম্রাটের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। আসাম অভিযান থেকে ফিরে এলে ইসলাম খান মাশহাদীকে সুউচ্চ মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করে তাঁর পদে সাঈফ খানকে নিয়োগ করা হয়। এই

নবাব শাসনকর্তারূপে মাত্র অল্প কয়েক মাস শাসনকার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু তার ইতিহাস সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মহাম্মদ সুজাকে এই সুবা বা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তাঁর বিশ বছর ব্যাপী শাসনকার্য পরিচালনাকালে তিনি রাষ্ট্রের সকল বিভাগের সংস্কার সাধন করে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর শাসনাধীনে দেশের আঞ্চলিক খাজনার একটি উন্নত ধরণের "জমা-তামারী" (Jumma Toomary) বা প্রজার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। উড়িষ্যার এলাকা দখল করে এবং পরবর্তীকালে আসাম-বিজয়ের দ্বারা তোডরমলকৃত সরকার বা পরগণার সঙ্গে পনেরোটি সরকার যুক্ত করার ফলে বেশ কিছু পরিমাণ রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ঢাকায় স্বল্পকালীন অবস্থানের পর সুলতান সুজা রাজমহলকে দেশের রাজধানী করেন। এই সময়ে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর শাসনভার সহকারী শাসনকর্তাদের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং এঁদের প্রথম ব্যক্তি ছিলেন আজিম খান।

মীর জুমলার শাসনকাল

ঢাকার ইতিহাসে বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ যুগ ছিল ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দে মীর জুমলার শাসনকর্তা পদে নিয়োগের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ দেশের প্রধান নগর হওয়া পর্যন্ত সময়কাল। মীর জুমলার শাসনকালে ঢাকাকে পুনরায় রাজধানী করা হয়। আরাকান থেকে আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে মীরজুমলা লক্ষ্যা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি বিভিন্ন দূর্গ নির্মাণ করেন ও শহরের সন্নিকটে কয়েকটি ভাল সামরিক সড়ক ও সেতু তৈরী করেন। আরাকানে হতভাগ্য সুলতান সুজার মৃত্যু সংবাদ লাভ করে তিনি লক্ষ্যার তীরবর্তী হাজীগঞ্জ দূর্গ থেকে অশ্বারোহী গোলন্দাজ ও নৌ-সেনা সম্মিলিত বিরাট বাহিনী নিয়ে আসাম আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সেখানে পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যদলের লোকদের মৃত্যু ও রোগব্যাধির কারণে অবশেষে তিনি সে দেশ থেকে সরে আসেন। অতপর তিনি নিজেও পীড়িত হয়ে পড়েন এবং ঢাকার সন্নিকটে মৃত্যু বরণ করেন। জনশ্রুতি অনুসারে, তার নশ্বর দেহ তদীয় অন্তিম প্রার্থনানুযায়ী ইস্পাহানের কাছে তাঁর জন্মস্থানে নিয়ে কবরস্থ করা হয়। এখানে অদ্যাবধি মুসলমান অধিবাসীগণ মীরজুমলার স্মৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকে। এরা তাঁকে 'খান খানান' নামে ঢাকার নবাবদের মধ্যে সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তারূপে উল্লেখ করে থাকে।

শায়েস্তা খান

সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র শায়েস্তা খান আমীর-আল-ওমরাহ্ মীর-জুমলার স্থলাভিষিক্ত হন। এই নবাবের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোর অন্যতম ছিল চট্টগ্রাম অভিযান। এর ফলে চট্টগ্রাম অবরোধ ও উহা দখল করা হয় এবং মুসলিম সেনাদলের এই সাফল্যের স্মরণে এর নাম পরিবর্তন করে, ইসলামাবাদ রাখা হয়। শাসনকর্তারূপে ফিদাই খান, আজিম খান এবং আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহাম্মদ আজিমের শাসনকার্য পরিচালনার দু'বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সময় ব্যতিরেকে নবাব শায়েস্তা খান দীর্ঘ পনেরো বছরকাল যাবৎ শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময়ে শহরতলীসহ ঢাকা নগরী চৌদ্দ মাইল দূরত্বে অবস্থিত টঙ্গি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমুদয় এলাকা বহু বাগান ও ঘরবাড়ী দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। বর্তমানে এর অধিকাংশ এলাকাই জঙ্গলাবৃত। শায়েস্তা খান কর্তৃক জনসাধারণের ব্যবহার্য বেশ কিছু সংখ্যক অট্টালিকা, যেমন মসজিদ, অনাথ আশ্রম ইত্যাদি নির্মিত হয়। এখানে "শায়েস্তা-খানী" নামে পরিচিত অট্টালিকা নির্মাণ বা বাড়ি-গাঁথার প্রচলিত রীতি বিচার করে প্রতীয়মান হয় যে, শহরের ইষ্টক-নির্মিত বিরাট বিরাট অট্টালিকাসমূহের বেশীর ভাগই তাঁর সময়ে তৈরী হয়েছিল। খাদ্যশস্য ও তৈলের রপ্তানীর উপর অতিমাত্রায় আরোপিত কর আদায়ের অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত সস্তাদামে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা যেত। এই জেলা এই সময়ে বেশ শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ পূর্বে বহু বছর ব্যাপী এরূপ পরিবেশ ছিল না'। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আজ্ঞানুযায়ী দেশের বিভিন্ন ইংরেজ ফ্যাক্টরী—এই নবাব কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং এই নবাব অথবা তার সহকারী বাহাদুর খান কর্তৃক বাণিজ্য প্রতিনিধিগণ ঢাকায় কিছুকাল আটক থাকেন। শোভা সিংহের বিদ্রোহের পর শাসনকর্তার পদ থেকে নবাব ইব্রাহিম খানকে বরখাস্ত করে সম্রাট আওরঙ্গজেব তদীয় দৌহিত্র যুবরাজ আজিম-উস-শানকে বাংলার নিজামত পদে নিয়োগ করেন।

মুর্শিদকুলী খানের দেওয়ানী লাভ

সুলতান সুজার সময় থেকে সরকারী রাজস্বের কোনোরূপ উন্নতি না হওয়ায় ঐ একই সময়ে তিনি সরকারী খাজনা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে

মুর্শিদকুলি খানকে দেওয়ানীর ভার অর্পণ করেন। ইতিপূর্বে মুর্শিদকুলি খান উক্ত বিভাগের নিম্নপদে কার্যরত থেকে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দেওয়ানের প্রাথমিক কার্যাবলীর অন্যতম ছিল—তিন সহস্র-অশ্ব নিয়ে গঠিত রাজকীয় পারিবারিক সৈন্যদল ভেঙ্গে দেয়া (ঢাকার মত নিম্নাঞ্চলে যাদেরকে কাজে লাগানো খুব কমই সম্ভব হতো) এবং তাদের ভরণপোষণার্থে ব্যবহৃত জায়গীরসমূহ পুনর্গ্রহণ বা ফেরৎ নেয়া। এ সব পন্থা অবলম্বন করে এবং প্রদেশের সমানুপাতিক বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কর নির্ধারণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট পরিমাণে সফলকাম হয়েছিলেন। কিন্তু এভাবে সম্রাটের দরবারে অনুগ্রহ লাভ করায় তিনি আজিম-উস-শানের চক্ষুশূল হয়ে উঠেন। আজিম-উস-শান তাঁর সরকারের অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের উপর এরূপভাবে আরোপিত নিয়ন্ত্রণের নিকট নতি স্বীকার করতে পারেন নি। ফলে যুবরাজ তাঁর শাসনকার্যের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি প্রস্তাবের প্রতি অচিরেই প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন। একটি অশ্বারোহী নগ্‌দী-সৈন্যদলের[১] সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহিদ মুর্শিদকুলি খানকে হত্যা করার জন্য পথে ওত্‌ পেতে থাকেন। দেওয়ান যখন যুবরাজের নিকট আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের জন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন উক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ও তাঁর সৈন্যদল রাজপথের উপর দেওয়ানকে সম্ভাষণের জন্য এগিয়ে যায়; তাঁর নিকট তাঁরা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিতভাবে তাদের বকেয়া বেতন দাবী করে এবং তাঁকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদানের চেষ্টা করে। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন এবং তিনি তার সশস্ত্র রক্ষীদলের অগ্রভাগে গমন করে জোরপূর্বক রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। এখানে তিনি আজিম উস শানকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তিরস্কার করেন এবং এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও তিনি তাকে অভিযুক্ত করেন। শুধু তাই নয়, দেওয়ান তাঁকে একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান, কিন্তু যুবরাজ তাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মুর্শিদকুলি খান স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে সম্রাটের নিকট তাঁকে অপমান করার সমুদয় বৃত্তান্ত লিখে পাঠান, এবং যুবরাজের সঙ্গে একই স্থানে থাকাটা আর কোনক্রমেই নিরাপদ নয় বিবেচনা করে তিনি মুকসুদাবাদ বা মুর্শিদাবাদে তার বাসস্থান স্থির করেন। তখন থেকেই ঐ

১ নগদ টাকায় বেতন প্রদান থেকে এরূপ নামকরণ করা হয়।

নগরীর এরূপ নামকরণ হয়। সম্রাটের নিকট তাঁর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজিম-উস-শানকে বিহারে প্রস্থানের নির্দেশ প্রদান করা হয়, কিন্তু বাংলায় তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত না করায়, তিনি তাঁর পুত্র ফররুখশিয়রের হাতে শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন। অতঃপর এই যুবরাজ শের বুলন্দ খানের শলা পরামর্শ মোতাবেক প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ঢাকায় অবস্থানকালে, তিনি তাঁর মহানুভবতা ও ন্যায়বিচারের দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মুর্শিদকুলি খান সম্রাট আওরঙ্গজেব কর্তৃক নাজিম নিযুক্ত হন, কিন্তু ফররুখ-শিয়রের দিল্লীর সিংহাসনে না বসা পর্যন্ত তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নাজিমরূপে স্বীকৃত হননি কিম্বা 'মূতিমান আল মূলক' উপাধি নিয়ে শাসনকর্তার পদেও অভিষিক্ত হন নি। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার পূর্বাঞ্চলের জেলাসমূহের শাসনভার একজন নায়েব বা নাজিমের সহকারীর উপর অর্পণ করা হয়; এবং এই সময় হতে ঢাকা নগরী রাজধানীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোর ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গঠিত প্রদেশটি সমগ্র দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল। উহা উত্তরে গারো পাহাড় থেকে দক্ষিণে সুন্দরবন এবং পূর্বে ত্রিপুরা পাহাড় থেকে পশ্চিমে যশোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। "অন্যদিকে এর নায়েবাত বা শাসনকর্তার পদকে প্রথম শ্রেণীর ও নিজামতের অধীনে সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিয়োগরূপে বিবেচনা করা হতো; কেননা, এই এলাকাটি ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশ হিসেবে সবচেয়ে সম্পদশালী, এবং রাজকীয় হিসাবের খাতায় নির্ধারিত খাজনার হার কম হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক প্রতিনিধির পৃথক জমা-তালিকায় এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।"[১]

১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে মীর্জা লুৎফুল্লাহ নায়েব নিযুক্ত হন। মুর্শিদকুলি খানের এক দৌহিত্রীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেয়া হয়। তিনি এক্ষণে জাফর খান উপাধি ধারন করেন; এবং অন্যদিকে 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি মীর্জা লুৎফুল্লাহকে প্রদান করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্য সম্রাট শাহজাহানের সময় থেকে মুঘল সরকারকে বার্ষিক সামান্য কিছু উপহার-উপঢৌকন দিয়ে আনুগত্য বজায় রাখছিল। এই নায়েবের আমলে উক্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করে প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত

১ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিষয়াদির উপর পঞ্চম রিপোর্টের পরিশিষ্ট।

করা হয়। এই বিজয়ের পর মুর্শিদকুলি খান নামেও পরিচিত মীর্জা লুৎফুল্লাহ তদীয় শ্বশুর সুজাউদ্দিন খান কর্তৃক 'রুস্তম জঙ্গ' উপাধি সহ উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর নবাব সুজাউদ্দিন খানের পুত্র সরফরাজ খান ঢাকার নায়েবের পদে নিযুক্তি লাভ করেন। তিনি মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন এবং দুজন সহকারী শাসনকর্তার সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এদের একজন ছিলেন তাঁর গৃহ-শিক্ষক যশবন্ত রায়, এবং অন্যজন ছিলেন গালিব আলী খান, যিনি আত্মীয়তা সূত্রে পারশ্যের রাজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তাদের যৌথ শাসনামূলে এই প্রদেশ অত্যান্ত সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় ছিল। পূর্ববর্তী নবাবের মন্ত্রী মীর হাবিব কর্তৃক যে শুল্ক ও অত্যধিক কর আদায় করা হতো, তা বাতিল করা হয়; নিরপেক্ষ ভাবে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা হয়; ফলে সমগ্রদেশ ব্যাপী প্রাচুর্য ও শান্তি বিরাজ করতে থাকে। দু'জন সহকারী শাসনকর্তার ঢাকায় থাকাকালীন সময়ে মুরাদ আলী নওয়ারার কর্তৃত্বভার পেয়েছিলেন। এখন তিনি সরফরাজ খাঁর ভগ্নি নাফিসা বেগমের প্রভাবে গালিব আলীর স্থলাভিষিক্ত হন। গালিবের সহকর্মী যশবন্তরায় পরবর্তী সময়ে তার দেওয়ানের পদে ইস্তফা দেওয়ায়, শাসন কার্য মুরাদ আলীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় পড়ে যায়। তিনি তাঁর সহযোগী নওয়ারার পেশকার রাজবল্লভের সঙ্গে মিলিত হয়ে অচিরেই এই জেলাকে সমৃদ্ধিশালী অবস্থা থেকে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও দুঃখ দুর্দশার মধ্যে ফেলে দেন। আলীবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা শাহামৎ জঙ্গ নওয়ারিশ মোহাম্মদ খান অতঃপর সরফরাজ খানের স্থলে শাসন কর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তার পূর্বাধিকারীর ন্যায় মুর্শিদাবাদে বসবাস করেন এবং সম্রাটের দেওয়ান ও সহকারী নাজিম এই উভয়পদে অধিষ্ঠিত থেকে শাসন কার্য পরিচালনা করেন। বৃটিশের বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বহু বছর যাবৎ তিনি উল্লিখিত পদে বহাল ছিলেন। তিনি ঢাকায় তাঁর সহকারীরূপে মুর্শিদাবাদে তাঁর মন্ত্রী হুসেন কুলি খানের ভ্রাতুষ্পুত্র হুসেনউদ্দিন খানকে নিয়োগ করেন। আলীবর্দী খান মসনদে তাঁর উত্তারাধিকারীরূপে তদীয় দত্তক ও দৌহিত্র সিরাজ উদ্‌দৌলাকে মনোনিত করাতে ভাবী-উত্তরাধিকারী ও শাহামৎ জঙ্গের মধ্যে-দ্বন্দ-বিরোধ দেখা দেয় এবং পরিশেষে ঢাকায় হুসেনউদ্দিন খান এবং মুর্শিদাবাদে তদীয় চাচার নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। সিরাজ-উদ্‌দৌলা তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার অভিপ্রায়ে বাকেরগঞ্জ জেলার ধনী

জমিদারপুত্র আগা সাদেককে নিয়োগ করেন। এই ব্যক্তি হুসেনউদ্দিদন খানের একটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল-করার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ গমন করেন; কিন্তু দুর্দশা মোচনের জন্য প্রত্যাশিত বিচারের পরিবর্তে সেখানে তিনি হুসেন কুলি খান কর্তৃক বন্দী হন। অতঃপর সেখানে তিনি সিরাজ উদ্‌দৌলার একটি প্রস্তাব কার্যকরী করতে প্ররোচিত হন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে পালিয়ে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে তখন তার পিতা মহাম্মদ বাখের অবস্থান করছিলেন। নায়েব হওয়ার শর্তে তিনি তার পিতাকে এই ষড়যন্ত্রে শরীক হতে পরামর্শ দেন। অতঃপর এই পক্ষ গভীর রাত্রে রাজ প্রাসাদে প্রবেশপূর্বক হুসেন-উদ্দিনকে হত্যা করে। পরদিন সকালবেলা হত্যার বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে শহরের অধিবাসীগণ একত্রিত হয়ে মারমুখী হয়ে উঠে এবং আগা বাখের ও তদীয় পুত্রকে আক্রমণ করে। নায়েবাত (Neabut) পদে নিয়োগ লাভের সনদ প্রদর্শনের প্রয়োজন হওয়ায় আগা বাখের তরবারী ধারণ করেন, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। নিদারুণ ভাবে আহত হওয়া সত্বেও পুত্র আগা সাদেক পলায়ন করতে সক্ষম হন। অতঃপর শাহামৎ জঙ্গ নওয়ারিশ নওয়ারা মহলের পেশকার রাজবল্লভকে হুসেন উদ্দিনের স্থলে সরকারের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রথম পদক্ষেপ ছিল ষড়যন্ত্রকারীদের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। এর মধ্য থেকে তিনি নিজে জায়গা জমির বেশীর ভাগ অংশ আত্মসাৎ করেন, যা' পরবর্তীকালে রাজনগরের অত্যন্ত মূল্যবান জমিদারী রূপে পরিগণিত হয়। রাজবল্লভ তাঁর শাসন কার্যের স্বল্পকালীন সময়ে দু'কোটি টাকা হস্তগত করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র দাস এই টাকার বেশীর ভাগ অংশ জেলার বাইরে পাচার করে দেয় এবং শাহামৎ জঙ্গের মৃত্যুর পর জগন্নাথ দর্শনের ভান করে কলকাতা পালিয়ে যায়। কৃষ্ণচন্দ্র দাস (কিসেন দাস) ফোর্ট উইলিয়ামে আশ্রয় লাভ করেছিলেন এবং সেখানে তিনি টাকা লুকিয়ে রেখেছেন—এই অনুমান করে নবাব সিরাজ উদ্‌দৌলা তারই সন্ধানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করতে প্ররোচিত হন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং এরই ফলে ইংরেজ সমস্ত দেশের কর্তৃত্ব লাভ করে। যশরত খান (Juseraut Khan) রাজবল্লভের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। এই ব্যক্তি এ জেলার সরকারী মোহ্‌রার ছিলেন এবং তিনি আলীবর্দী খান, সিরাজ উদ্‌দৌলা, কাসিম আলী এবং অন্যান্যদের সমগ্র শাসনামল থেকে শুরু করে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত নায়েব

পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে নবাব কাসিম আলী তাঁকে ঢাকার সকল ইংরেজকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, কিন্তু নবাবের এই বর্বরোচিত আদেশ পালনের পরিবর্তে তিনি উদার চিত্তে তাদেরকে আশ্রয় দান করেন এবং বিশ্বস্ত অনুচর দিয়ে তাদেরকে কলকাতায় প্রেরণ করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ করার প্রাক্কালে বেশ কিছু সংখ্যক রাজবন্দী ঢাকায় ছিলেন। এদের মধ্যে প্রধানতঃ ছিলেন সরফরাজ খান ও হুসেন কুলি খানের পরিবারবর্গের লোকজন।[১]

১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ক্লাইভ তাদেরকে মুক্ত করে দেন এবং তাদের জন্য সর্ব-মোট ৩৪,৭৫৫ টাকার ভাতা মঞ্জুর করেন। এই টাকার কিছু অংশ তাদের বংশধরদের কেউ কেউ এখনও পেয়ে থাকেন। আরবের অধিবাসী মীর মূর্তজার নিকট বিয়ে দেওয়া একমাত্র কন্যার (একমাত্র সন্তানও) গর্ভজাত তিনজন দৌহিত্র রেখে যশরত খান ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র হাসমৎজঙ্গ সাত বছরকাল নবাব ছিলেন; আর নুসরৎজঙ্গ ছিলেন সাঁইত্রিশ বছর। উভয়েই সন্তানহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁদের কনিষ্ঠতম ভ্রাতা শামস্‌ উদ্‌দৌলা তাঁদের উত্তরাধিকারী হন। এই নবাব ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে এবং তদীয় ভ্রাতা নুসরৎজঙ্গের জীবনকালে মীর্জা জান তাপসের সঙ্গে একযোগে বাংলায় বৃটিশ সরকারকে ধ্বংস করার এবং আভ্যন্তরীন বিপ্লব সৃষ্টি ও দেশদ্রোহীতামূলক চিঠি পত্র আদান-প্রদান ইত্যাদির উদ্দেশ্যে বিহারের জমিদারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখার প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিচারের সম্মুখীন হন। বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হন এবং কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে বন্দী ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

অতপরঃ ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে তদীয় ভ্রাতার মৃত্যুকালে তিনি নবাবের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এরই পুত্র কমরউদ্‌দৌলা প্রায় তিন বছর নবাবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে বর্তমান নবাব তার স্থলাভিষিক্ত হন।

---

১ এই সকল বন্দীর মধ্যে একজন ছিলেন সরফরাজ খানের পুত্র আসমানী খান। ইনি ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে যশরত খানকে ধৃত করার জন্যে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন এবং দুর্গের দখল লাভ করেন, কিন্তু জনৈক ষড়যন্ত্রকারীর মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, যিনি বিষয়টি নবাবের নিকট প্রকাশ করে দেন। আবদ্‌ হাদী খান কর্তৃক মীরজাফরকে মসনদ থেকে সরিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে জাফর খান সিরাজউদ দৌলার বিধবা পত্নী লুৎফননেছাকে এই বন্দীশালায় প্রেরণ করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

[নগর—বন্দর—গ্রাম—পরগণা—রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের উপায়।]

ঢাকার অবস্থান

ধলেশ্বরীর সঙ্গে বুড়িগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের প্রায় আট মাইল উপরে, বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে ঢাকা নগরী অবস্থিত। নদীটি এখানে গভীর এবং বড় বড় নৌকা চলাচলের উপযোগী। বর্ষাকালে নদীটি বেশ প্রশস্ত হয় এবং মিনার ও বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে তখন পাশ্চাত্যের ভেনিসের ন্যায়, জলোত্থিত নগরী বলে প্রতীয়মান হয়। ঢাকার পূর্ব সীমায় শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি নিম্ন সমতল পলিমাটি অঞ্চল এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত মুসলমান গোরস্থান, পরিত্যক্ত উদ্যানরাজি, মন্দির-মসজিদ ও বর্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু ঘর-বাড়ী ইত্যাদি সমেত একটি জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ-এর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকের সীমা নির্দেশ করে। বর্ষা মৌসুমে এ অংশের চতুষ্পার্শ্বস্থ নিম্ন সমতল ভূমি বহু ফুট গভীর পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়; এ সময়ে ঢাকা শহর জটিল আকাঁবাঁকা খাল-নালা ও জলাভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, এবং এগুলো বুড়িগঙ্গার সঙ্গে শীতলক্ষ্যার সংযোগ সাধন করে। যে দশটি থানার এলাকা ঢাকা নগরীর অন্তর্ভুক্ত, তার আয়তন ঊনচল্লিশ বর্গমাইল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যে অংশটি নিয়ে শহরটি গঠিত, তা' কেবল নদীর তীরেই সীমাবদ্ধ; এবং তীর বরাবর শহরের রাস্তাঘাট, বাজার ও গলিপথ ইত্যাদি দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১½ মাইল বিস্তৃত। শহরের অভ্যন্তরভাগ ধোলাই খালের একটি শাখা দ্বারা বিভক্ত; অধিকাংশ দেশীয় শহরগুলোর মত এ শহরটি ইস্টক-নির্মিত দালান-কোঠার পাশাপাশি কুঁড়েঘর, সংকীর্ণ আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলিপথ ইত্যাদি নিয়ে অনিয়মিত ভাবে গড়ে উঠেছে। এর প্রধান দুটো সড়ক প্রায় সমকোণে এসে মিলিত হয়েছে। একটি লালবাগ থেকে ধোলাই খাল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দু'মাইলেরও উর্ধ্বে। এটি নদীর সামান্য দূরত্বে প্রায় উহার সমান্তরালে প্রসারিত এবং এর থেকে বহু শাখা-সড়ক নদী তীরবর্তী ঘাটগুলো পর্যন্ত চলে গেছে। অন্য সড়কটি শহরের উত্তর দিকে ক্যান্টনমেণ্ট ও শহরতলীর

দিকে প্রসারিত। এটির দৈর্ঘ্য প্রায় সোয়া মাইল এবং তুলনামূলকভাবে বেশ প্রশস্ত ও পূর্ববর্তীটি অপেক্ষা অধিক নিয়মিতভাবে তৈরী। যে স্থানে এ দু'টো রাস্তা সংযুক্ত হয়েছে, সেখানে ছোট্ট বর্গাকৃতি একটি উন্মুক্ত জায়গা আছে, এবং এর কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকৃতি উদ্যান অবস্থিত। উক্ত বর্গাকার স্থানের নিকটবর্তী এবং নদী তীর বরাবর অর্ধ-মাইলের মধ্যে ইংলিশ ফ্যাক্টরী, সেণ্ট টমাস গীর্জা, সরকারী স্কুল, দেশীয় হাসপাতাল এবং ইউরোপীয় অধিবাসীদের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর অবস্থিত।

চকবাজার

চক বা বাজার এলাকা শহরের পশ্চিম সীমায়, এবং নদীর সমান্তরালে প্রসারিত সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। এটা বেশ বড় আকারের বর্গাকৃতি স্থান এবং প্রধানতঃ মসজিদ ও দোকানপাট দ্বারা পরিবেষ্টিত। যে উন্মুক্ত স্থানে বাজার বসে, তার চতুর্দিকে একটি নীচু দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং চতুষ্পার্শ্বে গাড়ি চলাচলের উপযোগী রাস্তা আছে। এর কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট ভারী কামান আছে; এটি কয়েক বছর পূর্বে নদীতীরে পাওয়া গিয়েছিল। শহরের নানাদিকে অসংখ্য সড়ক রয়েছে; এগুলো অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং আঁকাবাঁকা। প্রায় দশ বছর পূর্বে মিঃ ওয়াল্টার যে সামান্য কয়েকটি রাস্তা প্রশস্ত করেছিলেন, শুধুমাত্র সেই কয়টি রাস্তাই যানবাহন চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। সাধারণতঃ বর্গাকার ও চকের আকারে সজ্জিত মধ্যবর্তী স্থানসমূহ বসতবাটী ও কুঁড়েঘর ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ এবং এগুলো সংকীর্ণ ফুটপাথ দ্বারা একটা অন্যটা থেকে পৃথক ও সাধারণভাবে জঙ্গল এবং গভীর গর্তসমূহ দ্বারা পরিবেষ্টিত; এসব গর্ত থেকে দালান কোঠা নির্মাণের উদ্দেশ্যে মাটি খনন করা হয়েছিল।

স্থাপত্য রীতি

বাংলার অন্যান্য শহরের দালান কোঠার ন্যায় এগুলোর স্থাপত্য রীতি অনেকটা একই রকম। সড়কমুখো বাড়িঘরগুলো সাধারণতঃ খুব অপ্রশস্ত এবং এক থেকে চারতলা পর্যন্ত উঁচু। শহরের কয়েকটি এলাকায় কিছু সংখ্যক বিশেষ শ্রেণীর লোক বাস করে; এসব স্থান হলো তাঁতি বাজার ও শাখারী বাজার। এ সমস্ত জায়গায় গৃহ-নির্মাণের জন্য জমি উচ্চহারে বিক্রি হয়ে থাকে; সেখানে বহু চার-

তলা দালানের সম্মুখভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মত জায়গা রয়েছে ; অপর দিকে পার্শ্ববর্তী দেয়াল সমূহ দরজা বা জানালাহীন নিচ্ছিদ্র এবং পশ্চাদদিকে বিশ গজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের কেবল মাত্র শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার উপরে মধ্যবর্তী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গনের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ইউরোপীয় অধিবাসীগণের বাড়িগুলো বেশ বড় বড় এবং উত্তমরূপে তৈরী এবং দক্ষিণ দিক থেকে আসার সময়ে এসব দালানকোঠা শহরটিকে একটি চমৎকার শোভা দান করে। এগুলোর অধিকাংশই বুড়ীগঙ্গার তীরে অবস্থিত ; এবং এসব দালানের ছাদে উদ্যান রয়েছে। বর্ষা সমাগমে এগুলোর দেয়ালগুলো নদী-বিধৌত হয়ে থাকে। শহরের আর্মেনীয় ও গ্রীক বসতি এলাকায় বেশ কয়েকটি বড় ইষ্টক-নির্মিত বাড়িঘর আছে, কিন্তু এসবের অধিকাংশই এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

জনহিতকর পূর্ত কাজ-কর্ম ও প্রতিষ্ঠানাদি

শহর ও শহরতলীর সাধারণ ব্যবহার্য দালানকোঠা, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থা-সমূহ নিম্নে উল্লেখিত হলো ঃ

(১) দশটি থানা বা পুলিশ স্টেশন। (২) শহরটিকে বিভিন্ন অংশে বিভক্তকারী ধোলাই খাল ও এর শাখাগুলোর উপরে নির্মিত দশটি সেতু ; এগুলোর একটি লৌহ নির্মিত চমৎকার ঝুলন্ত সেতু। ১৮৩০ সালে মিঃ ওয়াল্টারের এখানে ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন সময়ে জনসাধারণের দানে এটি নির্মিত হয়েছিল। এ শহর, প্রধানতঃ সেতুটি নির্মান এবং নগরের অধিবাসীগণের স্বাস্থ্য ও আরাম-আয়াশের সহায়ক অন্যান্য বহুবিধ উন্নয়ন-মূলক কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁর নিকট বিশেষভাবে ঋণী।) (৩) ১৩টি ঘাট বা যাত্রী ওঠা-নামার স্থান। (৪) সাতটি ফেরীঘাট। (৫) ১২টি বাজার—যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ দৈনিক বিক্রয় হয়। (৬) তিনটি ইঁদারা বা কূপ। (৭) ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী। (৮) জজের কাছারী (৯) কলেক্টরের কাছারী। (১০) রাজস্ববিষয়ক কমিশনারের কাছারী। (১১) মুন্সেফ কাছারী। (১২) ডাকঘর। নিম্নলিখিত স্থানের সঙ্গে ডাক যোগাযোগের জন্য এখানে শাখা আছে যথা, কলকাতা, চট্টগ্রাম ও আরাকান ; ময়মনসিংহ, জামালপুর ও আসাম ; সিলেট, চেরাপুঞ্জি ও বরিশাল। (১৩) কোতোয়ালী থানা। (১৪) জেলখানা। (১৫) জেল হাসপাতাল। (১৬) পাগলা-গারদ। (১৭) দেশীয়

হাসপাতাল। (১৮) টিকাদান প্রতিষ্ঠান। (১৯) দাতব্য তহবিল। (২০) সেণ্ট টমাসের গীর্জা। (২১) ব্যাপটিষ্ট মিশন সভাগৃহ। (২২) রোমান ক্যাথলিক গীর্জা। (২৩) আর্মেনীয় গীর্জা। (২৪) গ্রীক গীর্জা। (২৫) হিন্দুদের একশত উনিশটি মন্দির। (২৬) সরকারী স্কুল। (২৭) এগারটি ব্যাপটিষ্ট মিশন স্কুল। (২৮) চৌদ্দটি হিন্দু ও মুসলিম স্কুল। (২৯) মুসলমানদের একশত আশিটি মসজিদ। (৩০) কনজারভেন্সি বা সংরক্ষণ বিভাগ। (৩১) ইংরেজ আর্মেনীয় ও গ্রীকদের সমাধিক্ষেত্র সমুহ। (৩২) শাসনকার্য পরিচালকের দপ্তর (৩৩) সেনাবাহিনীর রসদপত্র যোগানোর দপ্তর। (৩৪) মিলিটারী অরফান স্টেশন কমিটি। (৩৫) দেশীয় পদাতিক বাহিনীর একটি রেজিমেণ্ট ও গোলন্দাজ বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদলের জন্য ক্যাণ্টনমেণ্ট বা সামরিক ছাউনী। (৩৬) হস্তি শালা।

মুসলমানদের উপাসনার স্থান

মুসলমানদের প্রধান প্রধান উপাসনার স্থান হলো ঈদগাহ্ ও হুসেনী দালান। ঈদ-উৎসব পালন করার সময় যুবরাজ সুজা ও তদীয় অসংখ্য অনুচর বর্গের প্রার্থনার স্থান সংকুলানের জন্য ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান সুজার পারিবারিক বিষয়ক দেওয়ান মীর আবুল কাশিম কর্তৃক ঈদগাহ্‌টি নির্মিত হয়।

পরবর্তীটি (হুসেনীদালান) মীর মুরাদ নামক জনৈক ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ইনি সুলতান মোহাম্মদ আজিমের আমলে নওয়ারাহ মহলের দারোগা পদে এবং জন পূর্ত-বিষয়ক কার্যের তত্ত্বধানে নিযুক্ত ছিলেন। হুসেনী দালান সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, মীর মুরাদ স্বপ্নযোগে ইমাম হুসেনকে একটি 'তাজিয়া কান্না' বা শোক-গৃহ উত্তোলন করতে দেখেন; ফলে তিনি বর্তমান অট্টালিকাটি গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করেন, এবং এর নামকরণ করেন হুসেনী দালান। মহররমের সময় উক্ত দালানের আলোকসজ্জা ও পবিত্র পর্ব উপলক্ষে গরীবদের খাওয়ানো ইত্যাদির ব্যয়ভার তিনি নির্বাহ করতেন। তৎকালে তার দ্বারা এজন্য যে ভাতা মঞ্জুর করা হয়েছিল, প্রদেশের পরবর্তী শাসনকর্তাগণ তা' অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে সরকার এই একই উদ্দেশ্যে নবাবকে বার্ষিক ২,৫০০ টাকা মঞ্জুর করেছেন।

হিন্দুদের প্রধান উপাসনার স্থান

ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের প্রধান পূজাস্থান; এটি চকের প্রায় দু' মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এ মন্দিরটি বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কথিত

আছে ; কিন্তু তার নির্মিত মূল অট্টালিকায় কোন চিহ্ন আজ আর বিদ্যমান নেই। এ স্থানটি একজন নবাবের কার্যে নিযুক্ত জনৈক হিন্দু কর্মচারীর সম্পত্তিতে পরিণত হয়, এবং কথিত আছে, বর্তমান মন্দিরটি প্রায় ১০০ বছর পূর্বে কোম্পানীর কমার্সিয়াল ফ্যাক্টরীতে কার্যরত জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

ঢাকা শব্দের উৎপত্তি

কেউ কেউ অনুমান করেন যে, ঢাকা শব্দটির উৎপত্তি ঢাক নামক একটি বৃক্ষ থেকে, যা' এখানে প্রচুর জন্মে। আবার কেউ কেউ ঢাকা শব্দের বুৎপত্তিগত দিকটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন, যার অর্থ "আবৃত" বা ঢাকা, যে নামে বল্লাল সেন দুর্গার সম্মানে তাঁর নির্মিত মন্দিরটিকে আখ্যায়িত করেন। যদিও 'আইন-ই- আকবরী'তে ঢাকার কথা উল্লেখিত হয়নি, তথাপি স্থানীয়দের বক্তব্য অনুসারে এ শহরটি মুঘল-বিজয়ের পূর্বেই বেশ বিস্তৃত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। জনশ্রুতি এই যে, এ শহরে প্রথমে "৫২ টি বাজার ও ৫৩টি সড়ক" ছিল। এবং এ অবস্থা থেকে শহরটি একটি দীর্ঘ ও কিছুটা অসুবিধাজনক নাম "বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলি" রূপে অভিহিত হয়। এগুলোর একটি 'বাঙলা বাজার' নামে আখ্যায়িত এবং এখন ও তা' বিদ্যমান আছে ; এবং আমার বিশ্বাস এটি বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রাচীনতম কেন্দ্ররূপে সারাদেশব্যাপী পরিচিত। এটা উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম পাদে 'বাঙালা শহর' নামে একটি শহর ছিল বলে প্রায়শঃই ইউরোপীয় পর্যটকগন কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দৃশ্যতঃ ঢাকার অবস্থান স্থান পেয়েছে। রেনেল সাহেব এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "কিছু সংখ্যক পুস্তক ও ম্যাপে আমরা 'বাঙালা' নামে অভিহিত যে একটি বড় ধরনের শহরের সাক্ষাৎ লাভ করি, বর্তমানে তার কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। এটি গঙ্গার পূর্ব-দিগস্থ সঙ্গম স্থলের সন্নিকটে অবস্থিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং আমার অনুমান এই যে, এর অবস্থান পরবর্তী সময়ে নদীতে গ্রাস করে ফেলেছে। সম্ভবতঃ বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙালা শহরের অস্তিত্ব বজায় ছিল।" এটা অসম্ভব নয় যে, "বায়ান্ন বাজার, তেপান্ন গলি" নামের যে শহরটি ছিল, তারই উল্লেখ এখানে পরোক্ষভাবে করা হয়েছে এবং যে, 'বাঙালা' নামটি দ্বারা এ শহরের অসংখ্য বাজারের মধ্যে অন্ততঃ একটি পরিচিত ছিল, সমগ্র শহরটিকে বোঝাতে ইউরোপীয়গণ সেটাকেই ব্যবহার করেছেন। এটা সম্ভবতঃ তারা এজন্য

করেছেন যে, সারা শহরের মধ্যে উক্ত বাজারটি এমন একটি স্থানে অবস্থিত ছিল প্রধানতঃ যেখান থেকে তৎকালে বিদেশীয়দের সঙ্গে সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো হতো। ঢাকা ও বাঙালার অভিন্নতা ধারণা করার পক্ষে যা' আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে, তা হলো এই যে, একই পর্যটক কর্তৃক এগুলোর একটি নামেরই বরাবর উল্লেখ। বাংলার প্রধান প্রধান শহরগুলো নিরূপণ করতে গিয়ে, মেথড দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাজমহল ও বাঙালার উল্লেখ করেন এবং এগুলোকে "পরীর শহর" বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে প্রায় একই সময়ে পরিভ্রমণরত হার্বাট ও মনডেলসো ঢাকা ও রাজমহলের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন, কিন্তু বাঙালা শহরের কোনা উল্লেখ করেন নি।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ শহরটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার কথাও এদেশের কোন কিংবদন্তী বা জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় না। স্থানীয়রা, যারা এ জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থানগুলোর অবস্থান, এবং নদীর ভাঙ্গনের ফলে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর সঙ্গে সুপরিচিত, তারা এভাবে শ্রীপুর ও কাটাশূর নামে দুটো শহরের উল্লেখ করে থাকেন, কিন্তু বাঙালা শহরের অস্তিত্বের কথা, তারা কখনও শোনেননি। এ অবস্থা থেকে অনুমান হয় যে, "বায়ান্ন বাজার, তেপ্পান্ন গলি" বা ঢাকার পরিবর্তে বিদেশী বণিকগণ কর্তৃক প্রথমে ঐ নামটি ব্যবহৃত হতো, যার পরবর্তী নাম সম্ভবতঃ ঢাকেশ্বরীর সন্নিকটে শহরের পশ্চিমাংশের প্রতিই শুধুমাত্র প্রযোজ্য ছিল।

ভার্থেমা কর্তৃক বাংলার বর্ণনা

১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে ভার্থেমা কর্তৃক বাঙলা এমন একটি স্থান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, যা উর্বরতা ও সকল প্রকার প্রাচুর্যে পৃথিবীর যে-কোন শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। তিনি আরো বলেন, "এলাকাটি সমস্ত রকম জিনিষপত্রে এত প্রাচুর্য মণ্ডিত যে, সেখানে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য বা বিলাস ব্যসনের জন্য প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব নেই ; কেননা, সেখানে একই রকমভাবে সর্বপ্রকার পশুপাখি, বলকারক ফলমূল, এবং প্রচুর শস্যপাতি ও সকল রকম মশলা দ্রব্য অত্যন্ত সুলভ। অনুরূপভাবে সুতী, মিশ্রিত পশমী ও রেশমী বস্ত্রাদির প্রাচুর্য এত ব্যাপক যে, আমার মনে হয় এ সমস্ত জিনিষের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর সমকক্ষ অন্য কোন দেশ নেই।"

আটিয়া পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুরে আফগানদেরকে পরাজিত করার পর রাজা মানসিংহ ঢাকেশ্বরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ শহরের সেই অংশে ঢাকায় তাঁবু স্থাপন

করেন, এবং কিছুকাল এখান থেকে সরকারের শাসনকার্য পরিচালনা করেন বলে জানা যায়; উক্ত স্থান উর্দু নামে পরিচিত। ১৬০৮ এবং ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময় না-আসা পর্যন্ত ঢাকা কোনরূপ রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানরূপে পরিগণিত হয়নি। এ সময়ের পূর্বে, সোনারগঞ্জ ছিল মুঘলদের প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনার কেন্দ্র, কিন্তু আফ্‌গান ও মগদের আক্রমণ রোধ করার উদ্দেশ্যে সুবাদার ইসলাম খান রাজমহল থেকে রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। তিনি এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন এবং আকবরের আমলে স্থাপিত নওয়ারাহ বা নৌবহর ও গোলন্দাজ সেনাদলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন; এবং দিল্লীশ্বরের সম্মানার্থে স্থানের নাম পরিবর্তন করে 'জাহাঙ্গীর-নগর'[১] নামকরণ করেন। উল্লেখিত দুর্গটি বর্তমান জেলখানা এলাকা এবং পার্শ্ব-বর্তী হাসপাতাল ও এর মধ্যকার দেয়াল বেষ্টিত অংশ, নবাবের প্রাসাদ ও উদ্যানরাজি, বিচারালয় ও টাকশাল প্রভৃতি এলাকাসমূহের উপর স্থাপিত ছিল। বর্তমানে এর কোন চিহ্নই বিদ্যমান নেই। পরবর্তী শাসনকর্তাগণ কর্তৃক নির্মিত এবং বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রধান প্রধান জনহিতকর দালান-কোঠা হচ্ছে বড় কাট্‌রা ও লালবাগ প্রাসাদ। পূর্বোক্তটি ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মহাম্মদ সুজার আদেশে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি চকের সম্মুখভাগে লালবাগের প্রায় অর্ধমাইল পূর্বদিকে অবস্থিত, এবং চক ও বুড়িগঙ্গার মধ্যবর্তী বেশ কিছু পরিমাণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। বুড়িগঙ্গার পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুর্গের বিস্তীর্ণ সম্মুখভাগ রয়েছে; এতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবেশপথ সহ একটি বিরাট কেন্দ্রীয় দরজা বিদ্যমান, এবং মূল অট্টালিকার উপরে বেশ কিছুটা উচুঁ দুটো অষ্টভুজা বুরুজ আছে। পূর্বে কাটরার সম্মুখভাগে অত্যন্ত বৃহৎ দুটো কামান ছিল: এ দুটো কামানই মীর জুমলার আমলে তৈরী হয়েছিল এবং উক্তস্থানে স্থাপন করা হয়েছিল বলে কথিত হয়। এ দুটোর একটি (দুটোর মধ্যে বড়টি) নদীর মধ্যস্থলে ছোট্ট দ্বীপের উপর রাখা হয়েছিল। কয়েক বছর পূর্বে এটি নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। অন্যটি যা' সোয়ারীঘাটে, বা নবাবের অবতরণ স্থানে অবস্থিত ছিল, তা' ১৮২৮ সালে চকের কেন্দ্রস্থলে অর্থাৎ এর বর্তমান স্থানে টেনে আনা হয়। কামানটি পেটা লোহায় নির্মিত, এবং এর ওজন ৬৪,৮১৪ পাউণ্ড।

১ গ্লাডউইনের মতে, একে জাহাঙ্গীরাবাদ বলা হতো। গ্লাডউইনকৃত 'লাইফ অব জাহাঙ্গীর' দ্রষ্টব্য।

লালবাগ

লালবাগস্থ প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মহাম্মদ আজিম ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে শুরু করেন, এবং অসম্পূর্ণ অবস্থায় তদীয় স্থলাভিষিক্ত শাসনকর্তা আমীর-আল ওমরাহ শায়েস্তা খানের নিকট রেখে যান। এটি চতুর্ভুজাকৃতি (চতুকোণী) করে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং কয়েক বিঘা পরিমাণ জায়গা বেষ্টন করেছিল। অট্টালিকাটি প্রথমে বুড়িগঙ্গার পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে নদীও এর মাঝে একটি মধ্যবর্তী জায়গা পরিলক্ষিত হয়, যা কুঁড়েঘর ও বৃক্ষাদি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে, এবং এ অংশ থেকে অট্টালিকার দৃশ্য অবলোকনে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ দেয়ালগুলো এবং নদীর দিকস্থ উচ্চ সমতল ছাদ ও গুলী চালনার জন্য অট্টালিকার উপরিভাগে নির্মিত বিরাট বিরাট ফোকরগুলো বেশ সুস্পষ্ট; নদীর দিক থেকে এর একটি আধিপত্যসূচক গাম্ভীর্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কয়েকটি প্রবেশদ্বার সহ বর্তমানে দুর্গের এ সকল বহিপ্রতিরোধ ব্যবস্থা, দরবার কক্ষ এবং হাম্মামখানা ইত্যাদিই কেবল প্রাসাদের একমাত্র দৃশ্যযোগ্য অবশিষ্টাংশ।

যদিও অট্টালিকাটি অধুনা শোচনীয় জীর্ণাবস্থায় পতিত, এবং দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তথাপি এখনও এসব অবশিষ্টাংশ থেকে প্রতীয়মান হয়, কতো ব্যাপক ও বিপুল জাঁকজমকের সঙ্গে প্রথমে এ রাজকীয় আবাস-গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ শায়েস্তা খান এ সৌধের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করেননি। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে টাভার্নিয়ার যখন ঢাকা পরিভ্রমণে আসেন, তখন তিনি নবাবকে উক্ত অট্টালিকার প্রাঙ্গনস্থিত অস্থায়ী একটি কাঠের দালানে বসবাস করতে দেখেন। শায়েস্তাখান পরবর্তীকালে প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগে সুলতান মহাম্মদ আজিমের স্ত্রী ও তদীয় কন্যা বিবি পরীর স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। এ সৌধের অভ্যন্তর ভাগের সমাধি স্থানটি মার্বেল ও চুনাপাথরের তৈরী, এবং একটি চমৎকার গম্বুজ দ্বারা অলংকৃত; এর চতুপার্শ্বস্থ পথটি রঙীন পাথরের কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত ও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। ফোয়ারায় পানি সরবরাহকারী পাকা নালাসহ এর অধিকাংশ সাজসজ্জাসমূহ অবশ্য বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অট্টালিকা হচ্ছে ছোট কাট্‌রা, পোস্তাগোলা ভবন ও শহরের বিভিন্ন অংশে নির্মিত কয়েকটি মসজিদ। এর প্রথমটি ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান কর্তৃক

নির্মিত হয়, এবং এখনও এটি তাঁর বংশধরগণের সম্পত্তি। পোস্তগোলা ভবনের বেশীর ভাগ অংশ বিগত বিশ বছরে নদীতে বিলীন হয়ে গেছে, এবং বর্তমানে এর সামান্য একটি অংশ মাত্র দাঁড়িয়ে আছে। এটা সম্ভবতঃ যুবরাজ আজিম-উশ-সান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং তিনি এখানে বসবাস করতেন; উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজিম-উশ্-সানের এখানে বসবাস কালে মুর্শীদকুলি খান যখন তাঁর দর্শনার্থী হয়ে পথ দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন আবদাল ওয়াহিদ কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। শেষ শাসনকর্তা ও শেষ মুঘল যুবরাজ ছিলেন ফররুখশিয়ার। তিনিই ছিলেন একমাত্র মুঘল যুবরাজ, যিনি শেষবারের মত ঢাকায় আগমন করেছিলেন এবং উক্ত প্রাসাদে বসবাস করেছিলেন। তিনি এরই সন্নিকটে ও লালবাগের দেয়ালের পার্শ্বে একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ করেন, যার একমাত্র দেয়ালগুলোই এখন কালের সাক্ষী হয়ে বিরাজ করছে। শায়েস্তা খান ও মুর্শীদকুলি খানের নির্মিত অন্যান্য কয়েকটি বড় বড় মসজিদ এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায়। নদীর অপর তীরে, দুর্গ-পরিখা বেষ্টিত একটি পুরনো অট্টালিকা রয়েছে; এটি নবাব ইব্রাহিম খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে কথিত হয়। শহরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে কয়েকটি সেতু, গোপন হাম্মামখানা ও কূপ ইত্যাদির সন্ধান মেলে। সেতুগুলোর মধ্যে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত হাজীগঞ্জের দুর্গ ও ব্রহ্মপুত্রের দিকে যাবার পথে পুরাতন সামরিক সড়কগুলোর উপর নির্মিত—পাগলা পোল ও টংগি সেতুই প্রধান। বিশেষতঃ এর প্রথমটি যথেষ্ট বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ইংলিশ ফ্যাক্টরী

সম্ভবতঃ, বিলেতে ভারতীয় মসলিনের প্রথম আমদানী হওয়ার প্রাক্কালে, ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের দিকে এখানে ইংলিশ ফ্যাক্টরী নির্মাণ করা হয়েছিল। টাভার্নিয়ার এসময়ে পরোক্ষভাবেউক্ত কারখানার কথা বলেন, এবং এর অধ্যক্ষের নামোল্লেখ করেন। এ অট্টালিকার কেন্দ্রস্থল কিছুকালের জন্য কাছারীরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু ধ্বংসাবস্থায় পতিত হওয়ায়, এটি প্রায় দশ বছর পূর্বে ভেঙ্গে ফেলা হয়। বর্তমানে উক্ত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষরূপে একমাত্র বহির্দেয়ালটি বিদ্যমান আছে।

ফরাসীফ্যাক্টরী

ফরাসী ফ্যাক্টরী ছিল নদীর তীরে অবস্থিত একটি বিরাট অট্টালিকা। সম্প্রতি এর সংস্কার-সাধন করে একে একটি আবাস-গৃহে পরিণত করা হয়েছে। বর্তমানে এখানে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক বসবাস করছেন। ভিটি বা একটি উচ্চ সমতল স্থান ছাড়া ওলন্দাজ কারখানার কোন অস্তিত্বই এখন আর বিদ্যমান নেই।

মুঘল সরকারের আমলে পুলিশ ব্যবস্থা

মুঘল সরকারের আমলে শহরটি একজন ফৌজদার ও ছ'জন আমিনের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এসব কর্মচারীসহ ৮০ জন পিয়ন ও পাইক, ৫০ জন অশ্বারোহী ও বরকন্দাজ নিয়োজিত ছিল। ৫২টি ছাবুত্রা বা ছাপড়া (এর কয়েকটি বর্তমানে থানা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে) তাদের বসবাসের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল এবংপ্রধানতঃ ভূমি-মঞ্জুরীর (জায়গীর) মাধ্যমে এদেরকে বেতন দেয়া হতো। আদালত ও ফৌজদারী কোর্ট ছাড়াও, 'ইত্তিসাব' নামে অভিহিত একজন রাজ-কর্মচারী ছিলেন। শহরে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ব্রিটেনের কোনো কোনো অংশে প্রচলিত 'ডীন অব্ গ্লিড' বা সমাজ-অধ্যক্ষের ন্যায় তিনি ওজন ও পরিমাপ ইত্যাদির তদারক করতেন। বিভিন্ন বাজার এলাকায় সংঘটিত বিবাদের মীমাংসা করতেন, এবং জরিমানা ইত্যাদি ধার্য করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি অপরাধীদেরকে শারীরিক শাস্তি প্রদানেরও ব্যবস্থা করতেন। নবাব এবং দেওয়ান ছাড়াও অন্যান্য রাজকর্মচারীগণ ছিলেন কাজী, কাননগু ও ওয়াকানগর; শেষোক্ত অর্থাৎ ওয়াকানগরের দায়িত্ব ছিল নায়েবাতের (Neabut) সরকারী বিভাগসমূহে যা'কিছু ঘটছে সে সম্বন্ধে প্রত্যহ সম্রাটের নিকট খবরাখবর প্রদান করা, এবং রাজধানীতে সরকারী সংবাদপত্র প্রেরণ ও চিঠিপত্র আদান-প্রদান ইত্যাদি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করা।

সরকারী সংস্থাপন বিভাগসমূহ

সরকারী সংস্থাপন বিভাগগুলো ছিল—নওয়ারাহ্ বা নৌবহর, তোপখানা বা গোলন্দাজ বাহিনী এবং টাকশাল। পূর্বোক্ত অর্থাৎ নওয়ারাহ্ বিভাগে ৭০০ এর উর্ধ্বে রণতরী, এবং শাসনকর্তাদের ব্যবহারের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিরাট প্রমোদ-তরীও ছিল। দুটো জাহাজ চমৎকার জাঁকজমকপূর্ণভাবে সাজিয়ে

প্রতি বছর আগ্রায় সম্রাটের নিকট প্রেরিত হতো ; কিন্তু পরবর্তীকালে, যখন মুঘল সরকারের আধিপত্য হ্রাস পায় এবং বাংলার নবাবগণ কার্যতঃ স্বাধীন হয়ে যান, তখন থেকে এ সমস্ত জাহাজ প্রকাশ্যে সাড়ম্বরে সম্রাটের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হলেও সেগুলো কখনও মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়ে উপরে পৌঁছায় নি।

নারায়ণগঞ্জ

ঢাকার পরেই নারায়ণগঞ্জ শহরটি জেলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে, ইছামতীর সঙ্গে এর সঙ্গমস্থলে এটি অবস্থিত। এই শহর তিনটি বিভাগ বা বাজার নিয়ে গঠিত ও নদী বরাবর তিন মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। এখান থেকে জলপথে সারা বছর ধরে কলকাতা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে এবং বর্ষা সমাগমে আসামের সঙ্গে (ময়মনসিংহ হয়ে) যাতায়াতের সুবিধা-সুযোগ রয়েছে। এটাকে ঢাকার বন্দর বলা যেতে পারে, যেখান থেকে স্থল পথে এর দূরত্ব প্রায় আট মাইল এবং জলপথে বারো মাইল। লবণ, তৈলবীজ, খাদ্যশস্য, চিনি, ঘি, তামাক, ধাতবদ্রব্য, কাঠ, চুণ ইত্যাদি বহু পণ্য দ্রব্যের এটি একটি বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র ; এবং আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত অসংখ্য নৌকা ও মাঝিমাল্লাদের একটি বিরাট আস্তানা। চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে বাৎসরিক আমদানীকৃত লবণের পরিমাণ ৫,০০,০০০ মণ এবং ব্যবসায়ে নিয়োজিত দোকানের সংখ্যা প্রায় একশত ষাট। কিছু সংখ্যক চীনা অধিবাসীসহ আরাকানেরও নিম্নাঞ্চল থেকে বহু মগ ও সাধারণ লোকজন উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর সময় নারায়ণগঞ্জ বন্দরে আগমন করে। তারা খয়ের, তুলা, সেঁকো বিষ, গোলমরিচ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে এখান থেকে সুপুরি, চিনি, তামাক ও বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুত দ্রব্যাদি ক্রয় করে থাকে। ১৮৩৮ সালের লোকগণনা অনুসারে, এ বন্দরের লোক সংখ্যার পরিমাণ ৬,২৫২ ; এদের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ হিন্দু এবং কিছু সংখ্যক গ্রীকসহ এরাই একচেটিয়াভাবে লবণ ব্যবসায়ে লিপ্ত আছে। বিগত ত্রিশ বছরে এ স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশ কিছু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, এবং সম্ভবতঃ এর পূর্বোক্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বেশীর ভাগ বর্তমানে সিরাজগঞ্জে স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এ বন্দরটি যমুনার প্রশস্তরূপ ধারণ করার সময় থেকে বাংলার এই অংশের গ্রামাঞ্চলের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে মীরজুমলা কর্তৃক নির্মিত

কয়েকটি দুর্গ অবস্থিত। এবং এর প্রায় বিপরীত দিকে কিছুটা প্রাচীন জায়গায় 'কদম-রসুল' অবস্থিত। দেশের এ অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণের নিকট এটি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পয়গম্বরের পায়ের ছাপ বহনকারী পাথরটি ছোট একটি মস্‌জিদে রাখা হয়েছে; এবং উক্ত মস্‌জিদটি ফকিরদের অনেকগুলো কুঁড়েঘর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ফকিরগণ পয়গম্বরের ব্যবহৃত এ পাথরটি দর্শনার্থে আগত তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে লব্ধ দানে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নদী থেকে বিরাট তোরণদ্বারে আসতে কয়েক কদমের পথ মাত্র এবং শীতলক্ষ্যা থেকে সুস্পষ্টরূপে এর দৃশ্য চোখে পড়ে।

বিক্রমপুর

বিক্রমপুর পরগণা শহরের প্রায় বারো মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্বে ইছামতী ও মেঘনা, পশ্চিম দিকে গঙ্গা, দক্ষিণে কীর্তিনাশা এবং উত্তরে পরগণা জামালপুর-এর সীমা নির্দেশ করে। এটি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্বরা ভূভাগ। এখানে ধান-চাউল, চিনি, তুলা, জাফরান, পান-সুপুরি, নারকেল, লেবু ও নানা ধরনের ফলমূল এবং শাক্‌সব্‌জি প্রচুর জন্মে। এসব দ্রব্যাদি প্রধানতঃ শহরের বাজারগুলোতে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। পূর্বদিকে, এ ভূভাগের বৃহত্তর অংশ কৃত্রিমভাবে উচুঁ করা ভূমি নিয়ে গঠিত ও নিবিড় ঘন উদ্যান-রাজিতে আচ্ছাদিত এবং সংকীর্ণ খাল-নালা ও পুকুর ইত্যাদি দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। অপরপক্ষে, এর পশ্চিম দিকটিতে ভূমিভাগ নিম্ন। এখানে প্রায় ১৫ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট একটি জলাভূমি রয়েছে; এটি নল-খাগড়ায় পরিপূর্ণ এবং সারা বছরব্যাপী আংশিক ভাবে জলমগ্ন থাকে। এ এলাকা খুবই জনবহুল, এবং প্রায়শঃই হিন্দু অধিবাসী অধ্যুষিত; এদের আবার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। বঙ্গজ রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী এবং বাংলার রাজন্য-বর্গের বসবাসের স্থান হিসাবে বিক্রমপুর, বিক্রমাদিত্যের আমল থেকে মুসলমানগণ কর্তৃক তাদের উচ্ছেদ সাধন কাল পর্যন্ত খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। যে স্থানটিতে হিন্দু রাজারা বসবাস করতেন, হিন্দু অধিবাসীগণ এখনও সে স্থানটি দেখিয়ে দেয়। উক্ত স্থানটি রামপাল নামে পরিচিত এবং ইছামতী থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে দেশের অভ্যন্তরভাগে ও ফিরিঙ্গি বাজারের কিছুটা পশ্চিমে অবস্থিত। বল্লাল বাড়ির অবস্থান (বল্লাল সেনের রাজপ্রাসাদ) স্থানে চতুষ্কোণাকৃতি একটি মাটির টিপি পরিলক্ষিত হয়। এর আয়তন প্রায়

৩,০০০ বর্গফুট, এবং এর পূর্বদিকে প্রধান ভূমির সঙ্গে সংযোগ সাধনকারী একটি রাস্তা বা বাঁধসহ প্রায় ২০০ ফুট প্রশস্ত দুর্গ-পরিখা দ্বারা এর চতুর্দিক পরিবেষ্টিত।[১] এই বেষ্টন-করা জায়গার কোথাও অট্টালিকার কোন চিহ্নই বিদ্যমান নেই, কিন্তু এর সন্নিহিত অঞ্চলে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামাঞ্চলের বহু মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত জায়গা জুড়ে অসংখ্য ইটের পাঁজা বা ঢিপি এবং উপরিভাগের নিম্নে মাটির অনেক গভীরে দেয়ালসমূহের ভিত্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সকল স্থান দূর অতীতে অট্টালিকা ইত্যাদি নির্মাণের জন্য উপকরণাদি সরবরাহ করতো। বল্লাল বাড়ির সন্নিকটে 'অগ্নিকুণ্ড' নামে অভিহিত বিরাট একটি গহ্বর পরিলক্ষিত হয়। কথিত আছে যে, বিক্রমপুরের শেষ হিন্দু রাজা এবং তদীয় পরিবারবর্গ মুসলমানদের আগমন সংবাদে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। কিংবদন্তি এই যে, রাজা তাঁর রাজ্য-আক্রমণকারীদের মোকাবিলা করার জন্যে বের হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে একটি সংবাদ-বাহক কবুতর সঙ্গে করে নিয়ে যান। রাজপ্রাসাদে পরিবারের লোকজনদের নিকট কবুতরটির ফিরে আসার অর্থ ছিল রাজার পরাজয়ের দুঃসংবাদ, সুতরাং আত্ম-হত্যা করার সংকেত। সম্ভবতঃ রাজা জয়লাভ করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি যখন সারাদিনের যুদ্ধের ক্লান্তি শেষে নদী থেকে জলপান করার জন্যে ঝুঁকে পড়েন, তখন তাঁর পোশাকের গোপন-স্থান থেকে পাখিটি পলায়ন করে এবং তার নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে উড়ে যায়। রাজা দ্রুত গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, কিন্তু তখন এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরিণতি এড়াবার পক্ষে খুব বিলম্ব ঘটে গেছে। পরিবারবর্গের জ্বলন্ত চিতার অগ্নি-ধূম্র তখনও নির্গত হচ্ছিল; রাজা তাতে নিজেও ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। এভাবে ভারতবর্ষের এ অংশে হিন্দু রাজাদের শেষবংশের রাজত্বের অবসান হয়ে যায়।

বল্লাল বাড়ির কেন্দ্রস্থলে "মিঠাপুকুর" নামে একটি পুষ্করিণী আছে; এবং এর মধ্যে রাজা ও তদীয় পরিবারের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে বলে কথিত হয়। এটাকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় একটি বিরাট পবিত্র স্থানরূপে গণ্য করে থাকে, এবং এরা এর পানি ব্যবহার ও এর তীর থেকে মাটি তোলা ইত্যাদি সযত্নে পরিহার করে। বল্লাল বাড়ি থেকে কয়েক মাইলের

---

১ কয়েক বছর পূর্বে এস্থানে একজন রায়ত হাল চাষের সময় ৭০,০০০ (৭০০০ পাউণ্ড) টাকা মূল্যের একটি হীরক খণ্ড পেয়েছিল: পরে এ নিয়ে প্রাদেশিক আপীল-কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

মধ্যে মুসলমান গাজী পীর আদমের সমাধি ও মসজিদ অবস্থিত। ইনিই প্রথম এখানে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। পরবর্তী অট্টালিকাটি কিছুটা বৃহৎ, পাথরের স্তম্ভের উপর এর ছাদ নির্মিত হয়েছে, এবং এসব স্তম্ভ সৌন্দর্যবর্ধক ও কারুকার্যমণ্ডিত। এদিক থেকে এর চতুষ্পার্শ্বস্থ সাদাসিদা ও অনলংকৃত সমাধিস্তম্ভগুলোর সঙ্গে এটি একটি উল্লেখযোগ্য বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। কিছু সংখ্যক প্রতিবেশী মুসলমান পরিবার উভয় অট্টালিকারই সংস্কার সাধন করে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

বল্লাল বাড়ির সন্নিকটস্থ 'মিঠাপুকুর'টি হিন্দু সম্প্রদায় কর্তৃক যতটা শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়, ঠিক তদ্রূপভাবে মুসলমানগণও এদুটো সৌধের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে এগুলোর পরিচর্যা করে থাকে।

এই পরগণায় আরো কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। কেদারপুরে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়; এটি বানিয়া বংশের চণ্ডী রায় নামক জনৈক রাজার অধীন ছিল বলে কথিত আছে। সম্ভবতঃ বঙ্গজ রাজ্যের পতনের সময়, বুড়িগঙ্গার পশ্চিম ও দক্ষিণে দেশের কয়েকটি অংশে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। এস্থানটি বেশ কিছুটা বিস্তৃত, এবং বর্তমানে অসংখ্য ইটের স্তূপে পরিপূর্ণ। বর্তমানে স্থানটি এত বেশী জঙ্গলাকীর্ণ ও সর্পসংকুল যে, এর সঠিক চিত্র নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। রাজবাড়ির মাঠটিও এই রাজা কর্তৃক তৈরী হয়েছিল বলে কথিত হয়; গঙ্গা ও মেঘনা থেকে এর চিহ্ন সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

ফিরিঙ্গি বাজারে পর্তুগীজদের বসতি

ফিরিঙ্গি বাজার ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত; এখানে প্রথমে পর্তুগীজরা বসবাস করতো। ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খানের আমলে তারা এখানে বসতি স্থাপন করে; এবং আরাকান-রাজের অধীন যে সমস্ত লোক পালিয়ে তৎকালে চট্টগ্রাম অবরোধকারী মুঘল সৈন্যাধ্যক্ষ হুসেন বেগের নিকট আশ্রয় পেয়েছিল, প্রধানতঃ তারাই এখানে বসবাস করতো। একদা এস্থানটি বেশ বড় আকারের ছিল, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের সময় থেকে ক্রমশঃ এটি একটি সামান্য গ্রামে পর্যবসিত হয়েছে; তথাপি এখনও এর কুঁড়েঘরগুলোর মাঝে অল্পকিছু ইটের বাড়িঘর পরিলক্ষিত হয়। ইদ্রাকপুরও ইছামতী নদীর তীরে এবং ফিরিঙ্গি বাজারের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে

মীর জুমলা কর্তৃক নির্মিত একটি বৃত্তাকার দুর্গ, কয়েকটি ইটের দালান-কোঠা ও ঘাট ইত্যাদি বিদ্যমান আছে। সম্ভবতঃ পূর্বে এখান থেকে শাবানদার শুল্ক আদায় করা হতো। অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত 'বাড়নী' বা মেলার জন্য ইদ্রাকপুর বিখ্যাত। এ মেলা প্রায় অর্ধমাসকাল অব্যাহত থাকে; এবং পূর্বাঞ্চলীয় সমস্ত জেলার লোকজন, এবং ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশসমূহ ও কলকাতা থেকে কিছুসংখ্যক বণিক এতে যোগদান করে থাকে। এখানকার পণ্যদ্রব্যগুলো হচ্ছে প্রধানতঃ, বস্ত্র, তুলা, গালিচা, কম্বল, খয়ের, মোম, সাপান কাঠ, মসলা দ্রব্য, ওষুধপত্র, রঙ, লৌহ, তামা কাঁসার বাসন-কোসন, এবং কৃষি সংক্রান্ত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। বিক্রমপুরের প্রধান প্রধান শিল্পদ্রব্যগুলো হচ্ছে মোটা সূতীবস্ত্র, চটের থলি, কাগজ, শীতলপাটি ও মাদুর।

রাজনগর

উর্বরতা শক্তি ও লোক সংখ্যার দিক থেকে বিক্রমপুরের পরেই এ পরগণার স্থান। এটি মেঘনা ও গঙ্গার মূল শাখার মধ্যবর্তী স্থানে ও কীর্তিনাশার দক্ষিণে অবস্থিত। বিক্রমপুরের পূর্বাংশ অপেক্ষা এই অঞ্চলে অধিক নিম্নসমতল ভূমির পর্যায়ভুক্ত এবং বিগত ষাট বছরে বহুবার কীর্তিনাশার প্রবল ভাঙ্গনের মুখে পড়ে বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর নদীগর্ভে কয়েকটি বিস্তীর্ণ পলল ভূভাগ বা চর জেগে উঠেছে, যা বর্তমান সরকারের দখলে আছে। এখানকার প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাল, সুপুরি, নারকেল, চিনি, নীল, তিল, তিসি, সরিষা বীজ, খেসারি ও মুগডাল ইত্যাদি। এই অঞ্চল বর্ষার সাধারণ মৌসুমের সময় এখানকার নদীনালাগুলো হতে অধিক অভ্যন্তরস্থ ভূমিভাগের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গভীর পানিতে প্লাবিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চল সাধারণতঃ দক্ষিণা প্রবল বায়ুপ্রভাবের ফলে অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়, অথবা মে ও জুন মাসের মাঝারি ধরণের ঝড় বৃষ্টির দ্বারা জলমগ্ন হয়ে পড়ে; এবং সমস্ত শষ্যপাতি, বিশেষতঃ নীলের চারা এরূপভাবে প্রায়শঃই বর্ষাকালের প্রারম্ভে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। দেশের এ অংশ ১৭৮৭ সালের বিরাট প্লাবনের সময় ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল। রাজনগরে বেশ কিছুসংখ্যক মুসলমান বসবাস করে এবং এর হিন্দু অধিবাসীদের অধিকাংশই বৈদ্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের দেওয়ান নায়েব নওয়াজিস্ খানের সহকারী রাজা রাজবল্লভের বিস্তীর্ণ ও মূল্যবান জমিদারীর

একটা অংশ ছিল এ'পরগণা। উক্ত জমিদারী প্রথমে ৪০০ তালুক নিয়ে গঠিত ছিল, এবং ১৭৯০ সালে প্রায় তিন লাখ টাকার মত খাজনা সরকারকে প্রদান করতো। এর দু'-তৃতীয়াংশ আসতো তালুকগুলো থেকে, এবং বাদ বাকী তৃতীয়াংশ আসতো জমিদারের দখলিভুত 'নিজ' সম্পত্তি থেকে। জমিদারীটি পরবর্তী সময়ে রাজা রাজবল্লভের পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় ও একটি পারিবারিক আত্মকলহের সূত্রপাত ঘটায়। এটি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত জেলার রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের নিকট একটি বিরাট দুর্ভোগের উৎসরূপে পরিগণিত ছিল। রাজা রাজবল্লভের বংশধরগণের বসতিস্থান রাজনগর গ্রামটি ঐ নামের একটি ছোট নদীর তীরে, মলফৎগঞ্জ থানার অদূরে অবস্থিত। এখানে উচ্চ চূড়াসমেত অত্যন্ত চমৎকার দুটো মঠ আছে এবং কয়েকটি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে রাজার বাসস্থান ছিল। প্রধান মঠটি রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয় এবং অন্যটি তৈরী হয় তদীয় জনৈক পুত্র কর্তৃক ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে।

কার্তিকপুর

এস্থান রাজনগরের দক্ষিণে অবস্থিত বাকেরগঞ্জ জেলার পার্শ্ববর্তী একটি পরগণা। এর গঠন বৈচিত্র্য ও উৎপন্ন দ্রব্যের দিক থেকে এটি রাজনগরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং স্বতন্ত্রভাবে এর বর্ণনা দানের প্রয়োজন নেই।

সোনারগঞ্জ

জেলার উত্তরাংশে শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বেশ বড় আকারের একটি পরগণা। এর কৃষিজাত দ্রব্যগুলো হচ্ছে চাল, তুলা, হলুদ, আদা, সুপুরি ও পান। এ অঞ্চলের পানের বেশ খ্যাতি আছে। পাইনাম, লাঙ্গলবন্দ, বারুধী, কাদুয়া ও মোড়াপাড়া এখানকার প্রধান প্রধান গ্রাম। দেশের এ অংশের প্রথম দিককার মুসলমান শাসনকর্তাদের শাসিত হাবিলী সোনারগঞ্জের প্রাচীন শহর পাইনাম। ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখানদী থেকে প্রায় দু'মাইল অভ্যন্তরে এ স্থানটি অবস্থিত। গুবাক তরুর সারি, তেঁতুল গাছ, আম্রকুঞ্জ ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষলতা এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংখ্য ঘন-সন্নিবেশিত বাঁশবন ইত্যাদি গ্রামটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলেছে। এর অত্যন্ত সন্নিকটে অর্থাৎ কয়েক গজের মধ্যে না আসা

পর্যন্ত গ্রামের অভ্যন্তর ভাগের কোন কিছুই দৃষ্টিগোচর হয়না। খরার দিনে আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পায়ে চলা পথে এ নিভৃত পল্লীতে গমন করা চলে, কিন্তু বর্ষার দিনে এটা আংশিকভাবে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন ছোট ছোট নৌকা কিংবা হাতি অথবা ঘোড়ার পিঠে চড়া ছাড়া এখানে প্রবেশ করা প্রায় সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য। বর্ষার দিনে পাইনাম গ্রাম অসংখ্য বদ্ধ খাল-নালা ও পুকুর-পুষ্করিণীতে পরিবেষ্টিত থাকে এবং প্রচুর বর্ধনশীল ঘাস ও অন্যান্য লতাপাতায় দারুণভাবে ছেয়ে যায়। এখানকার অসংখ্য বৃক্ষরাজির নিবিড় পত্রপল্লবগুচ্ছ সূর্যালোক ঠেকিয়ে রাখে; এ সময়ে গ্রামটি সবচেয়ে বিষণ্নরূপ ধারণ করে; এর অধিবাসীগণের রুগ্ন কৃশ চেহারায় তাদের পরিবেশের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে, জেলার সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর স্থানগুলোর মধ্যে এটিও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এ গ্রামটি খড়ের ঘর ও ইটের তৈরী দু'তিনতলা-উঁচু কোঠার দুটো সারি বা গলি নিয়ে গঠিত। এর চতুষ্পার্শ্বে গভীর কর্দমাক্ত ও বদ্ধ খাল-নালা বিদ্যমান, যা পূর্বে এর প্রতিরক্ষার জন্যে দুর্গ পরিখা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। এই গহ্বরের একটি পুরনো সেতুর উপর নগরের তোরণদ্বারের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তৎকালে যখন বর্তমান সময় অপেক্ষা সেখানে অধিক ধনসম্পদ ছিল, তখন রাত্রিবেলা উক্ত প্রবেশ দ্বারটি বন্ধ রাখা হতো, এবং পরের দিন ভোর না হওয়া পর্যন্ত কাউকেই শহরে প্রবেশ করতে কিম্বা শহর হতে বের হতে দেয়া হতো না। পাই-নামের অতি সন্নিকটে কয়েকটি মসজিদ ও অট্টালিকা ধ্বংসাবস্থায় পড়ে রয়েছে। এগুলো সম্ভবতঃ প্রথম দিককার' মুসলমান শাসনকর্তাগণের বাসস্থান ছিল। পাইনাম থেকে একাধিক মাইল দূরবর্তী না হলেও, বাঘ ও নেকড়ে বাঘে পরিপূর্ণ গভীর বনজঙ্গল থাকায় এস্থানটি প্রায় দুর্গম, এবং হস্তিপৃষ্ঠে ছাড়া, এসব স্থানে গমন করা কারও পক্ষে নিরাপদ নয়। আমার ওখানে যাওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি, তথাপি আমি নিঃসন্দেহ যে, সেখানে ঐতিহাসিক অট্টালিকা বা তার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ডঃ বি. হ্যামিলটন যখন কয়েক বছর পূর্বে দেশের ঐ অংশে পরিভ্রমণে যান, তখন সেখানকার লোকেরা তাঁকে জানায় যে, প্রাচীন সোনারগঞ্জ কবেই নদীতে ভেঙ্গে নিয়ে গেছে, অধিকন্তু এস্থানটি মেঘনার অপর তীরে অবস্থিত ছিল। এটা নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। সোনারগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে কখনও

নদীর কোনো ভাঙ্গন দেখা দেয় নি, বরং অপরপক্ষে ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী ভরাট হয়ে গিয়ে ভূমিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা' প্রথমে ঐ নদীর প্রধান শাখারূপে বিদ্যমান ছিল। মেঘনা নদীর অপর তীরে অবস্থিত ছিল শ্রীপুর, সোনারগঞ্জ নয়। উক্ত শ্রীপুর শহর বিক্রমপুরের অধীন ছিল, এবং কালে তা' কীর্তিনাশা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থানরূপে কিম্বা বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রধান শহর হিসেবে পূর্বে সোনারগঞ্জের যে গুরুত্বই থাকুক না কেন, ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফিচ কর্তৃক এর সম্বন্ধে প্রদত্ত বর্ণনা থেকে কখনও প্রতীয়মান হয় না যে, স্থাপত্য বিষয়ক ঐশ্বর্যের জন্য এর কোনরূপ মিথ্যা দাবী ছিল; বরং এটাই হতে পারে যে, এমনকি, সামান্য ইটের বাড়িঘর যা' পাইনামের বুকে দাঁড়িয়ে আছে, তাও হয়ত কোম্পানী কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য গড়ে তোলার পরবর্তী কোন এক সময়ে নির্মিত হয়েছিল। উক্ত পর্যটক বলেন, "সোনার গাঁ শহরটি শ্রীপুর থেকে ছ'লীগ দূরবর্তী; ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি এখানে তৈরী হয়। ভারতের প্রায় অন্যান্য সকল অঞ্চলের ন্যায় এখানকার বাড়িঘরগুলো অত্যন্ত ছোট ছোট এবং খড়ের ছাওয়া; বাঘ ও খেঁকশিয়ালের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে কিছু মাদুর দিয়ে দেওয়াল ও দরজাগুলোর চতুর্দিক আবদ্ধ করে রাখা হয়। লোকদের অনেকেই অত্যন্ত সম্পদশালী। এখানে তারা কোনরূপ মাংস ভক্ষণ করেনা কিম্বা জীবজন্তু হত্যা করে না। এরা ভাত, দুধ ও ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এদের হাতের কাছে রক্ষিত সামান্য কাপড় চোপড় নিয়েই এরা ঘরের বাইরে যায়, এবং শরীরের বাদবাকি অংশ নগ্ন থাকে।"

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট বলবন প্রদেশের বিদ্রোহী শাসনকর্তা তুঘ্রিলের পশ্চাদধাবন করে সোনারগঞ্জে এসে হাজির হন। তুঘ্রিল ত্রিপুরায় পালিয়ে যান। এই সময়ে সোনারগঞ্জকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশিক সরকারের রাজধানী করা হয়, এবং পরবর্তীকালে এটা বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতিগণের আবাসস্থানে পরিণত হয়। সুলতান সেকান্দর শা'র পুত্র গিয়াসউদ্দিন পাণ্ডুয়া থেকে সোনারগঞ্জে পালিয়ে আসেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করে তাঁর পিতার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। জাফরগঞ্জের সন্নিকটস্থ গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের নিকটে গোয়াল পাড়ায় তাদের যুদ্ধ হয়, এবং এই যুদ্ধে সুলতান সেকান্দর

শা' নিহত হন। খুব বেশী বছর হয়নি—তার সমাধিস্তম্ভ ও কয়েকটি মসজিদ গোয়ালপাড়ায় দেখা যেতো, কিন্তু তা' সবই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ, বাংলার প্রথম আফগান রাজা বিখ্যাত শেরশাহ্‌ও এখানে বসবাস করেছিলেন। তিনি এখানে বিশ্রামের জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে সরাইখানা এবং এস্থান থেকে সিন্ধুর একটি শাখানদী নীলাভ পর্যন্ত প্রতি দু' মাইল অন্তর অন্তর প্রায় তিন হাজার মাইল পথ ব্যাপী কূপ খনন করিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

লাঙ্গল বন্দের মেলা

লাঙ্গলবন্ধ গ্রাম পাইনাম থেকে খুব দূরে নয়, এবং মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত বিরাট হিন্দু পূজা উৎসবের জন্য এখানকার পঞ্চমী ঘাট প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষে এ স্থান ও পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের প্রায় পঞ্চাশ হাজার হিন্দু প্রতিবছর ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীতে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়। এই বিরাট মেলায় ব্যবসায়ীরা বিক্রির জন্যে তাদের পণ্যদ্রব্যাদি নিয়ে আসে। ইদ্রাকপুরের মেলার ন্যায়, এখানকার অনুষ্ঠিত মেলাও বেশ কয়েকদিন ধরে অব্যাহত থাকে। এই পরগণার জনসংখ্যা প্রায় সমান সংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে গঠিত। মসলিন বস্ত্র বয়নই এখানকার অধিবাসীগণের প্রধান পেশা, যার জন্যে সোনারগঞ্জ আবুল ফজল ও ফিচের সময়কার সুখ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁতীদের অধিকাংশই মুসলমান। এরা জামদানী বা বুঁটিদার মসলিন তৈরী করে থাকে; এবং প্রতিবছর এই ধরনের বেশ কিছু পরিমাণ বস্ত্র দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়ে থাকে।

ভাওয়াল

জেলার উত্তরাংশে শীতলক্ষ্যা নদীর পশ্চিম দিকে এবং শহর থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিরাট ভূভাগের নাম ভাওয়াল। এই পরগণায়, বিশেষ করে এর উত্তরাংশে বিরাট অকর্ষিত ভূমিভাগে বিস্তীর্ণ বনভূমি ও উঁচু নীচু স্থান পরিলক্ষিত হয়। এসব এলাকায় পূর্বে লোকের বসতি বিদ্যমান ছিল, কিন্তু বর্তমানে উহা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। শাইল ধান, সরিষা, তিল-তিসি, তুলা, কয়েক প্রকার ফলমূল ও শাক্-সব্‌জি এবং প্রচুর পরিমাণ আনারস, পেয়ারা এখানকার প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। ভাওয়াল গ্রাম, বা নগরী ঢাকা থেকে জলপথে প্রায় একদিনের পথ। এখানে প্রায়

৫০০ বাড়ি-ঘর আছে ; এবং এগুলোর বেশীর ভাগই পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত দেশীয় খ্রীস্টানদের দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে একটি রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আছে ; ভাওয়াল ও এর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলো এর আওতাভুক্ত। এই সমুদয় এলাকাই একটি বিশাল ও মূল্যবান জমিদারী হিসাবে পরিগণিত। এখানে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা ৫,০০০। দেশের এই অঞ্চলের লোকসংখ্যার একটি অংশ অন্তজ-শ্রেণীর হিন্দু, যেমন চণ্ডাল ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। এখানকার কুঁড়েঘরের দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা-দৃষ্টে এদের অনেককেই নিদারুণ দরিদ্র ও নিঃস্ব মনে হয়। এরা প্রধানতঃ জ্বালানী কাঠ, কুঁড়েঘর ছাওয়ার খড় ও কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

টলেমীর প্রাচীন এ্যান্টিঃবোল

টলেমি কর্তৃক উল্লেখিত 'এন্টিবোল' শহরটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত ; এবং 'এন্টিবোল' নামের উৎপত্তি হয়তো ভাওয়াল থেকে হয়েছে, অথবা খুব সম্ভবতঃ এর পূর্বে 'আটিয়া' (পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের নাম) শব্দটি বসিয়ে 'আটি-বাওয়াল' করা হয়েছে, যা' ঐ প্রাচীন ভুগোলবেত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দের অত্যন্ত কাছাকাছি। খুব সম্ভবতঃ উক্তস্থানটি 'অন্টিমেলা' নামেও পরিচিত ছিল এবং সেখানে খুঁটিতে রাজার হস্তি বাঁধা থাকতো ; তা' থেকেই সংস্কৃতে 'হাস্তিমালা' বা 'হাস্তিবান্ধ' হয়েছে। উইল ফোর্ডের ধারণা এস্থানটির অবস্থান ফিরিঙ্গি বাজারে ছিল। কিন্তু এই স্থানটি ভাওয়ালের অন্তর্গত এবং ব্রহ্মপুত্রের একটি শাখা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলেই শুধু নয়, বরং সেখানে একটি স্থান আছে যা' অদ্যাবধি 'হাস্তিবান্ধ' নামে পরিচিত এবং সেখানে পূর্বকালে রাজার হাতি রাখা হতো বলে স্থানীয়রা উল্লেখ করে থাকে। আমি মনে করি যে, খুব সম্ভবতঃ শীতলক্ষ্যা ও বানার নদীর সংযোগস্থলে একডালায় এর অবস্থান ছিল। একডালার কাছাকাছি এলাকা ছোট ছোট, গভীর ও সংকীর্ণ গিরিসঙ্কট দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত পাহাড় শ্রেণীতে প্রবেশ করেছে ; এগুলোর চত্বরসমূহ ঝোপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানকার মৃত্তিকা লাল কাঁকর মাটি ও নিম্নে কমবেশী পরিমাণে পলল-মিশ্রিত কর্দমস্তর দিয়ে গঠিত। ভাওয়ালের অনুরূপ সাধারণ ফসলাদি ছাড়াও, নীলের চাষ ও কফির আবাদও হয়ে থাকে। একডালা দুর্গের নাম প্রায়শঃই বাংলার স্বাধীন রাজাদের ইতিহাসে উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু এর অবস্থান কিম্বা এখানকার সামরিক

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কোনো স্থানের ধ্বংসাবশেষের কোনো চিহ্নই আজ আর বর্তমান নেই। সুতরাং ঐ নামে অভিহিত দুর্গটি খুব সম্ভবতঃ কাপাসিয়ার অন্তর্গত দরদরিয়া নামক স্থানে বানার নদীর পূর্বতীরে একডালার প্রায় আট মাইল উপরে অবস্থিত।

কাপাসিয়া

কাপাসিয়া ভাওয়ালের একটি মহকুমা এবং বানার নদীর তীরস্থ বেশ কিছু পরিমাণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। 'কার্পাস' (তুলা) শব্দ থেকে কাপাসিয়া নামের উৎপত্তি হয়েছে। দেশের এ অংশে কার্পাস তুলার ব্যাপক চাষাবাদ ছিল, এবং এখানে আগের দিনে অত্যুৎকৃষ্ট মস্‌লিন বস্ত্রাদি বয়ন করা হতো। স্মরণাতীত কাল থেকে এ অঞ্চল এর বর্তমান নামেই প্রসিদ্ধ ছিল; এবং দৃশ্যতঃ দেশের এই এলাকায় সর্বাধিক প্রাচীন পুরাকীর্তির স্থানগুলো বিদ্যমান আছে। বর্তমানে দরদরিয়া নামে পরিচিত এবং একডালার প্রায় আট মাইল উপরে বানার নদীর তীরে অবস্থিত একটি লোকালয়ে, প্রাচীন একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, এবং এর বিপরীত দিকে, একটি শহরের ভিত্তিভূমি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কথিত আছে যে, উভয় কীর্তিরাজিই বানিয়া রাজাগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল এবং তাদের দখলে ছিল। নদীটি এখানে প্রায় ৩০০ গজ প্রশস্ত এবং কোন কোন স্থানে ৪০ ফুটেরও অধিক গভীর। এর তীরভূমি লাল মৃত্তিকায় গঠিত এবং পানির প্রান্তভাগ থেকে খাড়াভাবে প্রায় ৪০ ফুট উঁচু (নদীর পানি যখন সর্বাপেক্ষা নিম্নসমতলে অবস্থান করে); এ সময় এর খাড়া পাড়ের বহু স্থানের অবয়ব অনেকটা রাজমিস্ত্রীর কাজ করা মজবুত প্রাচীরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দুর্গটি বাহ্যতঃ অর্ধচন্দ্রাকারে নদী পার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল। কাদা মাটির সঙ্গে একত্রে সংমিশ্রিত লাল মৃত্তিকা দ্বারা এর বহির্দেয়াল গঠিত এবং বর্তমানে এর উচ্চতা ১২ কি ১৪ ফুটের অধিক নয়। এর বেষ্টিত স্থানের পরিমাণ দু'মাইলেরও ঊর্ধ্বে এবং প্রায় ৩০ ফুট প্রশস্ত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমানে এই পরিখা বহুল পরিমাণে প্রাচীর ও সংলগ্ন মাটি পড়ে ভরাট হয়ে গেছে। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পাঁচটি তোরণ দ্বার আছে, কিন্তু বর্তমানে ইষ্টক বা প্রস্তর নির্মিত প্রবেশ-দ্বারের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয়না। কিছুটা দূরে- গড়ের চারদিকের মাটির ঢিপির মধ্যে একই রকম ভাবে তৈরী দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা ব্যূহের সন্ধান পাওয়া

যায়। আরো কিছুটা দূরে, আমরা ইষ্টক নির্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন দেখতে পাই, যার পরিধি ও আকৃতি দীর্ঘ উচ্চভূমি ও খোলা ইট এবং প্রাচীরের ভিত্তি ভূমির একটি অংশ দ্বারা পরিষ্কার ভাবে চিহ্নিত। দুর্গের বহির্ভাগের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ন্যায়, নদীর সঙ্গে সংযুক্ত একটি গর্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি বৃত্তের ছিন্নাংশ পরিলক্ষিত হয়, যার শেষাংশ ধনুকের জ্যা এর বাঁকা অংশের অনুরূপ এবং দৈর্ঘে প্রায় ৩০০ গজ। এই আশ্রয়-ব্যূহের তিনটি গহ্বর ছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং এতে অট্টালিকার দুটো পার্শ্বই পরিব্যাপ্ত ছিল; এগুলো কিছুটা উঁচু ও নদী তীরের কাছাকাছি অবস্থিত। দক্ষিণ এলাকা ইটের একটি গোলাকার ঢিপি নিয়ে গঠিত এবং এটা খুব সম্ভব ঐ দুর্গেরই ভিত্তিভূমি ছিল। উহা দুর্গ প্রাচীরের চারটি অংশ সহ একটি বিরাট দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত, যার ভিত্তিভূমি এখনও লক্ষ্য করা যায়। উত্তর এলাকার গঠন প্রণালী ততটা সুস্পষ্ট নয়; এর দুটো চারকোণাকৃতি উচ্চস্থান আছে। এর বাইরে একটি পুকুর আছে এবং উহা একটি খালের সঙ্গে যুক্ত এবং বেষ্টনী প্রাচীরের বাইরের পরিখার সঙ্গে এটা এখনও দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন প্রাচীরের মধ্যবর্তী ভূমির উপরিভাগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ফাঁকা জায়গা সহ মাটির ঢিপি ও ইষ্টক ইত্যাদি দ্বারা আবৃত; সম্ভবতঃ এ সকল স্থানে একদা জলাশয় বিদ্যমান ছিল। অসংখ্য খোলা ইটও ভূমির উপরিভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পড়ে আছে, এবং নদীর তীরবর্তী স্থানে এর বিরাট স্তূপ দেখা যায়। সম্ভবতঃ অট্টালিকা সমূহের বেশীর ভাগই নদীতে গ্রাস করে ফেলেছে; অথচ আগের দিনে পার্শ্ববর্তী নদীটি খুবই সংকীর্ণ ছিল বলে স্থানীয়রা উল্লেখ করে থাকে। নদীর অপর তীরে অবস্থিত শহরটির বর্তমানে অবশিষ্ট একমাত্র নিদর্শন হলো মাটির ঢিপি ও সমতলের উপরিভাগে ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য খোলা ইট। উক্ত শহর বেশ কিছুটা বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিস্তমান ছিল বলে প্রতীয়মান হয়; এর প্রায় দু'মাইল অভ্যন্তরে দুটো জলাশয় আছে। কথিত আছে যে, বানিয়া রাজাগণ এগুলো খনন করিয়েছিলেন। জলাশয় দুটো বেশ গভীর এবং খুব সম্ভবতঃ এতে ঝরণার মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোর্ট বা কাছারী এলাকা নদীর তীরে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়; এবং এখানেও একটি দরগাহ্ ও মস্জিদের ভিটি পরিলক্ষিত হয়। এগুলো প্রধানতঃ

প্রস্তর নির্মিত ছিল। পরবর্তীটি শেখ আলার মসজিদ নামে পরিচিত ; সম্ভবতঃ সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক উহা নির্মিত হয়েছিল।

রাণী বাড়ী

দেশের এ অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্যে দুর্গটি "রাণী বাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ, এবং উহা রাণীভবানীর সম্পত্তি ছিল বলে কথিত হয়। ইনিই খুব সম্ভবতঃ ধানিয়া রাজাদের শেষ বংশধর ছিলেন, যিনি ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানদের আক্রমণের সময়ে উক্ত দুর্গে বসবাস করছিলেন। নদী ও দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখার গভীরতা থেকে অনুমিত হয় যে, এই দুর্গটি বেশ মজবুত ছিল। খুব সম্ভবতঃ এ দুর্গেই বাংলার দ্বিতীয় স্বাধীন সুলতান ইলিয়াস শামসুদ্দিন ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট ফিরোজ শাহ্ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। উক্ত আছে যে, অবরোধ চলাকালীন সময়ে ইলিয়াস শাহ্ ফকিরের ছদ্মবেশে রাজা বিয়াবানী নামে পরিচিত একজন প্রসিদ্ধ সাধু দরবেশের শেষকৃত্যে যোগদানের উদ্দেশ্যে দুর্গ থেকে বের হয়ে পড়েন। এরপর তিনি সম্রাটের [illegible] দর্শন করেন এবং তাঁকে অভিবাদন জানান, কিন্তু পরিচয় গোপন থাকায় তিনি নিরাপদে অনায়াসে দুর্গে প্রত্যাবর্তনে সক্ষম হন। রাজা, যার কথা উল্লেখিত [illegible], তিনি খুব সম্ভবতঃ রাণী ভবানীর একজন বংশধর ছিলেন। ইলিয়াসের [illegible] উত্তরাধিকারী সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে [illegible] দুর্গ অবরোধ করা হয়। কিন্তু পূর্বের ন্যায় এবারেও আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় সম্রাট তাঁর অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং বাৎসরিক করদানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সন্ধি স্থাপন করে ফিরে যান।[1]

১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্ এই দুর্গটিকে তার [illegible] পরিণত করেন। এখান থেকে তিনি বছরে একবার [illegible] [illegible] ল-আলামের নামের [illegible] নির্মাণ করেন।

তকি এবং এর অবস্থান

কাপাসিয়া অঞ্চলের অন্তর্গত তকি বানার নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত, যেখানে এই নদী ব্রহ্মপুত্র থেকে বেরিয়ে এসেছে। শিশুপালের রাজধানী থেকে

১. স্টুয়ার্টকৃত 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' দ্রষ্টব্য।

এর দূরত্বমাত্র কয়েক মাইল। এই শেষোক্ত স্থানটি দেশের অভ্যন্তরভাগে জঙ্গলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং দরদরিয়ার শহরের মতই নিকটে একটি চমৎকার জলাশয়সহ ইট ও মাটির ঢিপি বিদ্যমান আছে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস এই যে, এস্থানে এখনও মূল্যবান ধনসম্পদ সংরক্ষিত আছে, কিন্তু তারা বিষধর সর্প ইত্যাদির ভয়ে এর অনুসন্ধান কার্য থেকে বিরত থাকে। শিশুপালের বাড়ি বাঘ, চিতাবাঘ ইত্যাদির বিচরণক্ষেত্র এবং গভীর ঘন জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। তকি, সম্ভবতঃ টলেমীর তাগমা, আল ইদ্রিসীর তাউক ও নবম শতকের মুসলমান পরিব্রাজকগণের 'তাফেক' ইত্যাদি নামে উল্লেখিত স্থান। উইলফোর্ড 'তাগমা'কে এন্টিবোলের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, এবং উহা ফিরিঙ্গি বাজারে অবস্থিত ছিল বলে মত প্রকাশ করেন, একথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। অন্যদিকে, ডি. আনভিল 'তাগমা'কে পার্বত্য ত্রিপুরার অনুরূপ একটি পর্বত শ্রেণীর উত্তরে চিহ্নিত করেন। তকি বা তাগমা খুব সম্ভবতঃ শিশুপালের দেশের বন্দর ছিল এবং ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এর সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য নিঃসন্দেহে পূর্বকালে একটি জমাট ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এর নিকটবর্তী অঞ্চলটি উঁচু, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরিমাণে জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়েছে। গ্রামটি বেশ বড়, এবং কাঠের ব্যবসাকেন্দ্র; এ সকল কাঠ পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চল থেকে কাটা হয়, এবং বর্ষার মৌসুমে এস্থান থেকে বানার নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এখানে একটি সাপ্তাহিক হাট বসে, এবং সেখানে কোচ ও রাজবংশীদের প্রচুর সমাগম ঘটে। এরা তুলা, হরিণের শিং এবং অন্যান্য জিনিষপত্র বিক্রয় বা বিনিময়ের জন্য হাটে-বাজারে নিয়ে আসে। এখানে কড়ি তাম্রমুদ্রার স্থান পূর্ণ করে থাকে; দেশের এ অংশে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্রের সস্তা দামের এটি একটি প্রমাণ।

সাভার ও ডেমরা

এ স্থান দুটোর একটা থেকে অন্যটার দূরত্ব মাত্র কয়েক মাইল এবং ঢাকা শহরের পশ্চিম দিকে ও জেলার উত্তরভাগে এগুলো অবস্থিত। প্রথমোক্তটি বুড়িগঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত এবং বানিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজধানী ছিল। কাপাসিয়া শিশুপালের, এবং মধুপুরে যশপালের আবাস-গৃহের মত তাঁর বাসস্থানকে কুঠিবাড়ি (Cote baree) বলা হতো। বর্তমানে এর ইট ও মাটির বিরাট স্তূপ জঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। ডেমরা আরো

উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং বংশী নদীর তীরে, ধলেশ্বরীর সঙ্গে এর সংযোগস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত। সমগ্র জেলার মধ্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎপাদনকারী গ্রাম। রেনেলের মানচিত্রে বেশ বড় আকারের স্থান হিসাবে গনকপাড়া, ঘড়ি ও ঘুরিয়াপাড়া বিশেষভাবে চিহ্নিত। দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এসব জায়গা আফগানদের বাসস্থান ছিল; এরা মুঘলগণের নিকট তাদের পরাজয় বরণের পর দেশের এ অংশে সরে আসেন। কয়েক বৎসর পূর্বে শেষোক্ত স্থানের প্রাচীরগুলোর একটা অংশ কয়েকটি উঁচু তোরণদ্বার ও মসজিদসহ দেখা যেত; কিন্তু এখানকার নদীটি অধুনা দেশের এই অঞ্চলে এর গতিপথের ব্যাপক পরিবর্তন করেছে এবং ঐ সব প্রাচীন কীর্তি ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। বর্তমানে এর আর কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। জনশ্রুতি এই যে, ইসলাম খান যখন দেশের এই অঞ্চলে তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করার মনস্থ করেন, তখন তিনি গনকপাড়াকে এর স্থান হিসাবে নির্বাচন করেন। কিন্তু এর চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল নিম্নভূমি বিধায় তিনি দুর্গ থেকে কামান বন্দুক ইত্যাদি সরিয়ে নেন এবং ঢাকাকে রাজধানী করেন। ডেমরার সন্নিকটে 'পাঠানটুলি' নামক একটি গ্রাম আছে, যেখানে এখনও আফগানদের বংশধরগণ বসবাস করছেন।

রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের উপায়

জেলার নির্মিত মাত্র দুটো সড়ক শহরের সন্নিকটে অবস্থিত। একটি নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত, অন্যটি তেজগাঁও ও টঙ্গি সেতু পর্যন্ত প্রসারিত। প্রথমোক্তটি প্রায় আট মাইল এবং শেষোক্তটি ১৪ মাইল দীর্ঘ। পুরনো সামরিক সড়ক-সমূহের মধ্যে যেটি সবচেয়ে কম ভেঙ্গেছে, সেটি বর্তমানে বেশ কিছু পরিমাণে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়লেও তেজগাঁও সড়কেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ, এবং জেলার উত্তরাংশের মধ্য দিয়ে তকির সন্নিকটস্থ বারমাইয়া পর্যন্ত বিস্তৃত; শহর থেকে তকির দূরত্ব ৪৫ মাইল। সামান্য ব্যয়ে এবং জেলার কয়েদীদের দ্বারা এটাকে সারা বছর ব্যাপী চলাচলের উপযোগী একটি সুন্দর রাস্তায় পরিণত করা যায়। বর্তমানে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও জামালপুরের মধ্যে যাতায়াত প্রায় অসাধ্য, গ্রীষ্মের দিনে ব্রহ্মপুত্রের নিম্নাংশ শুকিয়ে যাওয়ার দরুন, একমাত্র বর্ষার সময় ছাড়া জলপথে ভ্রমণ অত্যন্ত ঘোরালো ও কষ্টকর ব্যাপার। এই রাস্তাটি মেরামত করা হলে এসকল স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সারা বছর চালু

থাকতে পারতো, বিশেষতঃ যখন তকি থেকে ময়মনসিংহ ও জামালপুর পর্যন্ত সমস্ত রাস্তাই ভাল অবস্থায় রয়েছে। এপথে পূর্বোক্ত স্থান পর্যন্ত দূরত্ব হবে ৭০ মাইল এবং পরবর্তী স্থানের দূরত্ব ১০০ মাইল। পুরনো সড়কের আর একটি শাখা বিক্রমপুর অতিক্রম করে গঙ্গা থেকে ইছামতী পর্যন্ত বিস্তৃত; এবং ফরিদপুরের বিল অঞ্চলের দক্ষিণে তালমা হয়ে যে রাস্তাটি চলে গিয়েছে, এটি তারই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই সড়ক সম্ভবতঃ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ নির্মাণ করেছিলেন, এবং একডালা ও সোনারগাঁও থেকে সুন্দরবন অঞ্চলের অন্তর্গত খুলনায় তৎকর্তৃক নির্মিত দুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জেলার অন্যান্য সামান্য যে কয়টি মাত্র রাস্তা আছে, যদি সেগুলোকে আদৌ রাস্তা নামে অভিহিত করা যায়, তবে সেগুলো হলো আবাদী জমির মধ্যবর্তী আঁকাবাঁকা আলপথ, যা' দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করা চলে। এগুলো জমির মধ্যবর্তী আলপথ, যদ্বারা পথচারী বা ভারবাহী পশুর সাহায্যে মালামাল আনা-নেয়া করা যায়।

চক্রযান এ অঞ্চলে প্রায় অজ্ঞাত, এবং সম্ভবতঃ শহরে গরু মহিষাদি চালিত গাড়ির সংখ্যা বারোর বেশী হবে না। কলেক্টর মিঃ ডগলাস ১৭৯০ সালে উল্লেখ করেন যে, ঢাকা শহরে তৎকালে আগমনকারী একদল সৈনিকের দ্বারা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির প্রবর্তন করা হয়। জেলার উত্তরভাগে, যেখানে ভূমি তুলনামূলকভাবে উঁচু, এবং অভ্যন্তরভাগের খাল নালাগুলো শীঘ্রই শুকিয়ে যায়, সে সব জায়গায় সাধারণতঃ মালপত্র পরিবহনের কাজে গরুর গাড়ি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নিম্নপলি অঞ্চলে যেখানে গ্রাম এবং নদী কিম্বা নাব্য খাল নালা ইত্যাদির মধ্যকার দূরত্ব কদাচিৎ তিন বা চার মাইলের ঊর্ধে নয়, সে সব জায়গায় প্রজাগণ তাদের কৃষিজাত দ্রব্য বহন করতে নৌকা ব্যবহার করে অথবা নিজেরাই বহন করে বাজারে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন রকমের নৌকা

'পলওয়ার' নামের এক ধরনের নৌকা এজেলার বৈশিষ্ট্য; এছাড়া, অন্যান্য নানাবিধ নৌকা যেমন বেতের বাঁধাই 'ভাদু', 'দূরী' এবং 'সারিন্দা' এই জেলায় এবং পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহে সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্ষার জলাধিক্যের সময়, প্রজারা তাদের ক্ষেত খামারে কিম্বা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে

যাতায়াতের জন্য কলাগাছের ভেলা, বা উপুড়-করা ও একত্রে বাঁধা মাটির কলসী ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। গঙ্গা, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীতে ৪৬টি নৌকা ও ৯২ জন মাঝি মাল্লাসহ বত্রিশটি সরকারী ফেরী আছে। শুকনোর দিনে হাট বাজারের নিকটবর্তী স্থানে জমিদারগণ অন্যান্য সকল নদীনালায় ফেরীর ব্যবস্থা করে থাকে।

কলকাতার পথ

ডাক চলাচলের যানে ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে সাধারণতঃ নভেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত যাতায়াত সম্ভব। এই পথটি ফরিদপুর, যশোর, বারাসাত ও দমদম স্টেশন হয়ে চলে গেছে। এর দূরত্ব ১১৯ মাইল; বিশ্রাম স্থানের সংখ্যা ২২ এবং ফেরীর সংখ্যা ২০। চট্টগ্রাম পর্যন্ত সড়ক সারা বছরই চালু থাকে। দাউদকান্দি থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত ঘোড়ার গাড়ির চলাচলের উপযোগী ভাল রাস্তা আছে; কিন্তু এ স্থানের পর থেকে রাস্তাটি খারাপ, বিশেষতঃ বর্ষাকালে। এই রাস্তার দূরত্ব ১৬৯ মাইল এবং বিশ্রাম স্থানের সংখ্যা ১৪টি। এই অঞ্চলের নিম্নতা ও বহু বিল ঝিলের অবস্থিতির দরুন, স্থল-পথে সিলেট, কিংবা বাকেরগঞ্জে যাতায়াত কদাচিৎ করা হয়। সম্ভবতঃ, বছরে মাত্র তিন মাসকাল এসব স্থানে গমনাগমন সম্ভব।

ময়মনসিংহে যাবার রাস্তা

ময়মনসিংহ যেতে সাধারণতঃ রূপগঞ্জ পর্যন্ত (শীতলক্ষ্যার তীরবর্তী একটি শহর) স্থলপথে, এবং সেখান থেকে তকি পর্যন্ত জলপথে এবং বাকী পথটুকু ব্রহ্মপুত্রের তীর বরাবর পথ ধরে যাওয়া যায়। সারা বছর জলপথে ঢাকার সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলের ন্যায় সকল অংশের অবাধ যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা যাবার পথেরও পরিবর্তন ঘটে। নবেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত যাত্রীরা বুড়িগঙ্গা, ইছামতী ও মেঘনা নদীপথে রাজাপুর বা ক্ষতিজিঘাটা খাল পর্যন্ত গমন করে এবং শেষোক্ত নদী থেকে কীর্তিনাশায় চলে আসে; সেখান থেকে তারা নরাভগ্নি ও মূলাদি নদী দিয়ে ইদিলপুর হয়ে একটি নদীতে এসে পড়ে, যার তীরে বরিশাল শহর অবস্থিত। অবশিষ্ট পথটুকু সুন্দরবনের অন্তর্গত খুলনা হয়ে যেতে হয়। আর একটি পথ হলো বুড়িগঙ্গা ও

ধলেশ্বরী হয়ে জাফরগঞ্জ ঘুরে গঙ্গায়, এবং সেখান থেকে চন্দরসি ও বড়সি নদী বেয়ে খুলনায় আসতে হয়। দুটোর যে কোন একটি পথে ভ্রমণ সম্পূর্ণ করা সাধারণ আকারের বাউলী নৌকায় সহজেই দশদিনে সম্ভব ; কিন্তু এদুটোর মধ্যে সাধারণতঃ বরিশাল পথে ভ্রমণই বেছে নেওয়া হয়। বর্ষার দিনে ফরিদপুরের খাল দিয়ে সরাসরি পথ বেছে নিয়ে এ সকল পথ পরিত্যক্ত হয় এবং এ পথে বাগ্নাসিয়ার মধ্য দিয়ে মধুখালিতে আসা যায়। শীতলক্ষ্যা, বানার ও ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহে যাবার নদী পথ শুকনোর দিনে কয়েক মাস বন্ধ থাকে, এবং নৌকাসমূহ যমুনা দিয়ে ঘোরালো পথে যেতে বাধ্য হয়। চট্টগ্রামের সঙ্গে সকল সময়ে যাতায়াত অবাধে চলে ; কিন্তু শুধু মাত্র উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সময়, পানসী অথবা এই জেলার নৌকায় এই পথে যাবার চেষ্টা করা হয়। সিলেটের সঙ্গে মেঘনা নদী দিয়ে এবং পশ্চিম প্রদেশ সমূহের সঙ্গে জাফরগঞ্জ হয়ে গঙ্গানদী পথে অবাধে যাতায়াত করা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

[কৃষি—পশুপালন—ভূমির পরিমাপ—খাজনা ও রায়ত—তালুকদার—জমিদার।]

কৃষি

এই জেলা সাধারণ উর্বরতা ও উৎপাদনশীলতার দিক থেকে পার্শ্ববর্তী জেলা ফরিদপুর ও ময়মনসিংহের তুলনায় নিম্নমানের বলে বিবেচিত। হিসেব করে দেখা গেছে যে, এর আয়তনের দুই তৃতীয়াংশ ভূমি আবাদ করা হয়ে থাকে এবং এ আবাদী ভূমির অধিকাংশই দক্ষিণাংশে অবস্থিত।

মৃত্তিকা

উত্তরাংশের উচ্চভূমির অধিকাংশেরই মাটি লাল কাঁকরযুক্ত এবং অনুর্বর; কিন্তু এই অঞ্চলের নিম্নভাগ অর্থাৎ শুকনো ছোট নদী গর্ভ এবং জলাভূমির প্রান্তভাগের মৃত্তিকা কিছুটা পলিযুক্ত উর্বর কাদামাটি দ্বারা গঠিত এবং এতে প্রচুর পরিমাণে ধান এবং অপেক্ষাকৃত উচুভূমিতে সরিষা ও তিল উৎপন্ন হয়ে থাকে। মুঘল শাসনের প্রথম দিকে জেলার এতদ্ঞ্চলের ভূমি কৃষক-প্রজাদেরকে লাখেরাজ হিসেবে দেওয়া হতো এবং মুর্শিদাবাদ প্রদেশের রাজধানী না হওয়া পর্যন্ত 'জঙ্গলবাড়ী স্বত্ব' হিসেবে এর আবাদ চলছিল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ রাজধানী হওয়ার পর কতিপয় 'উপ-নায়েবের' অত্যাচার ও লুঠতরাজের ফলে রায়তগণ দেশের অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়। হাতী, শিকারীজন্তু এবং বন্যা ইত্যাদিও এর অধিকাংশের জনশূন্যতার কারণ হয়ে দেখাদিয়েছিল। রাজস্ব সুপারভাইজার মিঃ কেলস্যালের ১৭৬৯ সনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে হাতী এসে যে ধ্বংস সাধন করতো তাতে পূর্ববর্তী ১২ বছর যাবৎ ভাওয়াল এস্টেটের বার্ষিক রাজস্ব হ্রাস পেয়ে ৫৩,৮৯৯ টাকা থেকে ১৬,৭২০ টাকায় নেমে আসে এবং ঐ একই কারণে পরবর্তীকালেও এ এস্টেটেরই সংলগ্ন কাসিমপুর পরগনার সরকারী রাজস্ব-হ্রাসের কথা প্রায়শঃই উল্লেখ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকদের মুখে শোনা কিংবদন্তী

থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র নদের বন্যা ও পরবর্তী দুর্ভিক্ষে বানার নদীর তীরবর্তী 'দরদরিয়া'য় অবস্থিত নগরী জনশূন্য হয়ে যায় এবং ১৭৮৭ সনের সর্বজনবিদিত একই দুর্যোগ এতদাঞ্চল ছাড়াও জেলার অন্যান্য এলাকায়ও একই রকম ধ্বংস সাধন করেছে। এই শেষোক্ত বন্যার ফলে এ জেলার বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়, বিশেষতঃ দক্ষিণাংশের পরগনাগুলো এবং বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূ-অঞ্চলের গবাদি পশুর প্রাণনাশ এবং রায়তদের মৃত্যু ও গ্রাম ত্যাগের ফলে এ অঞ্চল শীঘ্রই জঙ্গলাবৃত হয়ে ওঠে এবং তা হিংস্র ব্যাঘ্রাদির আবাসভূমিতে পরিণত হয়। ফলে এ অঞ্চল আবাদ করা অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায়। এতদসত্ত্বেও সাম্প্রতিক কালে কৃষির ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং এ বিভাগে ও সাধারণভাবে জেলার সর্বত্র যে পরিমাণ ভূমি বর্তমানে আবাদ করা হয়েছে তার পরিমাণ নিঃসন্দেহে কোম্পানীর শাসন প্রাপ্তি আমলের তুলনায় অনেক বেশী।

কৃষিজাত দ্রব্য

এ জেলার প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য হচ্ছে ধান, জোয়ার, তৈলবীজ, ডাল, তুলা, কুমড়া, নীল, সরিষা, ইক্ষু, মরিচ, আদা, পাট, হলুদ ও তামাক। এ ছাড়া, বাগান ও বাড়ীর আঙিনায় বা নিকটবর্তী মাঠে পান, কুমড়া, শসা, আপেল, মরিচ, বিভিন্ন প্রকারের কচু, আনারস, কলা, আম, লেবু ও নারকেল উৎপন্ন হয়ে থাকে।

এখানে মাটির উর্বরতা প্রধানতঃ বার্ষিক প্লাবনের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু, এ বন্যা কর্ষনযোগ্য ভূমির এলাকা এবং বীজবপন ও শস্য কাটার সময়ও কিছুটা নির্ণয় করে থাকে। এর দ্বারা দক্ষিণ বিভাগের কর্ষণযোগ্য ভূমি স্বাভাবিকভাবে যে সকল অংশে বিভক্ত হয়ে থাকে তা' দেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। এ সব অংশকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত নামে বর্ণনা করা যায়ঃ (১) ভিটা বা কৃত্রিম উচ্চভূমি অর্থাৎ ঘর-বাড়ী ও বাগানের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি—যেখানে ফলের গাছ ও নানাবিধ তরিতরকারী উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। (২) বন্যা-সীমারেখার উর্ধে অথবা কেবল আংশিক প্লাবিত হয়ে থাকে এমন উচ্চভূমি। এখানে তুলা, আখ ইত্যাদি জন্মে। (৩) বন্যা-প্লাবিত ভূমি—এখানে ধান, নীল ও ডাল ইত্যাদি উৎপন্ন করা হয়।

পাঁচ প্রকারের ধান

পাঁচ প্রকারের ধান এখানে উৎপন্ন করা হয় যেমন, বুনা আমন, চোইনা বা দীঘা, আউশ, বোরো ও শাইল। কিন্তু প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার ধানই প্রধান এবং জেলার মোট উৎপন্ন শষ্যের তিন চতুর্থাংশই এ থেকে পাওয়া যায়। আমন ধানের (বুনা বা শীতকালীন শস্য) জন্য সবচেয়ে কম কর্ষণ-যোগ্য জমি নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

এ ধানের জন্য বারো থেকে ষোলটি চাষের প্রয়োজন হয় এবং ডিসেম্বর হতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে জমি তৈরী করতে হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে অথবা প্রথম বৃষ্টি হওয়ার পর বীজ বপন করতে হয়। তবে দারুন খরার মৌসুমে কখনও কখনও এ সব কাজ মে মাসের পূর্বে শেষ হয় না। এক বিঘা জমির জন্য গড়ের ৩২ সের বীজ প্রয়োজন হয় এবং গড়ে ১৬ মণ বা ৬৪০ সের ধান এতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। অধিক বৃষ্টিপাতেও আমন ধান নষ্ট হয় না। তবে পাঁচ ছ'দিন মাঠে পানি জমে থাকলে এ ধান সহজেই পচে যায়। সব রকমের ধানের মধ্যে আমন ধান সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়ে থাকে এবং পানি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এ ধানগাছ দ্রুত বেড়ে ২৪ ঘণ্টায় ১২ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং কয়েক মাসের মধ্যে ১৪ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বন্যা মৌসুমে নদীর পানি হঠাৎ বেশী বৃদ্ধি পেয়ে মাথার উপরে উঠে গেলে এ ধান সব চেয়ে বেশী বিপদে পতিত হয়। তখন ভাসমান বিচ্ছিন্ন জড় পিণ্ড বা আগাছার ভেলা একে সহজেই পানির নীচে ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হয়। আমন ধানই এ জেলায় ব্যাপক ভাবে আবাদ করা হয়ে থাকে এবং এর ৫০ প্রকার বিভিন্ন ধান রয়েছে। এ ধান নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়'।

•ছোটনা বা দীঘাধান বুনা আমনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে আবাদ করা হয়ে থাকে। এটা এপ্রিল ও মে মাসে বপন করা হয় এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে কাটা হয়। এর উৎপাদন আমন অপেক্ষা এক-অষ্টমাংশ কম এবং এ ধানের মাত্র ৩০টি শ্রেণী রয়েছে।

আউশ ধান উচ্চভূমিতে উৎপন্ন করা হয়। এটা ফেব্রুয়ারী মাসে বপন করা হয়ে থাকে এবং বর্ষার প্রারম্ভে ও মে জুন মাসে কাটা হয়।

বোরা বা রোপা ধান প্রধানতঃ জেলার উত্তর বিভাগে চাষ করা হয় এবং ধান চাষের মোট ভূমির এক-তৃতীয়াংশে এর আবাদ করা হয়ে থাকে। এ ধান ময়মনসিংহেও প্রচুর উৎপন্ন হয়ে থাকে।

চাষ প্রণালী

নদী-নালা ও জলাভূমির প্রান্ত ভাগে অবস্থিত নীচু জমি—যেখানে সেচের জন্য অতি সহজেই পানি পাওয়া যায় তা' এই ধান চাষের জন্য নির্বাচন করা হয়ে থাকে। অক্টোবর মাসে অল্প পরিমাণ জমি লাঙ্গল দ্বারা বা পা' দিয়ে মাড়িয়ে এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, তা' ২½ ফুট গভীর কর্দমাক্ত জমিতে পরিণত করা হয় এবং এরূপ হিসেব করা হয় যে, এ সব জমি যেন চৌদ্দ দিন পর্যন্ত আদ্র´তা (ক্ষুদ্র জলকণা) ধরে রাখতে পারে। এভাবে বীজতলা প্রস্তুত করার সময়ের মধ্যে কৃষকদের বাড়ীতে বীজধান হতে অঙ্কুর বের হয়ে থাকে। ঝুড়িতে বীজধান ভরে নিকটস্থ কর্দমাক্ত ঝিল বা জলাশয়ে তা' ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরে ঐ অবস্থায় একে দু'দিন ধরে শুকাতে দিতে হয়। পরে একটি মাদুরে ছড়িয়ে রৌদ্রে দিতে হয় এবং মাঝে মাঝে পানি ছিটাতে হয়। পঞ্চম দিনে দেখা যায় যে, ধান ফুলে অঙ্কুর বের হবার সময় হয়েছে এবং এ সময় তা' বপনের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। বীজতলা 'মৈ' দ্বারা মসৃণ করা হয় এবং অঙ্কুরিত ধান এর উপরে ছিটিয়ে দেয়া হয়। বীজ মাটিতে ভালভাবে শিকড় না গাড়া পর্যন্ত পাখির হাত থেকে বীজধান রক্ষা করার জন্য ৪।৫ দিন ধরে বীজতলা পাহারা দিতে হয়।

অতঃপর ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে চারাগাছ প্রায় এক ফুট লম্বা হলে তা' বীজতলা থেকে তুলে নিতে হয় এবং গাছে বেশী পাতা থাকলে সে সবের মাথা ছেঁটে পানির সন্নিহিত ও আগে থেকে তৈরী করা মাঠে উক্ত চারা রোপন করা হয়। এখানে দু'মাস পর্যন্ত পানি সেচ ও আগাছা দুরীকরণের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। এরপর কেবলমাত্র পাখি ও শুকরের হাত থেকে ধান রক্ষা করার জন্য যত্ন নিতে হয়। মে ও জুন মাসে এই ধান কাটা পড়ে। এর ফলন ও চালের গুণ আউশ ও আমন অপেক্ষা ভাল। চীনদেশেও প্রায় একই ধরনের চাষ প্রণালী অবলম্বিত হয়ে থাকে। ইহুদীদের মধ্যে একটি উপদেশ প্রচলিত আছে যে, "তোমার রুটি (খাদ্য) পানির উপরে ছড়িয়ে দাও, কারণ অনেক দিন পরে তুমি আবার তা' ফিরে পাবে" (" Cast Thy bread upon the waters for thou shalt find it again after many days")। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, জর্ডন নদীর তীরে ইহুদীরা এ ধরনের চাষাবাদ করতো।

শাইল ধান আউশ ধানের মতই চাষ করতে হয়। তবে একমাত্র পার্থক্য এই যে, এ ধান জুন ও জুলাই মাসে অতিরিক্ত কাদাযুক্ত মাটিতে রোপন করতে হয় এবং জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারীতে কাটতে হয়। উত্তর বিভাগে এই ধরনের চাষ স্বতন্ত্রভাবে করা হয়ে থাকে। এখানে কাদামাটিতে ধান-গাছ ভাল জন্মে এবং ঘন বর্ষা ঋতুতে এর সর্বোচ্চ ফলন দেখা দেয়। এই ধানের সাতটি শ্রেণী আছে এবং এ জেলায় উৎপন্ন ধানের মধ্যে এটি উৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। এক বর্গহাত জমিতে গড়ে প্রায় ২০টি বোরো বা শাইল ধানের গাছ থাকে।

উড়ি বা ঝরা ধান বা দেশীয় ধান উত্তর বিভাগের নীচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ধান পাকলে তা' শীষ থেকে এত সহজে পৃথক করা যায় যে, সাধারণতঃ একটি ঝুড়ির উপরে গাছ রেখে হাত দিয়ে নাড়িয়ে ধান সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে গরীব চাষীরা এভাবে সংগৃহীত ধান বিক্রয়ের জন্যে বাজারে নিয়ে আসে এবং উৎকৃষ্ট দানার জন্য তা' অন্য যে কোন প্রকার চাল অপেক্ষা উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়ে যায়।

জোয়ার

'জোয়ারের' যে সকল জাত এখানে চাষ করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো চীনা (Panicum Miliacum) এবং খাগিনী (Panicum Italicum)। বর্ষাশেষে এগুলো দক্ষিণ বিভাগের নীচু জমিতে বপন করা হয় এবং মার্চ ও এপ্রিলে কাটা হয়। কাফ্রিকর্ণও (Panicum Sorghum) দেশের এ অংশে ভাল জন্মে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে আফ্রিকার অন্তরীপ হতে সামান্য পরিমাণ শস্য আমদানী করা হয়েছিল এবং তা' থেকে প্রচুর ফসল পাওয়া গেছে। এ জাতটি চীনা বা খাগনী অপেক্ষা বেশ বড় জাতের বলে রায়তরা এর বেশী অনুসন্ধান করে থাকে। এর চাষাবাদ বিশেষভাবে এই জেলার উত্তর বিভাগে ব্যাপকভাবে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তৈলবীজ

সরিষা (Sinapis Dichotoma), তিল (Sesamum Oriental) ও তিসি (Linum Ussitatissimum) হচ্ছে এখানকার তৈলবীজ। প্রথমোক্তটি প্রধানতঃ উত্তর বিভাগে এবং যে সকল স্থানের মাটি ভিজা থাকে সেখানে জন্মে। এর

জন্য মাটি পূর্ব থেকে তৈরী করে রাখার প্রয়োজন হয় না। তবে উঁচু জমি হলে চাষ করে নিতে হয়। সরিষা সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে বোনা হয় এবং জানুয়ারীতে কাটা হয়। দু' রকমের সরিষা এখানে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর দানার রঙের পার্থক্যই প্রধান। হরিণ এ ফসলের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে থাকে।

তিল

লক্ষা নদীর তীরে ব্যপকভাবে তিলের চাষাবাদ করা হয়। এটা আমন ধানের সঙ্গে প্রায়ই একত্রে বোনা হয় এবং একত্রে এসব শস্যের নাম বলা হয় "তিল বাওয়াই চচা"। এটা মে ও জুন মাসে কাটা হয়। এই উভয় প্রকার শস্য ও অন্যান্য তৈলবীজের চাষাবাদ এ জেলা অপেক্ষা ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে আরও ব্যপকভাবে করা হয়ে থাকে।

ডাল

খেসারি (Lathyrus Sativus), মসুরী (Cicer Leus), কেওড়া মটর, মুগ (Phaseolus Trilobus), সাধারণ মটর (Pisum Sativum), কলাই (Dolichos Polisus) প্রভৃতি ডাল জাতীয় শস্য এখানে উৎপন্ন হয়। এগুলোর মধ্যে একমাত্র মুগ ব্যতীত বাকী সবই ছোটনা ধানক্ষেতে জন্মে থাকে। মুগ অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ জেলায় উৎপাদিত মোট ডাল জেলার চাহিদা মেটাতে পারেনা। কাজেই, পাটনা প্রভৃতি স্থান থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ডাল আমদানী করতে হয়।

অন্যান্য শস্য

অন্যান্য শস্যের মধ্যে রয়েছে মেথি (Trigonella foeniculum), কালিজিরা, (Nigella Sativa), ছোপ (Anethum foeniculum), ছলফা (Anethum Sowa) এবং ধনে (Coriander Sativum)। এগুলো পূর্বোক্ত শস্যাদির তুলনায় কম পরিমাণে চাষ করা হয় এবং সাধারণতঃ একই মাঠে জন্মে থাকে। এগুলো ডিসেম্বরে বুনা হয় এবং এপ্রিলে তোলা হয়। বার্লি (Hordeum Hexastichon), মাকইবা ভুট্টা (Zea Mays) এবং রোয়াস (Vicia Faba) এ জিলায় অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে।

তুলা

ঢাকার 'সূক্ষ্ম মসলিন' বস্ত্র যে তুলা থেকে তৈরী হয়ে থাকে তা' এ জেলায় উৎপন্ন হয়। এটা এক বর্ষজীবী উদ্ভিদ এবং প্রায় পাঁচ ফুট উচুঁ হয়ে থাকে। রক্সবার্গ একে Gossipium Herbaceum শ্রেণীভুক্ত বলে বর্ণনা করেছেন।

বাংলার সাধারণ তুলা গাছ থেকে এটা নিম্নলিখিত বৈশিষ্টের দিক থেকে ভিন্ন প্রকৃতির, যেমন "(১) এর শাখা অপেক্ষাকৃত খাড়া ও সংখ্যায় কম এবং পাতার অগ্রভাগ সরু হয়ে থাকে। (২) সমস্ত গাছটি, এমন কি পত্রবৃন্ত পর্যন্ত রক্তাভ রঙে রঞ্জিত এবং পাতার শিরায় পত্র রোম অপেক্ষাকৃত কম থাকে। (৩) পুষ্প-বৃন্ত অপেক্ষাকৃত লম্বা এবং ফুলের পাঁপড়ির বহিঃপ্রান্ত লাল রঙে রঞ্জিত। (৪) এর আঁশ লম্বা, সূক্ষ্ম ও নরম।"

এটাই এ জেলার দেশী তুলা। স্মরণাতীতকাল থেকে উত্তর বিভাগে এর চাষ-আবাদ হয়ে আসছে। বর্তমান সময় অপেক্ষা পূর্বে এ তুলো যখন ব্যাপকভাবে চাষ করা হতো, তখন এর আঁশের মধ্যে বিভিন্ন গুণ পরিলক্ষিত হতো। বর্তমানে আঁশের মধ্যে এই বিভিন্ন গুণ হয় স্বতন্ত্র করা যায় না, নতুবা এগুলো অপজাত হয়ে নিম্নমানে পরিণত হয়েছে। এগুলো ফুটি, নরমাহ্ ও বৈরতি নামে পরিচিত ছিল।

স্থানীয় লোকদের মতে, বর্তমানের তুলা পূর্বেকার তুলার চেয়ে নিম্ন-মানের। এ ফসল এখন পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় না বলেও জানা গেছে। বর্তমান তুলার আঁশ পূর্বেকার আঁশের ন্যায় বাহ্যতঃ একই রকম সূক্ষ্ম ও নরম হলেও তা' আকারে খাট হয়ে থাকে এবং বীজের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে। পূর্বে এরূপ হতো না।

এর গুণের অবনতির কথা যা' বলা হয়েছে তা' সত্ত্বেও ঢাকার তুলা এখনও বাংলার অন্যান্য স্থানে এবং এমন কি. পশ্চিম প্রদেশগুলোতে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। সাম্প্রতিক কালে এ তুলা অল্প পরিমাণে মাঝে মাঝে কলকাতার বাজারে চালান দেয়া হয়ে থাকে। এখানেও এটা দেশের অন্যান্য স্থান হতে আমদানীকৃত তুলা অপেক্ষা চড়া দামে বিক্রয় হয়ে থাকে।

দু' শ্রেণীর তুলা এ জেলায় উৎপন্ন হয়ে থাকে। এটা এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্তটি হতে উৎকৃষ্ট তুলা পাওয়া যায় এবং এটা কম খরচে চাষাবাদ করা চলে।

চাষ প্রণালী

বপনের নিমিত্ত তুলার বীজ যত্নসহকারে সংগ্রহ করতে হয় এবং রোদে শুকানোর পর তেল বা ঘি রাখা হয়েছিল এমন একটা মাটির পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। পাত্রের মুখ এমনভাবে বন্ধ রাখতে হয় যাতে বাইরের বাতাস ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। এ অবস্থায় ঘরের এরূপ স্থানে ছাদ থেকে এটা ঝুলিয়ে রাখতে হয় যেখানে সাধারণতঃ আগুন জ্বালান হয়ে থাকে। এই ফসলের জন্য উচুঁ জমি নির্বাচন করতে হয় এবং সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর পর্যন্ত আট হতে বারটি চাষ দিয়ে জমিতে বীজ বপন করতে হয়। বীজ সমান্তরাল সারিতে বপন করা হয় এবং এক সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব থাকে প্রায় এক হাত। বীজ মাটিতে ছড়ানোর পূর্বে পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। শিলাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও শুঁয়াপোকা তুলাগাছের যথেষ্ট অনিষ্ট সাধন করে থাকে।

তুলাগাছ জমির উর্বরতা শক্তি খর্ব করে এবং একই মাঠে পর পর দু'বারের বেশী ফসল উৎপন্ন করলে ভাল তুলা পাওয়া যায় না। পূর্বে যে জমিতে তুলা চাষ করা হতো তা প্রত্যেক চতুর্থ বছরে পতিত রাখা হতো। বর্তমানে উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণে অবহেলা করা হয় বলে এখনকার তুলা পূর্বেকার তুলার চেয়ে নিম্নমানের হয়ে থাকে। ফসল ভাল হলে বিঘা প্রতি ৮ মণ তুলা উৎপন্ন হয়। বীজ ও আঁশের গড় অনুপাত $\frac{১}{৪}$ বা একমণ অর্থাৎ ৪০ সের অপরিষ্কার তুলার মধ্যে ৩২ সের আঁশ থাকে।

এ জেলার উত্তর বিভাগে, বিশেষতঃ এর যে অংশ মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে সোনারগঞ্জ, কাপাসিয়া, টোকী ও জঙ্গলবাড়ী এলাকায় অবস্থিত সেখানে সর্বোৎকৃষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। পূর্বে এই এলাকায় প্রধানতঃ তুলাই চাষ করা হতো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকার ভাল জাতের তুলার জমির মাটিতে যে বিভিন্ন উপাদান থাকা বিশেষ প্রয়োজন বলে বিবেচিত, এখানের মাটিতেও সেই সকল উপাদান বিদ্যমান রয়েছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই ঢাকার তুলা বাংলার অন্যান্য স্থানের তুলার চেয়ে উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী।

তুলার উপযুক্ত মৃত্তিকা সম্পর্কে বেইনস্ এর বক্তব্য হলো, "সিলিকা ও আর্জিলেসাস্ মৃত্তিকার সংমিশ্রণ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তবে প্রথমটির আধিক্য থাকবে।" আরো পরে জানা গেছে যে, চুনও এর এক বিশেষ

উপাদান।[১] এই জাতীয় বিভিন্ন উপাদান একানকার মৃত্তিকায় রয়েছে। বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র নদের দ্বারা পরিবাহিত সিলিকার জন্য জেলার এ অংশের মাটি গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল অপেক্ষা শুকনো থাকে

যে মানদণ্ড দিয়ে তাঁতিরা তুলার গুণ বিচার করে থাকে

উত্তর বিভাগের তুলা দেশের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন তুলা অপেক্ষা স্ফীত হয় কম। ব্লিচিং প্রক্রিয়ায় আঁশের এরূপ স্ফীত হওয়ার প্রবণতাকে তাঁতিরা এর গুণ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করে। কিন্তু এ প্রবণতা তুলার সহজাত কোন গুণের উপর নির্ভর করে, না ব্লিচিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত পানির জন্য এরূপ হয়—তা' জানা যায় নি। তবে শেষোক্তটির জন্যই যে প্রধানতঃ এরূপ হয়ে থাকে, তা' বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে। বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রতিনিধি মিঃ বিব জানিয়েছেন যে, ধুমরাইতে প্রস্তুত তুলা বেশী স্ফীত হয়ে থাকে এবং এটা খুব ভাল জাতের তুলা বলে তাঁতিরা জানিয়েছে। কিন্তু ব্লিচিং প্রক্রিয়ায় ঢাকার পানি ব্যবহার করা হলে ঐ তুলা কম স্ফীত হতো এবং ধুমরাইর পানি ব্যবহার করে এর বিপরীত অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে বলেও মিঃ বিব বর্ণনা করেছেন।

জাফরান

গঙ্গা ও ধলেশ্বরী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে জাফরান (Carthamus Tinctorius) চাষ করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রধানতঃ ধলেশ্বরীর তীরে 'পাটের গোটার' আশেপাশের এলাকায় সর্বোৎকৃষ্ট ফুল উৎপন্ন হয়। এর চাষের আর একটি প্রধান স্থান হচ্ছে বেলিসপুর। উর্বর মিশ্র মৃত্তিকা বা কাদামাটি এর জন্য উপযুক্ত। ৭,০০০ বর্গহাত বিশিষ্ট এক বিঘা জমির জন্য প্রায় ছ' সের বীজের প্রয়োজন হয় এবং ভাল জমি হলে এবং মৌসুম অনুকূলে থাকলে এর থেকে দশ-এগারো সের ফুল পাওয়া যেতে পারে।

জাফরান বপন ও সংগ্রহ করার সময়

অক্টোবর ও নবেম্বরে বীজ বোনা হয় এবং পাপড়ি গাঢ় কমলা রঙ এর হলে পর মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে ফুল সংগ্রহ করা হয়।

১ বেইনস্ কৃত "History of the Cotton Manufactures of Britain", Piddington-Journal of the Asiatic society.

পিষ্টক তৈরী করার পদ্ধতি

দিনের বেলায় যে ফুল সংগ্রহ করা হয়, রাত্রিতে তা' পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হয়। অতঃপর পরের দিন ভোরে তা' মাড়ান হয়ে থাকে। সাদা পানি বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত এ পদ্ধতি চার পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকে। এবং এ সময় ফুল সর্বরকম ময়লা থেকে মুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। পরে সমস্ত পিণ্ডটিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এগুলোকে চ্যাপ্টা পিষ্টকাকারে পরিণত করে রোদে শুকানো হয়ে থাকে।

বাজার দর

জাফরান সাধারণতঃ ষোল হতে পঁচিশ টাকা মণ দরে বিক্রয় হয়ে থাকে। চাষ করতে খরচ সাত টাকার ঊর্ধে হয় না। হিসেব করে দেখা গেছে যে, প্রতি বিঘা জমি হতে গড়ে লাভ হয় ৩½ টাকা।

জাফরানের বীজ থেকে এক প্রকার তেল বের করা হয়। এটা জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজারে এ তেল সরিষার তেলের অর্ধেক দামে বিক্রয় হয়ে থাকে। রায়তরা এর বীজের সঙ্গে চিনি ও দুধ মিশিয়ে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। তারা এর পাতা ও কাণ্ড পুড়িয়ে এর ছাই ধৌত করার জন্য সাবানের পরিবর্তে ব্যবহার করে। কারণ ওতে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষার থাকে।

১৭৮৯ সনে জেলায় উৎপন্ন সম্পূর্ণ জাফরানই নগরীর বস্ত্র-রঞ্জন ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করেছিল। কালেক্টর মিঃ ডগলাসের মতে, ঐ বছর জাফরান খুব কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়েছিল এবং এর হলুদ রঙের জন্য সবটুকুই ব্যবহৃত হয়েছিল। ১৮০০ সনের দিকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এই দ্রব্য রপ্তানি করা হতোনা এবং ১৮১[illegible] সনে জেলায় মোট উৎপন্নের পরিমাণ ছিল [illegible] মন।

সর্বাপেক্ষা অধিক জাফরান রপ্তানী করা হয়েছিল ১৮২৭-২৮ সনে। এক হিসেব অনুসারে, কলকাতার কাস্টম অফিস থেকে মোট ৮,৩৪' মন রপ্তানি করা হয়েছিল এবং এর মূল্য ছিল ২, ৯০, ৬৫৫ টাকা ৮ আনা ৬ পয়সা। এ সব ফসলের দু তৃতীয়াংশই ঢাকার সন্নিকটস্থ এলাকায় উৎপন্ন হয়েছিল।

জাফরানের মত রং বিশিষ্ট এক প্রকার পদার্থ দিয়ে স্থানীয় লোকেরা এতে প্রায়শঃই ভেজাল দিয়ে থাকে ; ফলে এতে এক ধরনের পোকার জন্ম হয় এবং এর ফলে জাফরান ইংলণ্ডে পৌঁছবার মধ্যেই অনেক সময় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

ভেজাল মিশ্রণ সত্ত্বেও, ঢাকার জাফরান ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন জাফরানের তুলনায় ভাল এবং লণ্ডনের বাজারে চীনা জাফরানের পরেই এর স্থান। উল্লেখযোগ্য যে, জাফরান থেকে দু'ধরনের রং-এর পদার্থ পাওয়া যায়—একটি হলুদ, অন্যটি লাল। প্রথমোক্তটি ঠাণ্ডা পানিতে দ্রবণীয় এবং বার বার ধৌত করে অপসারণ করা হয়। অবশিষ্টাংশ পটাশিয়াম কার্বোনেটের ঠাণ্ডা দ্রবণে জীর্ণ করে লাল রং পাওয়া যায়। এর মধ্যে সামান্য পরিমান সাইট্রিক এ্যাসিড দিলে সেটাকে 'তলানি' হিসাবে পাওয়া যাবে। লাল রঙকে কোন কোন রসায়নবিদ 'কারথ্যামিক এসিড' নামে অভিহিত করে থাকেন। এটা লাক্ষার রং-এর চেয়েও সুন্দর। কিন্তু এর দ্বারা কাপড় রঙীন করা হলে তা' সাবানের ক্রিয়া এবং রোদে শুকাতে দিলে তার প্রভাব বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। এটা ফয়াসীদের উজ্জল রং এর পশমী বস্ত্রের ন্যায় বস্ত্র অনুকরন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং অভ্রের গুঁড়ার সাথে এটা মিশ্রিত করলে ঠোঁটে মাথার সাধারণ রুজ তৈরী হয়।

নীল

নীল গাছ (Indigofera tinctoria) প্রধানতঃ নতুন চর এলাকায় এবং আউশ ও ছোটনা ধান ক্ষেতে চাষ করা হয়। দক্ষিণ বিভাগে অধিকাংশ গাছ অক্টোবর থেকে বপন শুরু হয়। জেলার এ অংশে নীল রঙ তৈয়ার করার কাজ শুরু হয় সাধারণতঃ ২৫শে মের দিকে এবং জুলাইর প্রথম দিকে শেষ হয়। উত্তর বিভাগের জমি উঁচু' বলে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বীজ বপন করা হয় এবং নীল তৈয়ার করার কাজ জুনের শেষের দিকে প্রায় শুরু হয়ে যায়।

এই জেলায় উৎপন্ন নীল যশোরের নীলের তুলনায় নিম্নমানের। কারখানার নীল তৈরীর প্রক্রিয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি ব্যবহার করা হয় বলে নীলের মধ্যে সুক্ষ বালুকাকণা মিশ্রিত হয়; এজন্য নীল শক্ত হয় এবং ভেঙ্গে গেলে ঝক্‌মকে রং দেখা যায়।

১৮০১ সনে এ জেলায় মাত্র ছোট ছোট দুটো নীল তৈরীর কারখানা ছিল। বর্তমানে এ জেলাতেই এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩-এ। নীল চাষের আওতাধীন জমির পরিমাণ হচ্ছে ১,০০,০০০ বিঘা। এতে বছরে নীল উৎপন্ন হয়

২,৫০০ মণ। রায়ত ও কারখানায় নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য এ থেকে অর্থ আসে গড়ে বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা বা ৩০,০০০ পাউণ্ড।

শন

শন (Crotolaria Jumcea)—জেলার উভয় বিভাগের পলিমাটিতে চাষ করা হয়ে থাকে। কিন্তু গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে ও লক্ষ্যা নদীর পূর্বতীরে সোনারগঞ্জ এলাকায় এটা খুব ভাল জন্মে।

অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে এর বীজ বপন করা হয় এবং ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিলে শিকড়সহ গাছ তুলে নিয়ে আঁটি বেঁধে নিকটস্থ ঝিল বা নদীতে ভিজিয়ে রাখা হয়, যতক্ষণ না বাকল গাছ হতে আলগা হয় এবং পানিতে নেড়ে দুটোকে সহজেই পৃথক করা যায়। বাকলা বা আঁশযুক্ত অংশ হতেই শন পাওয়া যায়। পানি ঢেলে দিয়ে ও একটি ছোট কাষ্ঠ খণ্ডের উপর আস্তে আস্তে পিটিয়ে (যে ভাবে এদেশে কাপড় চোপড় ধোয়া হয়) বাকলের আঠাল পদার্থ দূরীভূত করে নিতে হয়, অথবা একটি মোটা কাঠের চিরুনী দিয়ে আচড়িয়ে ও এরূপ করা চলে।

এক বিঘা ভাল জমিতে তিন মণ পরিষ্কার শন উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং প্রতি মণ শনের সর্বোচ্চ মূল্য হলো দু' টাকা।

চাষ করার খরচ

শন চাষের জমি প্রস্তুত করতে বার হতে ষোলটি চাষ দিতে হয় এবং এজন্য শ্রমিকদের খরচ, জমির খাজনা, বীজ ইত্যাদি সহ মোট খরচ হিসেব করা হয়েছে প্রতি বিঘার জন্য ২ টাকা ৮ আনা। ১৮০৬ সনে ঢাকা জেলায় ১০,০০০ মণ শন উৎপন্ন হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিনিধি এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো থেকে ঐ বছরেই ৫৫,০০০ মণ শন ব্রিটিশ নৌ-সেনাদের জন্য ক্রয় করেন।

বর্তমানে এটি কম উৎপন্ন করা হয় এবং প্রধানতঃ মাছ ধরার জাল তৈরীর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাট ও মেস্তা পাট

পাট (Corchorus Olitorius) ও মেস্তা পাট (Hibiscus Cannabinus) শনের তুলনায় ব্যাপক হারে চাষ করা হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ

মাসে এর বীজ বপন করতে হয় এবং বর্ষার প্রারম্ভে গাছ তুলতে হয়। এগুলোর প্রস্তুত-প্রণালী শনের মতই। পাট ও মেস্তা পাটের আঁশ দড়ি, কাগজ ও বিক্রমপুরের চট তৈয়ার করতে ব্যবহৃত হয়। কলকাতায় বেশ কিছু পরিমাণে এসব দ্রব্য রপ্তানিও করা হয়ে থাকে।

ইক্ষু

আখ (Saccharum Officinale) এ জেলা অপেক্ষা ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জে বেশী চাষ করা হয়ে থাকে। ফরিদপুর জেলায় গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে জুড়ে অনেক মাইল বিস্তৃত এলাকায় আখের চাষ করা হয়ে থাকে। দেশের এ অংশের আখ পূর্বাংশের যে কোন জেলার আখের তুলনায় উৎকৃষ্ট।

চাষের পরিমাণ

মিঃ ডগলাসের হিসেব মতে, ১৭৯২ সনে এ জেলায় চাষের পরিমাণ ছিল ৫০ গজ বর্গের ১০০০ বিঘা। সম্ভবতঃ বর্তমানে আখ চাষের পরিমাণ উক্ত জমির দ্বিগুণের অধিক হবে না। গুড় বা নিকৃষ্টমানের ঝোলা গুড় সম্পূর্ণটাই মিষ্টান্ন তৈরী করতে ব্যবহৃত হয়। শহুরে লোকদের ব্যবহারের জন্য চিনি যে দ্রব্য থেকে তৈরী করা হয় তা' অন্যান্য জেলা থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে এবং এ থেকে তিন প্রকারের চিনি পাওয়া যায়। এক মণ চিনির মধ্যে এ তিনের অনুপাত হলো ১৬, ১৮ এবং ২০ সের। এ তিন প্রকারের মোট ব্যবহারের পরিমাণ ৫০ মণের উর্ধে নয়।

মরিচ

লঙ্কা মরিচ (Capsicum Frutes cens) ও ধান মরিচ (Capsicum Minimum) এই উভয় প্রকার মরিচই এ জেলায় প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হয়। বিশেষ করে প্রথমোক্তটি ব্যাপক পরিমাণে কলকাতায় রপ্তানি করা হয়ে থাকে।

হলুদ ও আদা

হলদি বা হলুদ (Curcuma Longa and Gardneria ovata) ও আদ্রক বা আদা (Zinziber Officinalis) এ জেলার উচুঁ জমিতে চাষ করা হয়। বিশেষ করে সোনারগাঁও ও বিক্রমপুর এলাকায় এর চাষ অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু এই জেলায় যা' উৎপন্ন হয় তা' সম্পূর্ণই এখানকার লোকদের চাহিদা

মিটাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উভয় প্রকার ফসলই এখানকার তুলনায় ফরিদপুরে বেশী চাষ করা হয়ে থাকে।

তামাক

তামাকের (Nicoliana Tabacum) চাষ দেশে রায়তদের ব্যবহারের জন্যে হয়ে থাকে। এ ছাড়া, কিছু পরিমাণ তামাক রংপুর, কুচবিহার ও অন্যান্য স্থান থেকে আমদানী করা হয়ে থাকে।

যে সকল গাছ গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ী ঘরের আশেপাশে চাষ করে থাকে

গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ীর আশেপাশের মাঠে ও বাগানে যে সকল গাছ রোপণ করে থাকে সেগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলোর নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

পান

তিন প্রকারের পান (Piper Betel) এখানে জন্মে। এতগুলোর মধ্যে এক প্রকার জেলার সর্বত্র সাধারণ ভাবে উৎপন্ন হয়। এলাচি ও কর্পূরি নামে অপর দু' প্রকার (এগুলোর উৎকৃষ্ট সুগন্ধির জন্যই এরূপ নামকরণ করা হয়েছে) পান কেবল মাত্র সোনারগাঁঞেই চাষ করা হয়ে থাকে।

কুমড়া

কুমড়ার (Cucurbita Pepo) মধ্যে চারটি শ্রেণী আছে যেমন, কুমড়া, মিষ্টি গিমি, কুষ্মাণ্ড ও চাল কুষ্মাণ্ড। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার কুমড়া প্রধানতঃ বিক্রমপুরে চাষ করা হয়। এ দু'য়ের মধ্যে শেষোক্তটি অর্থাৎ গিমি কুমড়া এ স্থানের ও বাকেরগঞ্জ জেলার বৈশিষ্ট্য। ওখান থেকে কলকাতায় ও দেশের বিভিন্নাংশে বহু কুমড়া প্রেরিত হয়। কথিত আছে যে, যেস্থানে প্রত্যহ আগুন জ্বালানো হয় সেস্থানে ঝুলিয়ে রাখলে গিমি কুষ্মাণ্ড দু'বছর পর্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকে। চতুর্থ প্রকার কুমড়া তরকারি ও মোরব্বা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদের মধ্যে এর চাহিদা খুব বেশী হয়ে

থাকে। এ-ছাড়া নিম্নোক্ত তরিতরকারী এখানে উৎপন্ন হয়।

(১) কদু (Cucarbita Lagenaria)
(২) শরকারু কুন্দা (Convolvus Batatas)
(৩) উচ্ছে (Mourodica Mixta)
(৪) করলা (Cleame Pentophylla)
(৫) বেগুন (Solanun Melongina)
৬) খেঁড়ো (Cucumis Sativus)
(৭) ফুটি (Cucumis Momordica)
(৮) তরই (Luffa Acutangula)
(৯) কচু (Arum Colo casia)
(১০) মান কচু (Arum Indicum)
(১১) মূলা (Raphanus Sativus)
(১২) ডাঁটা শাক (Amarnathus Gangeticus)।

কদু

মাঠে এবং ঘরের চালার উপরে উৎপন্ন হয়ে থাকে। শরকারু কুন্দা ও করলা কেবল উত্তর বিভাগে জন্মে। করলা বাঁশের তৈরী চাঁচের বেড়া বা জাফরির উপরে জন্মে।

কলা ও আনারস

এ জেলা কলা ও আনারসের জন্য প্রসিদ্ধ। আট প্রকার কলার (Musa Paradisiaca) মধ্যে মর্তমান ও চাম্পা কলা—এই দু' প্রকার কলা খুবই বিখ্যাত। প্রথমোক্তটি কেবল বিক্রমপুরেই চাষ করা হয় এবং ভারতবর্ষের মধ্যে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু কলা বলে বিবেচিত। কলাগাছ প্রত্যেক দ্বিতীয় বা তৃতীয় বছরে নতুন করে রোপণ করতে হয় এবং এতে খাত বা নর্দমার পার্শ্বের মাটি দ্বারা সার দিতে হয়।

ঢাকার উত্তরে, প্রাধানতঃ ভাওয়াল ও তেজগাঁও গ্রামাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আনারস (Bromelia Ananas) জন্মে। এখানকার উৎপন্ন আনারস 'ঢাকার আনারস' নামে পরিচিত। বিদেশী কারখানায় নিযুক্ত পর্তুগীজ মিশনারী ও ইউরোপীয়দের সকলেরই শেষোক্ত স্থানে আনারসের বাগান ছিল এবং তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসৃত পরিচর্যার জন্যই সম্ভবতঃ এতদঞ্চলের আনারস উৎকৃষ্ট।

লেবু

বিক্রমপুরে প্রচুর পরিমানে লেবু (Citrus Medica) উৎপন্ন হয়। এ দ্রব্য প্রধানতঃ 'মসলিন' কে সাদা করবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছ' রকমের লেবু এখানে জন্মে। এগুলোর মধ্যে কলম্বো ও বাতাসি সর্ববৃহৎ এবং এ'দুটো জাত 'মসলিনে' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এলাচি ও কাগজি নামে লেবুর অপর দুটো শ্রেণী আছে। এগুলোর এরূপ ধরনের নামকরণের কারণ এই যে, প্রথমটি থেকে সুঘ্রান পাওয়া যায় এবং দ্বিতীয়টির ছিলকা কাগজ অপেক্ষা মোটা নয়। এসব লেবু প্রচুর পরিমাণে জন্মে। 'সরবতী' কমলার আকার ধারণ করে এবং এ থেকে মোরব্বা তৈরী হয় ও এ লেবু সরবতের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। 'কাতজমারি' আর এক শ্রেণীর লেবু। প্লীহা বড় হলে এটা খেতে দেয়া হয়।

সুপারি

সুপারি (Areca Catechu) জেলার দক্ষিণাংশে প্রচুর জন্মে। এ ফসল জমির মালিকদের জন্যে যথেষ্ট অর্থের জোগান দেয়। ত্রিপুরা জেলায় মেঘনার পূর্বতীরেও এর যথেষ্ট আবাদ হয়ে থাকে। শেষোক্ত এলাকায় প্রতি বিঘা জমিতে ৭০০ গাছ রোপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জেলায় গাছ রোপন করা হয় বাড়ীর অথবা বাগানের চতুর্দিক ঘিরে। আট বছর বয়স হতেই গাছ ফল দিতে শুরু করে। এবং একটানা ষোল বছর পর্যন্ত এতে ভাল ফলন দিতে থাকে। তারপর ফলন হ্রাস পায়। বয়সানুসারে গাছের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে। তবে গড়ে একটি গাছের মূল্য হবে প্রায় আট আনা। নবেম্বর মাসে লোক দ্বারা গাছ থেকে সুপারি পাড়া হয়। মাটিতে না নেমেই এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে সুপারির ছড়া ছিঁড়ে নেওয়া হয়। এসব সুপারি পরে রোদে কয়েক বার শুকাতে হয়। অতঃপর মাটিতে বসানো একখণ্ড বাঁশের উপরে রেখে সুপারির খোসা ছাড়ানো হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে চাকুর ন্যায় তীক্ষ্ণ বাঁশের প্রান্তভাগের উপর দিয়ে সুপারি টেনে নিতে হয়। এ কাজ দক্ষ লোকে সাধারণতঃ দু'হাতে অথবা একই সময়ে এরূপ দুটো বংশ-যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করতে পারে এবং একদিনে সে প্রায় ৩৬০০টি সুপারির খোসা ছাড়াতে পারে।

সুপারি রপ্তানি

রংপুর, আসাম ও আরাকানে সুপারি রপ্তানি করা হয়। এ সকল স্থানে খোসা সহ সুপারি পাঠানো হয় থাকে।

নারকেল গাছ

নারকেল গাছ (Cocos Nucifera) দক্ষিণাংশে বিশেষ করে রাজনগরে প্রচুর জন্মে। সপ্তম বছরে এ গাছে ফল ধরে এবং প্রত্যেকটি গাছ গড়ে ৭০টি ফল দিয়ে থাকে। এবং তা সাধারণতঃ এক টাকায় বিক্রি হয়। ভাওয়ালে 'সুনবুনিয়া' নামে এক জাতের নারকেল গাছ আছে, যা' তৃতীয় বছরেই ফল ধারণ করে থাকে। এর খোল খুব সরু এবং শক্ত হয় বলে দেশীয় হুকা তৈরীর জন্যে এসব নারকেলের চাহিদা খুব বেশী। অন্যান্য গাছের মধ্যে আম, কাঁঠাল, তেঁতুল ইত্যাদি সাধারণতঃ চাষ করা হয়।

কশাদা গাছের চাষ

দুষ্প্রাপ্যতার মৌসুমে খাদ্যের জোগান দেয়ার উদ্দেশ্যে ১৭৯২ সনে সরকারের অনুমোদন ক্রমে এই জেলায় কশাদা গাছের (Jatropha manihot) চাষের প্রচলন হয়। কিন্তু সাধারণের মধ্যে এটা কখনও প্রচলিত হয়নি। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা' সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হয়।

কফি ও আনাত্ত

কফি ও আনাত্ত (Bixa Orillana) জেলার উত্তরাংশে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হতো। কিন্তু এ'দুটোর কোনটাই ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক পণ্য ছিল না।

ইউরোপীয় শাক্-শব্জি

ইউরোপীয় শাক্ সবজি গুলোর অধিকাংশই এখানে ভাল জন্মে। কিন্তু কর্মস্থলে বসবাসকারী কতিপয় ইউরোপীয় লোকদের বাগানেই এ গুলোর চাষ সীমাবদ্ধ। স্থানীয় লোকেরা এ সবের কোনটাই উৎপন্ন করেনা এবং এগুলো বাজারেও বিক্রয় হয় না। কলকাতার অবস্থাও অনুরূপ। দেশের এই অংশে উদ্যানতত্ত্ব অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কর্নেল ষ্টাসি ঢাকার সর্বসাধারণের নিমিত্ত পরীক্ষামূলকভাবে বাগান তৈরী করতে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন তাতে আশা করা যায় যে এটা স্থানীয় লোকদের মধ্যে উদ্যানচর্চা বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে।

কৃষিক্ষেত্র

গ্রাম হতে কিছু দূরে অবস্থিত ক্ষেতের সীমানা জমির আল দ্বারা চিহ্নিত হয়। এ সব আল পথ সাধারণতঃ উচ্চতায় দু' থেকে তিন ফুট এবং

প্রস্থে প্রায় একহাত হয়ে থাকে। ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য এগুলোই একমাত্র পথ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করা হয়—এমন উঁচু ভূমিতে অবস্থিত ক্ষেত ও বাগান নর্দমা বা পরিখা খনন করে পরস্পর পৃথক করা হয় এবং বাঁশের খুঁটি অথবা এরণ্ড তেলের গাছ (Ricinus Communis) বা বেতের (Calamus Retang) তৈরী বেড়া কিছুদুর অন্তর অন্তর রোপণ করে চারদিক ঘেরাও করা হয় এবং দু'খুঁটির মধ্যবর্তী স্থান কতিপয় কাঁটা-গুল্মের শুকনো ডাল-পালা পুঁতে পূর্ণ করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ঘরের চারদিকে গাছের বেড়া হিসেবে পারিজাত (Erythrina fulgens) মাঝে মধ্যে ব্যবহৃত হয় এবং এ একই উদ্দেশ্যে ভেরণ্ড (Jatrapha Curecas) ও চিতা (Plumbago Zeylanica) শহরে প্রায়শঃই রোপন করা হয়।

জমিতে সার প্রয়োগ

জমিতে সার প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে সোনারগঞ্জ ও বিক্রমপুরের বাগানে যেখানে মূল্যবান শস্যাদি উৎপন্ন করা হয়, কেবল সে সকল স্থানেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। প্রথমোক্ত স্থানে পানের বাগানে সরিষার খৈল প্রয়োগ করা হয় এবং শেষোক্ত স্থানে কলাগাছের বাগানে গোবর সার ও নর্দমা বা কূপের পার্শ্বস্থ পলিমাটি ও উদ্ভিজ্জ-জাত মিশ্রসার ব্যবহার করা হয়। পানা (Pistia stratiotes) নামক আগাছা জলাভূমির উপর প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এগুলো সুপারি ও নারকেল গাছের গোড়ায় সার হিসাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

পানি সেচ

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বৃষ্টির অভাব হলে বোরো ও রোয়া ধান চাষের জন্যই কেবল পানি-সেচ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। একটা লম্বা গাছকে মাঝামাঝি স্থানে কেটে তার অর্ধেকের মধ্য থেকে গাছ খুঁড়ে নৌকা প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর আড়াআড়ি ভাবে স্থাপিত দুটো বংশদণ্ডের নির্ভরবিন্দু হতে সেটাকে ওঠানামা করিয়ে পানি সেচ করা হয়ে থাকে।

কৃষি-যন্ত্রপাতি

প্রচলিত কৃষি যন্ত্রপাতি সমূহের মধ্যে রয়েছে লাঙ্গল ও মই। দু' বা তিনখণ্ড বাঁশের মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কতগুলো দণ্ড স্থাপন করে মই তৈয়ার

করা হয়। জমি মসৃণ করতে ও বপনের পূর্বে ভূমি প্রস্তুত করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

বিদ্দা বা বিদে মই বাঁশের তৈরী এবং ঐ একই উপকরণে তৈরী কতগুলো দাঁত এর সঙ্গে লাগানো থাকে। একজোড়া বলদ দিয়ে এটা টানা হয়। আউশের ক্ষেতে চারাগাছ খুব ঘন হলে তা' পাতলা করার জন্য এবং আগাছা দূরীকরণার্থে এটি ব্যবহৃত হয়। মুগুর একটা ভারী কাঠ দ্বারা তৈরী; চাষ দেয়ার পর জমির উপরের বড় বড় শক্ত মাটির তাল বা ঢেলা ভাঙ্গবার জন্য এর ব্যবহার চলে। অন্যান্য যন্ত্র হচ্ছে 'ছেনি' (এটা আগাছা দূর করার জন্য ব্যবহৃত লোহার তৈরী যন্ত্র বিশেষ), কাঁচি, কোদাল, কুড়াল, খন্তা ও দা' ইত্যাদি। এগুলো দেশের অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত একই শ্রেণীর যন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১]

গবাদি পশু

এ জেলার কৃষি কাজে ব্যবহৃত গবাদি পশু নিম্ন জাতোদ্ভব, দুর্বল ও ক্ষুদ্র এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহের গবাদি পশু অপেক্ষা খর্বাকৃতির। সূর্য ওঠার সময় থেকে চাষের কাজ শুরু হয় এবং দুপুরে শেষ হয়। এ সময়ের মধ্যে দু' জোড়া বলদ পালা বদল করে কাজে লাগানো হয়ে থাকে। মুসলমান কৃষক মাঝে মধ্যে গাই গরু দিয়েও চাষের কাজ চালিয়ে থাকে; কিন্তু ষাঁড়ের তুলনায় এর দ্বারা অর্ধেক সময়ের বেশী কখনও কাজ করানো হয় না। চিনি ও তেলের কলে এবং জিনিষপত্র বহনে সাধারণতঃ উত্তর প্রদেশ বা পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বলদের নিয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

ধান কাটা, মাড়াই ও গুদামজাত করণ

ধান গাছের শীষ হতে প্রায় তিন ফুট নীচে থেকে কেটে আঁটি বাঁধা হয় এবং প্রত্যেকটি আঁটির পরিধি প্রায় আধহাত। এসব ধানের আঁটি জলপথে, নৌকায় এবং স্থলপথে জাফরি বিশিষ্ট গরুর গাড়িতে করে রায়তদের বাড়ী নেওয়া হয়। শীষ থেকে ধান পৃথক না করা পর্যন্ত তা' গাদা মেরে বা পালা বানিয়ে রাখা হয়।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মত, এখানেও বলদ দিয়ে মাড়িয়ে গাদ থেকে ধান পৃথক করা হয়ে থাকে। ধান খাওয়া থেকে নিবৃত্ত করার জন্য বলদের

---

১ এসকল যন্ত্র দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

মুখে মুখোস পরাবার পদ্ধতি পুরাকালের 'জুডো'র মতই লক্ষ্য করা যায়। 'ধান কা কেল্লায়' একত্রে যে কয়টি বলদ জোড়া হয় তার সংখ্যা একটি অগ্রবর্তী বলদসহ তিন থেকে পনেরোটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। শেষোক্ত সংখ্যার গরু দ্বারা ৩০ মন ধান মাড়ান যেতে পারে।

ধান মাড়ানোর কাজ শেষ হলে তা' রোদে শুকাতে দেয়া হয়; অতঃপর মাদুর ও বাঁশ দিয়ে তৈরী কয়েক ফুট উচুঁ মোড়া রায়তদের ঘরে পেতে তাতে ধান গুদামজাত করা হয়।

ডাল, সরিষা এবং অন্যান্য অল্প পরিমাণ শস্য লাঠি দ্বারা পিটিয়ে বের করে নেয়া হয় যেভাবে ইহুদীরা প্রাচীন কালে ডুমুর ও জিরা পিটিয়ে নিত।[১] ধান ছাঁটা সাধারণতঃ গ্রামে 'উকলি' বা গাছের তৈরী মুষল ও উদূখলের সাহায্যে হাত দিয়েই করা হয় এবং শহরাঞ্চলে ঢেঁকির সাহায্যে করা হয়ে থাকে। রায়তগণ এ যন্ত্র এরণ্ড তেল ও জাফরানের বীজ গুঁড়ো করার জন্যও ব্যবহার করে। পরে এ গুঁড়ো গরম পানিতে ফেলে উপর থেকে তেল ছেঁকে নেওয়া হয়।

দুগ্ধবতী গাভী

এ জেলার দুগ্ধবতী গাই-গরু বাংলাদেশের সেরা। 'দেশালী' জাতের গাই-গরু শহরে পালন করা হয়। এবং এগুলোকে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা আছে। উত্তর বিভাগের ঝিল থেকে ঘাস এনে এসব গাই-গরুকে খাওয়ানো হয়। মোষের দুধ সবটাই দই ও ঘি প্রস্তত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পনির

এ স্থানে এবং ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহে প্রচুর পরিমাণে পনির প্রস্তুত করা হয় এবং তা' দেশের বিভিন্নাংশে এবং বিদেশে জেদ্দা, বসরা প্রভৃতি জায়গায় রপ্তানি করা হয়।

মেষ, ছাগল ইত্যাদি

মেষ, ছাগল, পাঁতিহাস, কুক্কুট, কবুতর ইত্যাদি বিক্রয়ার্থে পালিত হয়। এগুলো এখানে প্রচুর। প্রথমোক্তটি দশ আনায় এবং কুক্কুট ও পাঁতিহাস এক একটি ছ' পয়সায় কেনা যায়।

১ ঈসাই ২৮-শ অধ্যায়, ২৭ স্তবক।

কম্বল

শহরের সন্নিকটে কম্বল তৈরীর কাজে দু'তিন জন তাঁতি নিয়োজিত আছে। এরা মেষের পশম ক্রয় করে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ পশম নিম্নমানের বলে রায়তরা এসব পশম ফেলে দেয়।

জেলার ভূমির মাপ হচ্ছে দরুণ, খাদ্দা ও বিঘা; কিন্তু প্রথম দুটো যথাক্রমে কানি ও পাখিরই নিম্নমানের সংজ্ঞা হিসেবে পরিচিত এবং এগুলোই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

পাখি সাধারণতঃ উত্তর বিভাগের উচ্চ ভূমির মাপ, অন্যদিকে নিম্ন ও কৃত্রিম উচ্চ ভূমির জন্য জেলার সর্বত্র 'কানি'র মাপ অনুসরণ করা হয়।

মাপের পদ্ধতি

হাত হচ্ছে মাপের একক এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘের একটি দণ্ড বা নল দিয়ে জমি পরিমাপ করার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। সচরাচর জমি মাপার জন্য ৭½ হাতের 'নল' অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং এটাকেই এই জেলার রৈখিক মাপের 'আদর্শ' হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু ছ' থেকে পনেরো পর্যন্ত বিভিন্ন পরিসরের অন্যান্য দৈর্ঘ্যের 'নল'ও প্রচলিত আছে এবং এজন্য কাঁচা ও পাক্কা— এদুটো মনগড়া পার্থক্য দেখা দিয়েছে। উপরের সংজ্ঞার সঙ্গে এগুলোর প্রয়োগে নতুন সংজ্ঞার সৃষ্টি হয়েছে যেমন, কাঁচা কানি ও কাঁচা পাখি এবং পাক্কা কানি ও পাক্কা পাখি ইত্যাদি। জমিদারগণ তাদের প্রজাদের সঙ্গে চুক্তিপত্র করার কাজে এবং রাজস্ব অফিসারদের সাথে ভূমির বন্দোবস্ত করতে প্রথমোক্ত মাপ ব্যবহার করে থাকে; এবং শেষোক্ত মাপ জমি বিক্রয় করার জন্য সর্বদা ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ব্যবহৃত 'নল' অনুসারে দরুণ ও খাদ্দার কালি নিম্নরূপ:

নলের দৈর্ঘ		কালি			
		একর	রোদ	পার্চ	বর্গফুট
দরুণ	৯ হাত	=৩২	০	২১	৪২¾
	৮ ,,	=২৫	১	১০	১০৭½
	৭½ ,,	=২২	১	১৩	১৫০¾

নলের দৈর্ঘ্য					কালি
খাদ্দা	৭½ হাত	=৫	২	১৩	১০৫¾
	৬½ ,,	=৪	০	৩০	১১২½

৭½ =১ নল ↑ ৭½ হাত=১ নল

১২ নল দৈর্ঘ্যে } = ১কানি
১০ ,, প্রস্থে }

৬ নল দৈর্ঘ্যে } =১ পাখি
৫ ,, প্রস্থে }

বিঘার মাপ

বিঘার মাপ সাধারণতঃ নীল ও জাফরান খেতের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখানে দু' প্রকার বিঘার ব্যবহার প্রচলিত আছে যেমন, একটি হলো ১০০ হাত বর্গের এক বিঘা; এটা ২ রোদ, ২ পার্চ ও ১৭৯½ ফুটের সমান। অন্যটি হচ্ছে ১০০×৮০ হাতের এক বিঘা। এটা ১ রোদ, ২৬ পার্চ ও ৩১¼ ফুটের সমান।

খাজনা ও রায়তগণ

জমির স্বাভাবিক গুণ, উঁচা নীচা, বছরে ক'টি ফসল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি অনুসারে ভূমির খাজনার মধ্যে পার্থক্য হয়ে থাকে। জঙ্গল ও নতুন গঠিত চর এলাকার জমি প্রথম বছরে বিনা খাজনায় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বছরে অল্প খাজনা ধরা হয়ে থাকে এবং তা চতুর্থ ও পঞ্চম বছরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় পূর্ণ খাজনা ধার্য করা হয়।

চর এলাকার জমি রায়তদের সাধারণতঃ চর এলাকার জমি চাষ করতে অনুরাগী হতে দেখা যায়। ভিটি বা কৃত্রিম উচ্চ ভূমির মূল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে তার অবস্থান, উহা পুরানো না নতুন তৈরী এবং তাতে কি পরিমাণ গাছ বিদ্যমান রয়েছে তার উপর। বিক্রমপুরে এই মূল্য কানি প্রতি পাঁচ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, জেলার পশ্চিমাংশে প্রতি পাখির মূল্য হবে গড়ে চার টাকা; কোন রায়ত নতুন 'ভিটি' তৈয়ার করলে—তার জন্য তার কাছে তিন বছর যাবৎ কর ধার্য করা হয় না।

আখ, তুলা, জাফরান ও নীল চাষের নিমিত্ত যে জমি দেয়া হয়—সে সব জমির খাজনার হারের মধ্যে দেশের বিভিন্নাংশের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই ফসলগুলোর প্রথমটি যে জমিতে চাষ করা হয় তার খাজনা সাধারণতঃ ধানী জমির খাজনা অপেক্ষা শতকরা ২৫ অথবা ৩০ ভাগ বেশী। জেলার পশ্চিমাংশে নীলের জমির খাজনা বিঘা প্রতি ৬ আনা

ধার্য করা হয়। কিন্তু চর এলাকায় যেখানে চাষাবাদ চলে সে স্থানের জন্য ধানী জমি অপেক্ষা কম খাজনা দিতে হয়। ধানী জমির মধ্যে বোরো বা রোপা ধানের জমি সর্বাপেক্ষা অধিক হারে এবং আউশের জমি সর্বাপেক্ষা কম হারে দেওয়া হয়। যে জমিতে দুটো ফসল যেমন, চোটনা ধানের ক্ষেতে ডাল ও ক্ষুদ্র শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে সে জমির খাজনা এক-ফসলী জমির খাজনা থেকে এক-পঞ্চমাংশ বেশী নির্ধারিত হয়ে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় শস্য যদি খুব মূল্যবান হয় যেমন, তুলো ও জাফরান, তা'হলে এই হার হবে এক-তৃতীয়াংশ বেশী। নদী দ্বারা জমির পরিবর্তন সাধিত হলে তুলনামূলক ভাবে এর মূল্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বিগত ত্রিশ বছরের মধ্যে জেলার কোন কোন অংশের জমির মূল্য শতকরা ৭৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এটা আবার তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাজনা সাধারণতঃ নগদ অর্থে প্রদান করা হয়। এটা প্রতি মাসে অথবা ৪ বা ৬ মাস অন্তর অন্তর আদায় করা হয়ে থাকে। বার্ষিক খাজনা প্রদান কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়।

বর্গা পাট্টা প্রদান

কখনও কখনও তালুকদার বা ইজারাদারগণ তাদের জমি বরগা পাট্টা দিয়ে থাকে। এই প্রথা ইউরোপ মহাদেশের খামারের 'মেটায়ার' (Metayer) সম্পত্তি ভোগের অনুরূপ। এ প্রথায় তালুকদার বা ইজারাদার তার সম্পত্তি রায়তকে করমুক্ত হিসাবে দেয় এবং প্রয়োজনীয় বীজের অর্ধেক প্রদান করে, রায়ত বাকি অর্ধেক বীজের জোগান দেয়, জমি চাষ করে, শস্য কাটে এবং উৎপন্ন ফসল দু'জনের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে নেয়। রায়ত যদি খুব দরিদ্র হয় এবং তার বীজ ক্রয় করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে বীজ বিক্রেতার সাথে বীজের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে সে এই অঙ্গীকার করে যে, তার জমিতে উৎপন্ন ফসলের একাংশ সে বীজ-বিক্রেতাকে প্রদান করবে। আবার যদি তার হালের গরু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সে প্রতিবেশীর দ্বারা জমি চাষ করিয়ে নেয়। এবং এর জন্যে তাকে সাধারণতঃ টাকা প্রদান করতে হয়। গঙ্গার এ পাড়ে রায়ত বা জোতদারগণের মধ্যে যাদের জমির উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'কায়েমী স্বত্ব' রয়েছে তারা ব্যাতিরেকে অন্য সকলেই মনে করে যে, যে জমি তারা চাষ করে তার উপর তাদের মালিকানা বা জোত হস্তান্তরের কোন অধিকার নেই। অতএব, বরগা ব্যতীত তারা জমি পুনঃ ইজারা দিতে পারে না।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে ফরিদপুর জেলায় এর বিপরীত ব্যবস্থা সাধারণভাবে চালু রয়েছে। সেখানে জোতদার তার সম্পত্তি দর-ইজারা দেয়ার স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে এবং জমিদার তার সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারে না। কোন রায়তকে তার নিজস্ব এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় বা অন্য জেলায় গিয়ে বাস করতে কমই দেখা যায়। তবে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার কর্তৃক লাভ-জনক কোন প্রস্তাব দেয়া হলে সে প্ররোচিত হতে পারে। এরূপ স্থলে তার সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা ও পুনরায় ঘর তোলার খরচপত্র জমিদারই বহন করে। এছাড়া, তার খামারের গবাদি পশুসহ প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সংগ্রহ করতে যাতে সে সক্ষম হয় তার জন্য সুদমুক্ত অর্থও এক বছরের জন্য তাকে অগ্রিম প্রদান করে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই প্রথা রায়তদের জন্য কিছুটা সুবিধাজনক হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এটা পরোক্ষভাবে তাদেরকেই উৎসাহিত করে, যাদের জমির খাজনা অনেক বাকি পড়েছে এবং জোত জমি ছেড়ে দেয়ার পূর্বে তাদেরকে সে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং এই জেলায় এ নিয়ে প্রায়ই গোলযোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তা' গুরুতর বিবাদে পরিণত হয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে করনির্দ্ধারণের পদ্ধতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে করনির্দ্ধারণে জমিদাররা যে পদ্ধতি অনুসরণ করতো তা' হলো—ফসল কাটার প্রারম্ভে রায়তদের জমির পরিমান নির্ণয় পূর্বক উভয়ের সম্মতিক্রমে জমির উৎপাদন নিরূপণ করে কর ধার্য করা। কৃষকদের কাছ থেকে কোন কর আদায় করা হয় না, কিন্তু যারা নতুন জমি আবাদ করে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করে সম্ভবতঃ ঐ চাহিদা পূরণ করা হয়ে থাকে। কর নির্দ্ধারণের মাপকাঠি যাই হোক না কেন, তা' কখনও জমিদার কর্তৃক নির্দ্ধারিত হয় না। সুতরাং, পর্যাপ্ত ফসল উৎপন্ন হলেও তা' রায়তদের কোন উপকারে আসে না। এ জন্যই জীবন ধারণের নিমিত্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি তারা চাষ করতে কখনও উৎসাহ পায় না। এ ধরনের উৎপীড়নের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও, রায়তরা পুরানো প্রতিষ্ঠিত রীতির যে কোন রদবদলের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করতো এবং যখন পাট্টা বা ইজারা প্রথা প্রথম প্রচলিত হয় তখন তারা গ্রাম পরিত্যাগ করার হুমকি প্রদান করে। এজন্য লিখিত কোন চুক্তি প্রবর্তিত করাতে বা বর্তমান

প্রথানুযায়ী 'কবুলিয়াত' মঞ্জুর করিয়ে তার পরিবর্তে কোন দলিল পেতে তাদের বেশ সময় লেগেছিল।

রাজস্বের অন্যান্য উৎস

কর্ষণযোগ্য ভূমি থেকে যে কর আসতো, তাছাড়াও অন্যান্য অনেক উৎস থেকে জমির মালিকরা রাজস্ব লাভ করতো। নান-কর, বন-কর ও জল কর (আক্ষরিক অর্থে রুটি, বন ও জল) ইত্যাদি যে বিরাট তিনটি কর প্রদান থেকে মুঘল শাসনামলে জমিদারগণকে অব্যাহতি দেয়া হতো—তার মধ্যে শেষোক্ত দুটো থেকে কোন কোন তালুকের বেশ লাভ হতো। সেই সমস্ত লোকদেরকে পতিত জমি খামার তৈরীর জন্য খাজনায় বিলি করা হতো—যারা ঘাস, নল খাগড়া ও ঝোপজঙ্গল কেটে গবাদি পশুর ঘাস, গৃহের ছাউনী ও জ্বালানী সংগ্রহ করতো। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে বনকরের' অধিকার ভোগ করতো এমন সব লোক—যারা ভূমির মালিক নয়।

জলকর

অসংখ্য নদনদী ও জলাভূমিতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত এবং জলকর অর্থাৎ এ সকল উৎস থেকে যে সকল রাজস্ব আসতো তার পরিমাণ যথেষ্ট ছিল। ঝিলগুলোর আয়তনানুসারে এগুলোকে থেকে ৫ থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত হারে বন্দোবস্ত দেয়া হতো। জেলেদেরকে 'জিরাতি' রায়ত বলা হতো। তারা নদীর উপর নৌকায় কতজন লোক কাজে নিযুক্ত রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে কর আদায় হতো। আবার কোন কোন জায়গায় ভিটি জমি ও মাছ ধরার অধিকার বাবদ একটি নির্দ্দিষ্ট কর প্রদান করতে হতো। বর্ষাকালে প্লাবনাবস্থায় নদীতে মাছ ধরার নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলোর মূল্য অনেক হ্রাস পায়। তখন জিরাতি রায়তগণ অল্পকর প্রদান করে থাকে। সে সব জেলে এ ঋতুতে দেশের অন্যান্য স্থানে গিয়ে মাছ ধরে, সেখানে পূর্বে তাদেরকে জলকর দিতে হত না। এদেরকে "ভাসানিয়া রায়ত" নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এদেরকে 'জিরাতি রায়ত'দের সামান কর দিতে হয়। প্লাবিত ভূমিতে মাছ ধরার অধিকারকে 'কালাপানি' নামে আখ্যায়িত করা হয় এবং নদীতে সব সময় মাছ ধরা থেকে এটা ছিল স্বতন্ত্র। 'বন-করের' ন্যায় এই সব ভূমিও এমন সব লোকদের অধিকারে থাকে যারা প্রকৃতপক্ষে এর মালিক নয়।

জেলেদের নিকট মাছ ক্রয় করে যারা শহরের বাজারগুলোতে সরবরাহ করে তাদেরকেও 'জিরাতি রায়ত'দের ন্যায় সমান কর জমিদারদেরকে দিতে হয়।

খেয়াঘাট ও হাট

খেয়াঘাট, হাট বা সাপ্তাহিক বাজার ইত্যাদি থেকেও জমির মালিকরা প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে।

জমিদারদের রাজস্বের অন্যান্য উৎস হলো চিনির কল ও পানের বাগানের উপর আরোপিত কর এবং 'পূনিয়া' বা বার্ষিক জমি বন্দোবস্তের দিন, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে উপঢৌকন বা নজর লাভ এবং ঝগড়া-কলহের নিষ্পত্তির জন্য জমিদারদের শরণাপন্ন হলে তার নিমিত্ত ধার্যকৃত জরিমানা ইত্যাদি।

তালুকদারগণ

সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলোর ন্যায় ঢাকা জেলাও বহির্আক্রমণের শিকার ছিল। মুঘল যুগের প্রথম দিকে এটকে কতকগুলো ছোট ছোট তালুকে বিভক্ত করা হয়। এবং বহিঃআক্রমণ থেকে প্রদেশ রক্ষার্থে যে সমস্ত লোক-দেরকে নিয়োগ করা হতো, সাধারণতঃ তাদের নামেই এসব তালুক নবাবগণ কর্তৃক মঞ্জুরী প্রদান করা হতো।

তালুকগুলোর মধ্যে অধিকাংশেরই নৌবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নির্দ্ধারিত ছিল এবং এগুলো 'আমলে নওয়ারাহ্' নামক জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জেলার দলিল দস্তাবেজে 'তাকসিম-ই তালুকদারের' নামোল্লেখ রয়েছে। ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে তোডরমল্লের তৈরী "তুমার-ই জমা" বা খাজনার তালিকায় যাদের জমি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল তাদেরকেই এ নামে অভিহিত করা হতো। তারা শুধু জমির মালিকই ছিলেন না, পরবর্তী কালে তাদেরকে স্বাধীনও করে দেয়া হয়েছিল। রাজস্ব সহজে আদায় করার জন্য পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট তালুকের দায়িত্ব গোড়াতেই বড় বড় তালুকদারের কাছে অর্পণ করা হতো। তিনি ঐ সকল তালুকের খাজনা আদায় করতেন এবং নিজস্ব তালুকের খাজনাসহ সরকারের নিকট প্রদান করতেন।

জমিদার শব্দের উৎপত্তি

উপরিউক্ত কাজের প্রেক্ষিতে তাঁকে জিম্মাদার বা জমিদার (জিম্মা বা দায়িত্ব থেকে) বলা হয়। যে সকল তালুকের রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে তিনি নিযুক্ত হয়েছেন—সেগুলো থেকে তাঁর মূলসম্পত্তি পৃথক করে বুঝাবার জন্যে "নিজ বা নিজস্ব" কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং তার জিম্মাদারী

হস্তান্তর করার সময় তিনি নিজস্ব সম্পত্তিও হস্তান্তর করতে পারেন অথবা ক্রেতা এর জন্য দাবীও করতে পারেন।

হাওলাদার (যে ব্যক্তি তালুকদারকে খাজনা প্রদান করে থাকেন) ছাড়া তালুকদার মূলতঃ ৪ শ্রেণীর ছিল।

জঙ্গলবাড়ী তালুকদার

দেশটা তপ্পায় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যে সকল লোক জঙ্গল পরিষ্কার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতো তাদেরকে এ আখ্যা দেয়া হয়েছিল। তকসিম বন্দী হওয়ার পর নতুন আবাদী জমিকে তালুক বিবেচনা করা হতো। এবং তা' নিকটস্থ জমিদারের খাজনা তালিকার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। সরকার কর্তৃক জমিদারের অংশের বৃদ্ধি বা হ্রাস মঞ্জুর করা হলে তার আনুপাতিক ভাগ তালুকদারের অংশেও পড়তো। এই সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ দখল করা যেতো, কিন্তু কোন সন্তান-সন্ততি না রেখে কোন তালুকদার মারা গেলে সরকারের পক্ষে জমিদার ঐ তালুকের ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক নিযুক্ত হতন।

জোর-খরিদ তালুকদার

এই শ্রেণীর তালুকদারদের জমিদারের অনুমতি ব্যাতিরেকেই তাদের তালুক বিক্রয় করার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু কোন তালুকদারের উত্তাধিকারী না থাকলে জমিদার তার সম্পত্তি দখলকরে নিজ অধিকারে রাখতে বা বিক্রয় করতে পারতেন। জমিদারীর বৃদ্ধি বা কমতির আনুপাতিক হারে তালুকদারগণ তালুকের বৃদ্ধি বা কমতির অধিকারী ছিলেন এবং তদানুসারে করও নির্দ্ধারিত হতো।

পাট্টা তালুকদার

জমিদার ও চৌধুরীগণ তাদের অধিকারভূক্ত কোন আবাদী বা অনাবাদী সম্পত্তির তালুকদারী-পাট্টা যে কোন লোককে অনুমোদন দিতে পারতেন এবং এতে এরূপ চুক্তি করা হতো যে, তালুকদারগণ চুক্তির আওতাভূক্ত সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হবেন এবং তাদের উত্তরাধিকারীগণ চিরদিনের জন্য এ-সবের ভোগ দখল ও তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। কিন্তু তালুকদার কিম্বা জমিদার কেউই তা' বিক্রয় করতে পারবেন না; তবে কোন তালুকদারের উত্তরাধিকারী কেউ না থাকলে ঐ তালুক জমিদারের অধিকারে চলে যাবে। জমিদারের রাজস্বানুসারে পাট্টা তালুকের রাজস্বেরও বৃদ্ধি বা কমতি অনুমোদিত হতো।

ওয়াসাত তালুকদার

জোর-খরিদ তালুকদার ও জমিদারের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, ওয়াসাত তালুকদার ও অন্যান্য তালুকদারদের মধ্যেও সেই একই রকম সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

হাওলাদার বা কর-দাতা

বিক্রমপুর এবং জেলার দক্ষিণাংশে তবস্থিত তালুকের কোন অংশের ক্রেতাকে ঐ অংশের হাওলাদার নামে আখ্যায়িত করা হতো। সে তার কর তালুকদারকে প্রদান করতো। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন কলহ-কোন্দল দেখা দিলে এ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো এবং তার সম্পত্তি অন্য কোন তালুকদারীর অধীনে সংযুক্ত করে দেয়া হতো। এই সম্পত্তি উত্তরাধিকারী সূত্রে অর্জন ও হস্তান্তর করা যেতো এবং অন্যান্য করদাতার ন্যায় এর মালিকও রাজস্বের বৃদ্ধি বা কমতির অধিকারী ছিল। এ জেলার অধিকাংশ তালুকই ক্ষুদ্র খণ্ডভূমিতে বিভক্ত এবং অনেকগুলো পরগণার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৮৩৬—৩৭ সনে অত্র কালেক্টরীতে মোট তালুকের সংখ্যা ছিল ৭১৫৪ ; এগুলোর মধ্যে ৭০২৫টি তালুক ঢাকা কাচারীতে এবং ১৪৯টি তালুক ফরিদপুরের কাচারীতে রাজস্ব জমা দিত।

তালুকদারগণ কর্তৃক প্রদত্ত রাজস্বের বিভিন্ন হার

ঢাকা কাচারীর সঙ্গে সংযুক্ত তালুকগুলোর রাজস্বের বিভিন্ন হার নিম্নের তালিকায় দেখানো হয়েছে।

তালুকের সংখ্যা			প্রত্যেকটি তালুক যে কর প্রদান করতো তার হার
২	...	...	১ হতে ১২ পাই কর প্রদান করতো
৩৩৪	...	...	১ আনা থেকে ৮ আনা ,,
৪৬২	...	...	৮ ,, ,, ১ টাকা ,,
৩৭৪৩	...	...	১ টাকা ,, ১০ ,, ,,
১৩১০	...	...	১০ ,, ,, ২৫ ,, ,,
৬২৪	...	...	২৫ ,, ,, ৫০ ,, ,,
২৯৫	...	...	৫০ ,, ,, ১০০ ,, ,,
১৯৩	...	...	১০০ ,, ,, ২৫০ ,, ,,
৬০	...	...	২৫০ ,, ,, ৫০০ ,, ,,
২২	...	...	৫০০ ,, ,, ১০০০ ,, ,,
মোট ৭০২৫			টাকা ১৪১১৫৬—১২—১

জমিদার

তালুকদারদের তুলনায় জমিদারদের সংখ্যা এ জেলায় কম। দশ-সালা জমি বন্দোবস্তের সময় এই শ্রেণীর অনেক জমিদার অত্র জেলায় ১ ফুট জমিরও মালিক ছিলেন না। তবুও তারা জমির স্বত্ব দাবী করেছিলেন এবং প্রচলিত মাশুলে তাদের তত্ত্বাবধানে কতকগুলো মহল মঞ্জুর করা হয়েছিল।

এঁরা মূলতঃ তহসিলদার ছিলেন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করতেন

এ জেলার জমিদারগণ মূলতঃ তহসিলদার ছিলেন। মুঘল সরকারের সনদ অনুসারে তারা ম্যাজিস্ট্রেটের বা ন্যায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাদের নিজ নিজ এলাকার কোন সম্পত্তি চুরি হয়ে গেলে তার মূল্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা দায়ী থাকতেন। কোম্পানী কর্তৃক তাদের উপর এ দায়িত্ব অর্পন করা হলেও এই সময় তাদের অযোগ্যতার জন্য এ জেলা যথেষ্ট পরিমাণে দুঃখকষ্ট ভোগ করেছিল। জেলায় ডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তারা এত দুর্ধর্ষ ছিল যে, কারো পক্ষে শহরের বাইরে যাওয়া মোটেই নিরাপদ ছিল না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, জমিদারগণ নিজেরাই ডাকাতদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এরা ডাকাতদের থেকে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করে তার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করতেন।

মগদের প্রতিরোধকল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহের শর্তে অনেক ভূমির কর নেওয়া হতো না

অনেক জমিদারকে প্রারম্ভেই নিষ্কর ভূমি মঞ্জুর করা হয়েছিল এই শর্তে যে, তারা এ জেলায় মগদের আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে নৌকা ও লোক সরবরাহ করবেন এবং এভাবে যে ভূমি তাদের দখলে ছিল তাকে 'নওয়ারাহ্' বলা হতো।

যারা নিজেরা ব্যক্তিগত ভাবে অভিযানে অংশ গ্রহণ করতেন তাদেরকে বেশী সুযোগ সুবিধা দেয়া হতো

যে সকল জমিদার নিজেরাই এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করতেন তাদের এই ব্যক্তিগত কার্যের বিবেচনায় তাদেরকে আরও বেশী ভূমির মঞ্জুরী প্রদান করা

হতো। এসব ভূমি সাধারণ ভাবে 'নওয়ারাহ্' এর অন্তর্ভুক্ত থাকলেও একে পৃথকভাবে চিহ্নিত করার জন্য "হিস্‌সা জেতে" নামে অথবা নদী বা দেশের যতটুকু অংশ তারা পাহারা দিতেন তা' বুঝাবার জন্য অন্য কোন নামে অভিহিত করা হতো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে জমিদারদের উন্নতি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদারদের বর্তমান অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হয়েছে বলে মনে হয়। কলেক্টর মিঃ ডে-এর মতে, "১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাদের মধ্যে কোন লোক ধনী কিম্বা সম্ভ্রান্ত ছিলেন না।" তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এই জেলায় তাঁর ১৫ বছর ব্যাপী বসবাস কালের মধ্যে তিনি এমন কোন জমিদার বা করদাতার নাম কখনও শোনেন নি, যিনি জমি বন্ধক দেওয়া ব্যতীত, শহরের কোন বণিকের ন্যায় সম্মান বজায় রেখে চলতে পারতেন।

এর মূল কারণ

জমিদারদের এই সংকটের কারণ ছিল এই যে, তারা রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাপনা নায়েবদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন, যারা অর্থ আত্মসাৎ করতে গিয়ে সবরকম পন্থাই অবলম্বন করতো। এবং এরা মুনিবদের অর্থে নিজেদেরকে বিত্তশালী করে তুলেছিল।

টাকা সংগ্রহের পদ্ধতি

টাকা সংগ্রহের তখন সাধারণ পদ্ধতি ছিল ঋণ। ঋণের টাকার দু' বা তিনগুণ বেশী মূল্যে শরফদের (শরীফ) কাছে তাদের তালুক বন্ধক দেওয়া হতো এই চুক্তিতে যে, "জমির ফসল শুধু কর্জ টাকার সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং কেবল আসল টাকা প্রদান সাপেক্ষে জমি ফেরৎ পাওয়া যাবে।"

জমিদারদের বর্তমান অবস্থা

এখানে জমিদারগণের অবস্থা সম্বন্ধে যা' বলা হয়েছে বর্তমানে তার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তাদের অবস্থা ভিন্নতর। এদের অধিকাংশই বর্তমানে বিত্তশালী ও শহরের বাসিন্দা। তালুক থেকে প্রাপ্ত আয়ের সাহায্যে তারা এখন প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে সক্ষম।

বর্তমান আর্থিক সংকটের কারণ

অল্প সংখ্যক জমিদার যে বর্তমানে অর্থ কষ্টের মধ্যে এখনও নিপতিত রয়েছেন তার জন্য তাদের নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-কলহই প্রধানতঃ দায়ী। এই সব কলহের মোকাবেলা করবার জন্য তাদের বহু অর্থ ব্যয়ে অনেক লোক পুষতে হয়, ব্যয় বহুল মামলা-মকদ্দমা পরিচালনা করতে হয় এবং রায়তদের স্থানান্তরিত করতে অর্থ খরচ করতে হয়।

তালুকের অংশীদারদের মধ্যে কলহ

তালুকের অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে সৃষ্টি হয় পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-কলহের। এটা তাদের দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ। জমিদারীর অংশীদারিত্বের পৃথককরণ অত্যন্ত ব্যয় বহুল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সরকারের বকেয়া রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে সম্পত্তি বিক্রয় করতে হয়।

নদীর গতি পরিবর্তন—জমিদারদের কখনও উপকার করে, কখনও ক্ষতি সাধন করে

নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে যে সমূহ ক্ষতি সাধিত হয় তা সহজে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে এর ফলে কোন কোন তালুক ক্ষতির কবলে পড়ে, আবার কোন কোন তালুক নতুন ভূমি বৃদ্ধি পাওয়ায় উপকৃত হয়। আবার কোন কোন অংশের জমির মূল্য কমে যায়। কিন্তু অন্যস্থানে হয়তো ছোট ছোট নালা ভরাট হয়ে যাওয়ায় জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের নিজেদের মধ্যে টাকা ঋণ করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে জমি "ইজারা প্রদান" অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমিজমা বন্দোবস্ত রাখা। কিন্তু এ জাতীয় জমি বন্দোবস্তের মোট পরিমাণ এই জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় খুব কম ছিল।

১০০০ হাজার টাকার উর্ধে রাজস্ব প্রদানকারী জমিদারদের সংখ্যা

যে সকল জমিদার ১০০০ টাকার উর্ধে রাজস্ব প্রদান করতেন তাদের সংখ্যা ছিল (১৮৩৬-৩৭ সালে কালেক্টরেটের রেকর্ডে রেজিস্ট্রীকৃত সংখ্যানুসারে) ৬৩। এদের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন হিন্দু, ২০ জন মুসলমান এবং ৩ জন খ্রীস্টান। হিন্দুদের মধ্যে ১১ জন ছিলেন ব্রাহ্মণ, ৮ জন বৈদ্য, ১৪ জন কায়স্থ এবং ৭ জন শূদ্র।

জমিদারী খাজনা আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী

কোন জমিদারের কর আদায় ও হিসেব সংরক্ষণের নিমিত্ত কতজন কর্মচারীর প্রয়োজন তা নির্ভর করে তার জমিদারীর আয়তন, অবস্থান ও অংশীদারদের সংখ্যার উপর। কোন কোন পরগণা বা তালুকে কতকগুলো গ্রাম একত্রিত করে খাজনা আদায় করা হয়; একে বলা হয় তপ্পা। অন্যান্য তালুককে বলা হয় 'জোড়'।

মণ্ডল ও তার কর্তব্য

প্রত্যেকটি মৌজা বা গ্রামে একজন কর্মচারী থাকে; তাকে বলা হয় মণ্ডল।[১] তার কাজ হলো জমির তত্ত্বাবধান করা ও রায়তদের মধ্যে তাদের নিজেদের ভেতর কোন বিষয় নিয়ে কলহ দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি করে দেওয়া।

পাটোয়ারী ও তার কর্তব্য

দু'তিনটি গ্রাম বা একটি তপ্পার উপরে রয়েছে পাটোয়ারী।[২] তার কাজ হলো হিসেব রাখা, রাজস্ব সংগ্রহ করা এবং তার নিকট জমি বণ্টনের ব্যাপারে কোন বিভিন্নতার বিষয় উল্লেখ করা হলে তার সংশোধন করে দেয়া।

আরও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ

জমিদারী বড় আকারের হলে আরও উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এঁকে বলা হয় 'চাকলাদার' বা তহসিলদার। ইনি পাটোয়ারীর উপরে প্রভুত্ব করে থাকেন। আবার পাটোয়ারী খবরদারী করেন মণ্ডলের উপর। সমস্ত হিসেব প্রস্তুত করে তা জমিদার বা তার নায়েবের নিকটে দেওয়া হয়। সে তা' কর-নির্ধারণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী মোহরার বা "তিত্‌নবীস" নামক লেখকের কাছে হস্তান্তর করে, তার কাছ থেকে উহা আদায় ও খরচের হিসেব রাখার জন্য 'অতপারনবীস' নামক অন্য একজন লেখকের নিকট প্রেরণ করে। এবং এ দু'জন কর্মচারী তাদের নিজ নিজ বিভাগের বিভিন্ন প্রকারের হিসেব ঠিক করে তার একটা সংক্ষিপ্ত-সার প্রস্তুত করে; এটাকে বলা হয় 'এহ্‌সাব-হিসাব'। এই দুটো অফিসে

১ হানদার, হাজদার বা শাম নামেও পরিচিত।

২ ইত মামদার, সিকদার, হবরাইদার বা তপ্পাদার নামেও অভিহিত।

আরও কয়েকজন অন্যান্য কর্মচারী রয়েছে, যেমন, খাজাঞ্চী, পোদ্দার বা টাকা আদান-প্রদানকারী, পত্র লেখক প্রভৃতি।

কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে জমিদার বছরে অন্ততঃ একবার তাঁর জমিদারী পরিদর্শনে বের হন, অথবা একজন বিশ্বস্ত আমীন নিযুক্ত করে প্রয়োজনবোধে জমির মাপ ও ভূমির জরিপ কার্য করিয়ে নেন।

প্রধান প্রধান জমিদারদের দেওয়ান ও উকিল

উপরিউক্ত কর্মচারী ছাড়াও প্রধান প্রধান জমিদারদের একজন করে দেওয়ান থাকে এবং জেলা কোর্টে কার্যাদি পরিচালনা করার জন্য একজন উকিল ও এটর্ণী নিযুক্ত থাকে। জমিদারীর কাচারী পাহারা দেওয়া, বিপদসঙ্কুল গ্রামগুলোতে কর আদায়কারীদেরকে সাহায্য করা এবং পরগণা থেকে টাকা-পয়সা জমিদারদের বাসভবনে বা সদর দপ্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য থাকে একজন জমাদার ও কয়েকজন বরকন্দাজ বা পাইক।

ছোট ছোট তালুকদারগণ

ছোট ছোট তালুকদার সাধারণতঃ একজন মণ্ডল নিযুক্ত করে এবং পাটোয়ারীর সাহায্য ছাড়াই নিজেরা রাজস্ব আদায় করে থাকে; অথবা তিন চারজন তালুকদার একত্রে একজন পাটোয়ারী নিযুক্ত করে। কতিপয় জমিদারী ও তালুকে মণ্ডল ও পাটোয়ারীরা টাকায় বেতন গ্রহণ করে। অন্যান্য স্থানে জমি ও টাকা উভয় রকমেই পারিশ্রমিক লাভ করে থাকে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা একই সময় অন্য পেশাও অবলম্বন করে। বছরে একজন মণ্ডলের বেতনের হার হচ্ছে ২½ টাকা থেকে ৩ টাকা। একজন পাটোয়ারী বেতন পায় ৩ টাকা থেকে ১০ টাকা। জেলার যে সব অংশ পানিতে প্লাবিত হয়, সে সব স্থানে তাদের জন্য জুন থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত নৌকা ভাড়া প্রদান করা হয়ে থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[বয়ন শিল্প—সীবন শিল্প—ধৌতকরণ—স্বর্ণ ও রৌপ্য কর্ম—শঙ্খ বলয় ইত্যাদি তৈরী—শহরে পেশা, ব্যবসায় ও কর্মসংস্থানের তালিকা—বাণিজ্য—বাণিজ্যের অবনতি।]

এই জেলায় ও শহরে প্রচলিত কয়েকটি শিল্পকর্মের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বয়ন শিল্প, সূচী শিল্প, ধৌতকরণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য কর্ম এবং শঙ্খবলয় তৈরী ইত্যাদি।

বয়ন শিল্প

ঢাকা বহুকাল পর্যন্ত মস্‌লিন বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। খ্রীস্টীয় অব্দের প্রথম শতক থেকেই ইউরোপে এই মসলিন বস্ত্র পরিচিত ছিল। কিছু সংখ্যক লেখকের মতে, তারা "সেরীয় ভেস্টিজ" (Serioe Vestes) তৈরী করতো, যা' প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বিলাসিতা ও উৎকর্ষের দিনে সেখানকার মহিলাগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে সমাদৃত হতো।[১] প্লিনী মিশর ও আরব দেশ থেকে আমদানীকৃত দ্রব্যাদির বর্ণনা দিতে গিয়ে বাঙলার মসলিনের কথা উল্লেখ করেন এবং "Circumnavigation of the Erythrean Sea"[২] নামক গ্রন্থের লেখক এসব বস্ত্রের সূক্ষ্মতা, অত্যুৎকৃষ্টতা ও স্বচ্ছতার[৩] বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দেন। উক্ত গ্রন্থ আরিয়ান নামীয় জনৈক মিশরীয় গ্রীক কর্তৃক লিখিত হয়েছিল এবং এতে কয়েক প্রকার ভারতীয় মসলিন বস্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে, যা এতদ্দেশীয় বাণিজ্যিক নামে পরিচিত ছিল।[৪] উৎকৃষ্ট বাংলা মস্‌লিনের নামকরণ করতে ব্যবহৃত শব্দ "কার্পাসাস" নিঃসন্দেহে সংস্কৃত "কার্পাস" কিংবা হিন্দি "কাপাস" তুলা থেকে উদ্ভূত। সুতরাং,

১ সালমাসিয়াস কৃত "Exercitationes Plinianioe" এবং ডঃ উরে কৃত "Cotton Manufacture of Great Britain", ১৮৩৬।

২ পরিপ্লাস মরিস ইরিথ্রিয়া।

৩ এই সেরীয় ভেস্টিজ (Serioe Vestes) এত সূক্ষ্ম ছিল যে, এর মধ্য দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখা যেতো'—প্লিনী।

৪ মলোচিনা বা মোটা মসলিন।
মোনাচি—সূক্ষ্ম রকমের প্রশস্ত মসলিন বস্ত্র।
জুদাইন, মোটা বস্ত্রাদি—ডঃ ভিন্সেন্ট কৃত পেনপ্লাসের অনুবাদ (Periplus Maris Erythrioe)।

তৎকালে সুতী, শন কিম্বা 'এসভেস্টাজের' তৈরী সকল প্রকার উৎকৃষ্ট বস্ত্র বোঝাতে প্লিনীর[১] সময়ে "কাপাসিয়াম" বা 'কার্পাসিয়ান' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। শব্দটি অবশ্য এরিয়ান ও মিশরীয় বণিকরা যেভাবে ব্যবহার করতেন, তার উৎপত্তি হয়েছিল খুব সম্ভবতঃ "কাপাসিয়া' নামক স্থান থেকে, যে স্থান থেকে এ সকল মসলিন বস্ত্রাদি রপ্তানী করা হতো।

ঢাকাই মসলিন

প্রাচীনকালে এস্থান ছিল মসলিন বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র—একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[২] "নবম শতকে দু'জন মুসলমান পরিব্রাজকের ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণে"ও ভারতীয় সূক্ষ্ম সুতীবস্ত্রের উল্লেখ আছে। এদেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন কিছু পরিবেশের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যাতে এটা পরিষ্কার মনে হয় যে, তারা ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। দেশের রাজার অধীনে বহুসংখ্যক হস্তি ও প্রচুর ধন-সম্পদের কথা উল্লেখ করে পর্যটকদ্বয় বলেন, "এদেশে তারা এরূপ অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে সুতী বস্ত্রাদি তৈরী করে যে, অন্য কোথাও এধরণের বস্ত্র পরিলক্ষিত হয় না। এসকল পোশাক-পরিচ্ছদ বেশীর ভাগই গোলাকার এবং এরূপ সূক্ষ্মভাবে বুনানো যে, তা মাঝারি ধরণের একটি আংটির ভিতর দিয়ে টেনে বের করা যায়। স্বর্ণ-রৌপ্য, আগরকাষ্ঠ[৩] ও ভোঁদড়ের[৪] চামড়া ইত্যাদি দিয়ে তারা ঘোড়ার জিন ও বাড়িঘরের আসবাবপত্র তৈরী করে এবং এসমস্ত দ্রব্য থাকা সত্ত্বেও কমমূল্যের মুদ্রা হিসেবে এদেশে কড়ির[৫] প্রচলন আছে। এই একই দেশে বিখ্যাত 'করকাদর' বা অশ্বের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট একশিঙ্গওয়ালা জন্তু[৬] দেখা যায়।" শুকিয়ে যাওয়া অনেকগুলো বড় বড় দীঘি ইত্যাদি থেকে অতীতে এইস্থানে একটি সমৃদ্ধিশালী ও কর্মবহুল জনপদের অস্তিত্ব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[৭]

১ প্লিনীর 'লিনাম কার্পাসিয়াম' ছিল স্পেনের উৎকৃষ্ট শণতন্তু।
২ জেলার এই অংশ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ।
৩ আগর কাঠ।
৪ ভোঁদড় বা উবিড়ালের চামড়া।
৫ কড়ি ইত্যাদি।
৬ গণ্ডার, পরবর্তী একটি অনুচ্ছেদ থেকে তা প্রতীয়মান হয়।
৭ আবে ফ্লোরজার্ত কর্তৃক অনূদিত গ্রন্থ "Accounts of India and China by two Mohammedan travellers"।

সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের পৃষ্ঠপোষকতা

সম্রাজ্ঞী নুরজাহান ব্যাপকভাবে দেশের শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনের কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকাই মসলিন খ্যাতি অর্জন করে। এই সময় এ সকল বিলাস বস্ত্রাদি হিন্দুস্থান-সম্রাট এবং তদীয় রাজ প্রতিনিধিবর্গের রাজদরবারে আমীর-ওমরাহগণের সৌখিন পোশাকরূপে পরিগণিত হয়; অন্যদিকে উৎকৃষ্ট মসলিন এমনই চমৎকাররূপে সূক্ষ্ম ও হালকা যে তা প্রাচ্যের রূপক ভাষায় "হাওয়ার ইন্দ্রজাল," "আব্‌রেঁায়া" বা প্রবহমান জলধারা, অথবা "শবনম" বা প্রভাত শিশির[১] ইত্যাদি নানান্ নামে বর্ণিত হয়েছে এবং একান্তভাবে অন্তপুরবাসিনী সুন্দরীদের সুসজ্জিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সকল সময়ে ঢাকাই মসলিন তার বিরাট সুনাম রক্ষা করে এসেছে এবং এমন কি, বর্তমানকালে বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে বৃটেনের চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও এসকল মসলিন বস্ত্র এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বুনানির স্বচ্ছতা, সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতায় মসলিন কাপড় পৃথিবীর যে কোন অংশের তাঁতের তৈরী সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টমানের বস্ত্রের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ১৮৩৬ সনে ডঃ উরে লিখেছেন, "ঢাকায় মসলিন বস্ত্র এবং সুতো এখনও তৈরী হচ্ছে, যার নিকট ইউরোপের উদ্ভাবনী শক্তিও হার মানে এবং এই দক্ষতা এমনই যে, একজন সুবিজ্ঞ বিচারকও বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, এটা তাঁর ধারণার বাইরে—কিভাবে বিলাতের তৈরী সূক্ষ্মতম বস্ত্র অপেক্ষাও বহুগুণে সূক্ষ্মতর মসলিন সুতা মাকুতে তৈরী করা যায় এবং পরে তা' বুনানো সম্ভব হয়"।[২]

মীর্জাপুরের তুলা

সকল উৎকৃষ্ট মসলিনই এ জেলায় উৎপন্ন দেশী সুতায় তৈরী। মীর্জাপুর থেকে আমদানী করা তুলা থেকে নিম্নমানের বাপ্তা, হাম্মাম ও অন্যান্য পাঁচমিশালী বস্ত্রের সুতা কাটা হয়ে থাকে। মীর্জাপুরের তুলার পরেই আরাকানী তুলার স্থান। এ তুলা সামান্য পরিমাণে আমদানী করা হয়, কিন্তু কার্যতঃ উৎকৃষ্ট মসলিন' উৎপাদনের জন্য তা কখনও ব্যবহৃত হয় না। গারো ও পার্বত্য ত্রিপুরার ভোগা তুলা শুধুমাত্র সবচেয়ে মোটা ধরনের

---

১ এভাবে নামকরণের হেতু এই যে, সিক্ত অবস্থায় শিশির ও মসলিন বস্ত্র ভাবে চেনা যায় না।

২ ডঃ উরে প্রণীত "Cotton Manufactures of Btitain"।

কাপড়-চোপড় তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জেলায় ইংলণ্ডের পাকানো সুতা আসার সময় থেকে অবশ্য এসকল বিভিন্ন প্রকার তুলা আমদানী ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানের পরিমাণ সম্ভবতঃ ১৭৮৭ সালে আমদানীকৃত তুলার পরিমানের এক-ষষ্ঠাংশও হবেনা। মেয়েরা তুলা পরিষ্কার করে এবং তারাই সুতা কাটে। পশম থেকে বীজ ছড়ানোর জন্য চরকি ও দলন কাঠি ব্যবহৃত হয়। চরকি হচ্ছে সাধারণ হস্তচালিত কারখানা (common hand mill) বা একজোড়া দ্রুতচালিত কাঠি বিশেষ, যা' সমগ্র দেশব্যাপী প্রচলিত রয়েছে এবং এখানে তা' দ্বিতীয় মানের সুতার জন্যে তুলা পরিষ্কারের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উৎকৃষ্টমানের সুতার জন্যে সামান্য পরিমাণ উপকরণ পরিষ্কারের কাজে দলন কাঠির ব্যবহার হয়। একটি লোহার শলার মধ্যখানটি মোটা ও দু'দিক সরু করে দলন কাঠি তৈরী করা হয়ে থাকে। একটি কাঠের বোর্ডের উপরে তুলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তার উপর দিয়ে হাতে বা পায়ে দলন কাঠিটাকে গড়ান হয়। কাঠির দু'প্রান্ত হাত বা পা' দিয়ে ধরার জন্যে বোর্ডের বাইরে একটু বেরিয়ে থাকে। মহারাষ্ট্র-যন্ত্রের ন্যায় একই পদ্ধতিতে দলন কাঠির কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা বম্বের ডঃ লাশ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং এর একটি নক্শা তুলা ইত্যাদির উপর কাগজে খোদাই করা আছে, যা' সম্প্রতি 'কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্' কর্তৃক প্রকাশিতও হয়েছে। এ'দুটো যন্ত্রের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে প্রচলিত প্রস্তর নির্মিত বোর্ডের পরিবর্তে এখানে কাঠের বোর্ড ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঢাকায় ব্যবহৃত' দলন কাঠি আকারে কিছুটা ছোট এবং তা' হাত দ্বারা চালানো হয়। কিন্তু ময়মনসিংহে যে দলন কাঠির ব্যবহার হয়, তা' পা দিয়ে চালানো হয়ে থাকে। মহারাষ্ট্রের মত এখানেও কাঠের নির্মিত পদতল বা পা'দানি দ্বারা পা'দুটো নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা আছে। দলন কাঠিতে সুতা কাটার যন্ত্র অপেক্ষা সুতা কম ভাঙ্গে বলে জানা যায়। পরবর্তী পর্যায় হলো তুলা ধুনা বা খোসা ইত্যাদির বাদ্ বাকি অংশ থেকে তুলাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা। ধুনকরদের ব্যবহৃত বাঁশ ও মুগা রেশমের তৈরী ধনুকের ন্যায় যন্ত্র দিয়ে তুলা ধুনতে হয়। শহরে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা তুলা ধুনার জন্য ধনুক তৈরী করে থাকে, এটা তাদের একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা। কিন্তু এ যন্ত্র কখনও সুতা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত

হয়না। মুসলমানদের জন্যে শুধুমাত্র শীত ঋতুর উপযোগী কাপড়-চোপড় ও লেপ-কাঁথা তৈরীর কাজে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে।

উৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরীর জন্য যে তুলা ব্যবহৃত হয়, তা' ধুনা বা ধনুকে ব্যবহার করার পূর্বে চিরুণীতে আচঁড়ানো হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে যন্ত্রের ব্যবহার হয়, তাহলো বোয়াল মাছের শুকনো চোয়ালের কাঁটা (Silirus Boalis)। অর্থাৎ ভালো সুতা উৎপাদনের জন্য ধুনার পূর্বে বোয়াল মাছের চোঁয়ালের কাঁটা দিয়ে চিরুনির সাহায্যে আচঁড়ে নেয়ার প্রয়োজন হয়। উক্ত হাড় প্রায় দু'ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা ও অর্ধ-চন্দ্রের ন্যায় বাঁকা এবং এর অভ্যন্তরে ভাগের উপর অনেকগুলো চিকন চিকন বাঁকানো দাঁত থাকে। এটি দিয়ে আচঁড়ানোর ফলে শুধুমাত্র তুলোর সূক্ষ্ম আঁশগুলো এসব দাঁতের ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসে। তুলা ধুনার পরেও আবার সূক্ষ্ম সুতা তৈরীর প্রয়োজনে তুলাগুলোকে শুকনো চিতল মাছ কিম্বা কুচিয়ার মসৃন চামড়ার উপর যত্নের সঙ্গে বিছিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর একটি গোলাকৃতি নলের 'কেসের' ভেতর পুরে নিয়ে, তা' হাতে রেখে সুতা কাটা হয়ে থাকে।

সব রকম সুতা সাধারণতঃ মেয়েরাই কাটে। এরা সাধারণতঃ অবসর সময়টায় এ কাজে নিয়োজিত থাকে। ৩০ নম্বর বৃটিশ—পাকানো সুতার চেয়ে নিম্নমানের অপেক্ষাকৃত মোটা সুতা চরকা দিয়ে কাটা হয়। কিন্তু ঐ নম্বরের উপরে সকল রকম সুতা উৎপাদনের নিমিত্ত টাকু ব্যবহৃত হয়। অত্যুৎকৃষ্ট মানের সুতা তৈরীর কাজে ব্যবহৃত টাকু উত্তমরূপে ঘষামাজা ইস্পাত নির্মিত দশ ইঞ্চি লম্বা একটি বড় সুচ বিশেষ। এর তলদেশ থেকে এক ইঞ্চি উপরে থাকে একটি গোলাকার কাদার পিণ্ড। সুতা কাটার সময়ে টাকু হেলানো অবস্থায় রেখে ঘোরান হয় এবং এর নিম্নভাগ ভাঙ্গা কড়ি বা কচ্ছপের ডিমের ভিতরে বসিয়ে ঘুরানো হয়। এভাবে হাতের অন্য আঙ্গুল ও বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যে রেখে ঘোরানো হলে, বাম হাতে ধরে রাখা তুলা ক্রমশঃ উহা থেকে উঠে আসে এবং টেনে বের করে আনা সূক্ষ্মতন্তু সুতায় পরিণত হয়। এই হলো এখানকার সুতা কাটার পদ্ধতি। এরূপে সুতা কাটায় পারদর্শী এক ব্যক্তি এক টাকার রৌপ্যমুদ্রা বা ১৮০ গ্রেন ওজনের তুলা থেকে ৪ মাইলেরও অধিক লম্বা সুতা তৈরী করতে পারে। [১ রতি প্রায় ২ গ্রেন]। ১৮ থেকে

৩০ বছর বয়সের হিন্দু মেয়েরা শ্রেষ্ঠ সুতা কাটনী। ৩০ এর পরে তাদের দক্ষতা হ্রাস পায় এবং ৪০ এর পরে তাদের দৃষ্টিশক্তি নিদারুণ দুর্বল হয়ে পড়ে ; ফলে অতি সূক্ষ্ম সুতা কাটা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

প্রভাত এবং অপরাহ্ন হচ্ছে সুতা কাটার বিশেষ সময়। এ সময় সূর্যের প্রখর রশ্মি হ্রাস পায় বলে চোখ ঝলসাতে পারে না, অপরদিকে বাতাসের আদ্রর্তা পুনঃ পুনঃ সুতো ছেঁড়া নিবারণ করে থাকে। ডঃ উরে লিখেছেন, "ভারতে প্রস্তুত মসলিন বস্ত্রের উৎকর্ষের কারণ খুঁজতে হবে প্রাচ্যের অধিবাসী-দের চমৎকার সাংগঠনিক ক্ষমতার মধ্যে। শরীর বিশেষজ্ঞদের বিবরণে স্নায়বিক ব্যক্তির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—এদের মেজাজ সর্বাংশে তারই অনুরূপ।" আমি আরো বলতে পারি যে, অবসাদগ্রস্ত মানসিকতা কার্যতঃ হস্তকর্মকে প্রভাবিত করে ; বিশেষ দক্ষ কাটনীও কোন প্রকার পারিবারিক দুঃখ কষ্ট কিম্বা মানসিক অশান্তিতে ভুগলে তার পক্ষে এমন কি, দ্বিতীয় শ্রেণীর সুতা পর্যন্ত কাটাও অসম্ভব হয়। ইণ্ডিয়া হাউজের মিউজিয়ামে ঢাকায় তৈরী সুতার নমুনা সংরক্ষিত আছে, যা' বহু বছর পূর্বে স্যার চার্লস উইলকিনস্ কর্তৃক সেখানে রাখা হয়েছিল। এ সুতার সূক্ষ্মতাও সৌন্দর্যের জন্যে তথায় উহা বহুল পরিমাণে প্রসংশিত হয়েছে। পরলোকগত স্যার জোসেফ ব্যাংকস্ কর্তৃক এর ওজন ও পরিমাপ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তাতে দেখা গিয়েছিল প্রতি পাউণ্ড তুলায় ১১৫ মাইল ২ ফার্লং ৬০ গজ সুতা রয়েছে।[১] ইংলণ্ডে অবশ্য ১ পাউণ্ড ওজনের সুতার ১৬৭ মাইল পর্যন্ত হয়, কিন্তু ৩৫০ নম্বরের এই সুতা এত সূক্ষ্ম যে এ'থেকে মসলিন বস্ত্র তৈরী বা বোনা বৃটেনে সম্ভব নয়।

সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের সুতা হলো ২৫০ নম্বর, যা' দিয়ে সেখানে এযাবৎ মসলিন তৈরী হয়েছে এবং এর এক পাউণ্ড তুলার সুতার দৈর্ঘ ১১৯½ মাইল, যদিও কদাচিৎ ২২০ নম্বরের উর্ধের সুতা ব্যবহৃত হয়। ঢাকায় ২৫০ নম্বর সুতা আমদানী করা হয়েছে এবং তা' দিয়ে মসলিন তৈরীও হয়েছে। কিন্তু এদেশীয় উৎকৃষ্ট মানের সুতার কাছে তা' দাঁড়াতেই পারেনা। এক তোলা ওজনের সুতা ৭২০০ গজ তথা প্রতি পাউণ্ডে ১৬০ মাইল দীর্ঘ সুতা সূক্ষ্মতায় যেমন অতুলনীয়, তেমনি টেঁকসই। ১৮৩৭ সালের তৈরী এই প্রকারের সুতার

১. বেইনস্ কৃত "হিস্ট্রী অব কটন ম্যানুফেকচারস।"

একটি নমুনা অধুনা আমার নিকট ছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ সুতোর ওজন ও পরিমাপ গ্রহণ করা হয় এবং তাতে এর ওজন ছিল ৫ গ্রেন ও দৈর্ঘ্য ছিল ২০০ গজ। ঢাকায় তৈরী সুতা সাধারণতঃ ইংলণ্ডে যন্ত্রে-কাটা সুতার চেয়ে বেশ মোলায়েম এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে, এই সুতায় তৈরী বস্ত্রাদি অনেক বেশী টেঁকসই; যদি ও প্রায়শঃ ত্রুটিপূর্ণ ধৌতকরণের ফলে তা' ইংলিশ মসলিনের মত সব সময় অতটা উত্তম মনে হয় না। এ সুতা অনিয়মিতভাবে পাকানো হয় বলে জানা যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এটি একটি নিকৃষ্টভাবে তৈরী চুলের ন্যায় দড়ি বিশেষ যা' থেকে অনেক আঁশ বেরিয়ে থাকে, অনেকটা এরূপ প্রতীয়মান হয়। এই সূক্ষ্ম তন্তুর ব্যাস এক ইঞ্চির ১/১০০০ থেকে ১/১৫০০ ভাগ পর্যন্ত হয় এবং সুতো কিছুটা চ্যাপ্টা ও ফিতার ন্যায়। আলাদা অবস্থায় উক্ত তন্তুর এই আকৃতির উপরই ঢাকাই মসলিনের স্বচ্ছতা নির্ভরশীল। শোনা যায় যে, যদি এ সুতা আরো ঘনভাবে পাকানো হয়, তাহলে তা' বৃটেনের তৈরী সুতার ন্যায় অস্বচ্ছ তন্তুর আকার ধারণ করে। তুলার আঁশ যতই লম্বা নলাকৃতি পাকানো এবং স্থিতি-স্থাপক হবে ততই তা' যন্ত্রদ্বারা তৈরী করার উপযোগী, এবং হাতে তৈরী করার অনুপযোগী হয়ে থাকে। সে অনুসারে, আমেরিকান তুলা এ ধরনের কয়েকটি গুণের অধিকারী এবং বৃটিশ তাঁতের জন্য তা' উপযোগী, কিন্তু ঐ তুলা থেকে এখানে উৎকৃষ্ট মানের সুতো উৎপাদন করা যায় না। ১৮১১ সালে কমার্সিয়াল রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত সি-আয়ল্যাণ্ডের সামান্য কিছু পরিমাণ তুলা পরীক্ষা করে দেখা হয়, এবং সুতা কাটনীরা এথেকে কোনরূপ ভাল সুতা তৈরী করতে অপারগ হওয়ায় তা' ঢাকার কারখানায় উৎপাদনের অনুপযোগী ঘোষণা করা হয়। ফলে এর দ্বারা কোন ফলোদয় হয়নি। পূর্বে সুতা কাটার কাজে সর্বশ্রেণীর অধিবাসীরা নিয়োজিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতো। ১৮২৪ সালে ঢাকায় বিলেতী কলের তৈরী সুতা প্রবেশ করায় এ শিল্প শাখা ক্ষতিগ্রস্থ হতে শুরু করে এবং ১৮২৮ সালে তা' দ্রুত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে অধিকাংশ ঢাকাই বস্ত্র ৩০ নম্বর থেকে ২০০ নম্বরের বিলেতী সুতায় তৈরী হয়। প্রধানতঃ ৬০, ৭০, এবং ৮০ নম্বর সুতো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে দেশী এবং সাধারণতঃ ঢাকায় আমদানীকৃত বিভিন্ন রকম বিলেতী সুতার মূল্যের একটি তুলনামূলক হার ও গুণাগুণের চিত্র প্রদত্ত হলো।

বিলেতী সুতার নম্বর.	দেশী ও বিলেতী সুতার ওজনের একটি আনুপাতিক হার।			এক মোড়ার ১/৪ ভাগ বা ১ ১/৪ হ্যাঙ্ক পরিমান বিলেতী সুতার মূল্য			এক মোড়ার ১/৪ ভাগ বা ১ ১/৪ হ্যাঙ্ক পরিমাণ দেশীয় সুতার মূল্য।		
	সিক্কা [Siccas	আনা As.	গণ্ডা gds.]	টাকা [Rs.	আনা As.	গণ্ডা gds.]	টাকা [Rs.	আনা As.	গণ্ডা gds.]
২০০	১	০	০	০	৩	০	০	১৩	০
১৯০	১	০	১৮	০	২	১৫	০	১০	০
১৮০	১	১	১৫	০	২	১৫	০	৬	০
১৭০	১	২	১৬	০	২	১০	০	৫	০
১৬০	১	৪	০	০	২	১০	০	৪	০
১৫০	১	৫	৭	০	২	১০	০	৩	০
১৪০	১	৬	১৭	০	২	৫	০	৩	০
১৩০	১	৮	১২	০	২	৫	০	৩	০
১২০	১	১০	১৩	০	১	১৫	০	২	১৫
১১০	১	১৩	৫	০	১	১৫	০	২	০
১০০	২	০	০	০	১	৫	০	২	০
৯০	২	৩	১১	০	১	৫	০	১	১৫
৮০	২	৮	০	০	১	৫	০	০	১৫
৭০	২	১২	০	০	১	১ ১/৪	০	১	১৫
৬০	৩	৫	৫	০	১	২ ১/২	০	২	০
৫০	৪	০	০	০	১	৫	০	২	০
৪০	৫	০	০	০	১	৭ ১/২	০	২	০
৩০	৬	১০	০	০	১	১০	০	২	০

কলে তৈরী বিলেতী সুতা একদিকে যেমন সস্তা, অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন-মত পর্যাপ্ত পরিমাণ একই পর্যায়ের সুতা বাজারে পাওয়ার সুবিধা থাকায়, এদেশীয় লোকেরা তা বেশ পছন্দ করে। অপরপক্ষে, একই নম্বরের দেশী সুতা অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করা খুব কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। উৎকৃষ্টমানের মসলিন সুতা জোগাড় করার জন্য জেলার বিভিন্ন হাটে বাজারে ঘোরাফেরা করতেই তাঁতিদের মসলিন-বয়নের দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়।

এ জেলায় প্রায় ৩৬ রকমের কাপড় তৈরী হয়ে থাকে এবং হিসেব করে দেখা গেছে যে, মোট তৈরী বস্ত্রের আট ভাগের ছ'ভাগ কাপড় ৩০ থেকে ১০০ নম্বরের বিলেতী সুতায় প্রস্তুত হয়। বাদবাকি কাপড় অর্থাৎ ৮ ভাগের ১½ ভাগ, ৩০ নম্বরের নিম্নের সুতায় এবং ½ ভাগ ২০০ নম্বরের বিলেতী পাকানো সুতা অপেক্ষা বেশী নম্বরের দেশীয় উৎকৃষ্ট মানের সুতায় তৈরী হয়। শেষোক্তটির উর্ধ সংখ্যার সুতা দ্বারা প্লেন মসলিন তৈরী হয়; সাধারণতঃ এ বস্ত্র ক্রেতাদের ফরমায়েশে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে এবং "মলমল খাস" নামে অভিহিত হয়। কথিত আছে যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে দৈর্ঘ্যে পাঁচ গজ (১০ কিউবিট) ও প্রস্থে একগজ এবং ৫ সিক্কা বা ৯০০ গ্রেন ওজনের একখানা 'আবরোঁয়া' মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা যেতো, যার মূল্য ছিল ৪০০ টাকা। বর্তমানে ঐ একই পরিমাপের যে উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র তৈরী করা যায়, তার ওজন প্রায় ৯ সিক্কা বা ১৬০০ গ্রেন, এবং মূল্য ১০০ টাকা। 'ফুলওয়ার' বুটিদার, ডোরা কাটা, ও'পলয়ার' বা নানা বর্ণে চিত্রিত মসলিন বস্ত্র ব্যাপক পরিমাণে তৈরী হয়ে থাকে। উৎকৃষ্ট মানের ফুলতোলা বা জামদানী মসলিন দেশীয় সুতায় তৈরী হয়, কিন্তু ২০০ নম্বর বিলেতী সুতা দিয়েও বেশ কিছু পরিমাণ মসলিন তৈরী হয়ে থাকে। এ সব বস্ত্র অযোধ্যা ও হিন্দুস্থানের দেশীয় বিভিন্ন রাজদরবারে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু এ ধরনের বার্ষিক মোট উৎপাদিত বস্ত্রের মূল্য এক লক্ষ টাকার উর্ধে নয়। খুব সম্ভবতঃ মুসলমানরাই জামদানী মসলিনের বুননের প্রচলন করেন এবং আজও তাদের হাতেই প্রধানতঃ এর উৎপাদন একচেটিয়া। মুঘল সরকারের আমলে জামদানী মসলিনের তাঁতিরা এক প্রকার শুল্ক প্রদান করতো। নির্ধারিত মূল্যের উর্ধে বিদেশীয় বণিকদের নিকট এসব বস্ত্র বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। বিলেতী সুতায় তৈরী অধিকাংশ বস্ত্রই হচ্ছে সাদা মসলিন। শহরে সূচীকর্মের দ্বারা এগুলোকে নানারকম কারুকার্য খচিত করা হয় এবং প্রতি বছর পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এলাকায় রপ্তানী করা হয়ে থাকে। সুতী ও পশমী তসর এবং সাদা ও রঙ্গীন সুতার মিশ্রিত বস্ত্রাদিও তৈরী হয় এবং এভাবে প্রস্তুত বস্ত্রের পরিমাণ সমগ্র জেলায় উৎপাদিত কাপড়ের প্রায় আটভাগের এক ভাগ। এ সকল বিভিন্ন প্রকার কাপড় সূক্ষ্ম বুনানি, নমুনা, উৎপাদনের উৎস বা ব্যবহার পদ্ধতি ইত্যাদি নির্দেশক বিভিন্ন নামের দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যেমন "আবরোঁয়া"—প্রবহমান

জলধারা এবং "শবনম" বা সন্ধ্যা-শিশির। শিশির-সিক্ত দুর্বাদলের সঙ্গে একে রাখলে একটা থেকে অন্যটাকে বেছে বের করা সম্ভব হয় না। এ ছাড়া আছে "ডুরিয়া" বা দ্বিগুণ সুতী, এবং "চার কোণ বা চারকোণা নক্‌শা-বিশিষ্ট", "সরকার আলী বা নবাবের পারিবারিক" ইত্যাদি। দেশের অন্যান্য অংশে প্রচলিত রীতির ন্যায় ঠিক একই রকম বয়ন পদ্ধতি এখানেও অনুসৃত হয়ে থাকে। এটা লক্ষ্যযোগ্য যে, ইউরোপীয় পর্যটকগণ যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, পদ্ধতিটা অনুরূপ সহজ না হলেও অনেকটা গ্রাম্য বা স্থূল। সাধারণ ধারণানুযায়ী তাঁতি তার তাঁত নিকটতম কোন বৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করার পরিবর্তে, সর্বদা নিজস্ব আবাস-গৃহের চালার নীচে অথবা এ উদ্দেশ্যে তোলা 'শেডের' নীচে স্থাপন করে তাঁর কাজ চালিয়ে থাকে। যথেষ্ট আলো বাতাস পাওয়ার জন্য কুঁড়ে ঘরের চতুর্দিক খোলা থাকে। যন্ত্রপাতির নিম্নাংশ এবং কাজে বসার সময় তাঁতির পদদ্বয় রাখার জন্য একটি গর্ত খোঁড়া হয়, এবং ধূলোবালি ও বৃষ্টির পানির হাত থেকে বুনট রক্ষার্থে চারটি বাঁশের উপর এক বা একাধিক মাদুর দিয়ে, সে তাঁতের উপরে একধরনের চাঁদোয়া তৈরী করে। কাঁচামাল থেকে সুতা তৈরী এবং তা'থেকে উৎকৃষ্ট মসলিন বয়ন সম্পূর্ণ করতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মোট সংখ্যা ১২৬ বলে জানা যায়। এর সবগুলোই বাঁশের ছোট ছোট খণ্ড বা নল খাগ্-ড়ার তৈরী এবং পাতলা দড়ি বা সুতা দিয়ে বাঁধা থাকে। এছাড়া, এসকল জিনিসপত্র নির্মাণের কারিগরি কৌশল এত গ্রাম্য ও সহজ যে, প্রায় প্রত্যেক তাঁতিই নিজে নিজে সবগুলো উপকরণ নির্মাণ করতে পারে। অবশ্য সময় ও ক্লেশজনক অবস্থা থেকে রেহাই পাবার জন্য তারা সাধারণতঃ প্রস্তুত উপ-করণাদি বাজার থেকে সংগ্রহ করে আনে। ভাতের মাড় দিয়ে সুতা বিন্যস্ত করা হয়, এবং কিছু সময়ের জন্য রোদে ফেলে রাখার পর, তা' তাঁতির দু'হাতে ধরে রাখা দুটো ছোট চাকার উপর জুড়ে দিয়ে, সুতা গুটানো হয়। চারটি বাঁশের খুঁটি মাটিতে পুঁতে শেষোক্ত কার্যটি সমাধা করা হয়। চিরুনির ন্যায় একটি যন্ত্র এই গুটানো সুতা পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত হয়। একটি অন্তর একটি সুতার মধ্যে স্থাপিত যন্ত্রাংশে সংযুক্ত শিকলের ন্যায় সুতার একটি ছিদ্রে থাকে এবং অন্যটি নিম্নে স্থাপিত যন্ত্রাংশে যুক্ত অনুরূপ শিকলাকৃতি একটি ছিদ্র থাকে। এই রকম দুটো ছিদ্র বিশিষ্ট শিকলাকৃতি সুতার এক-একটি পায়ের নীচে স্থাপিত এক একটি যন্ত্রাংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং এ যন্ত্রাংশের দ্বারা বিন্যস্ত সুতা উপরে উঠানো ও নিম্নে দাবানো হয়, যাতে এর মধ্য দিয়ে

মাকু চলাচল করতে পারে। এই পরবর্তী যন্ত্রটির বা যন্ত্রাংশের অগ্রভাগ বিলেতী মাকুর ন্যায় ধারালো নয়। ভিতরে স্থিরভাবে স্থাপিত ববিনের পরিবর্তে বয়নের তন্তু লোহার শলাকা বা তারের উপর ঘূর্ণায়মান একটি ছোটনলে পাকানো হয়। উৎকৃষ্টমানের মসলিন বয়নের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো বর্ষাকাল; এ সময়ে আবহাওয়ার আর্দ্রতা মসলিনের সুতাকে ভাঙ্গার হাত থেকে রক্ষা করে। শুষ্ক গরম আবহাওয়ায় উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র বয়নের প্রাক্কালে তাঁতের নীচে পাত্রভরা ভাসা-ভাসা পানি রাখার একান্ত প্রয়োজন হয়; কেননা, বাষ্পসিক্ত আবহাওয়ায় সুতা আর্দ্র রাখে। এর থেকেই সম্ভবতঃ এই ধারণার উৎপত্তি[১] হয়েছিল যে, ঢাকাই মসলিন পানির নীচে রেখে বোনা হয়ে থাকে।

অধিকাংশ তাঁতিই হিন্দু। এরা ঢাকা, ডেমরা, তীতবধ্দি, জঙ্গলবাড়ী ও সোনারগাঁয়ে প্লেন বা সাদা মসলিন তৈয়ার করে। সোনারগাঁয়ে মুসলমান তাঁতিদের সংখ্যা অধিক। এরা জামদানী মসলিন বস্ত্র তৈরীতে নিয়োজিত। অপেক্ষাকৃত মোটা ধরনের কাপড়-চোপড় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তৈরী করে থাকে। এদেরকে এই দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে যথাক্রমে যোগী ও জোলা নামে অভিহিত করা হয়। বস্ত্র বয়ন-কালে কখনও দুই বা তিন গজের অধিক বুনট অনাবৃত থাকেনা। শানান মসলিনের জন্য ব্যবহৃত মাড়ে সামান্য পরিমাণ প্রদীপের কালি মিশানো হয়ে থাকে; ফলে তাঁতির ব্যাখ্যানুযায়ী শাড়ীর নাম "আধো-কালো" বা "ক্ষীণ আলোর-সন্ধ্যা" ইত্যাদি রাখা হয়েছে।

সূচী শিল্প

সুতা কাটা এবং বয়ন শিল্পের পরেই সূচীশিল্প এখানে অত্যন্ত ব্যাপক আকারে, বিশেষতঃ মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত। মসলিন তৈরীতে হিন্দু তন্তুবায়গণ তাঁতে যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন, মুসলমানগণও সূঁচ-সুতো দিয়ে পুরোপুরি একই রকম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন।

১. ভারতীয় তন্তু দৃষ্টে এটা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অসংলগ্ন বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ থাকার দরুন, মসলিন বস্ত্র মাঝে মাঝে পানির নীচে রেখে বোনা হয়, এতে তন্তুটি অক্ষুন্ন থাকে। এটা এমনভাবে করা হয়—যে ভাবে একজন শরীর-ব্যবচ্ছেদকারী একটি অতি সূক্ষ্ম দেহাংশ একই মাধ্যমে ভাসমান অবস্থা থেকে সেলাই করে থাকেন। —উরে কৃত "Catton Manufacture of Hindustan".

ধৌত করার সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা ছিঁড়ে যাওয়া মসলিন বস্ত্রাদি মেরামত করা, ছাপমারা, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য সূত্রে বস্ত্রের শিরোনাম তোলা ইত্যাদি কার্যে রিফুকারগণ নিয়োজিত রয়েছে। একজন দক্ষ রিফুকার সূক্ষ্ম মসলিনের সমগ্র জমিন থেকে দীর্ঘ একটি সুতা বের করে, সেখানে নতুন করে একই মানের একটি সুতা নিখুঁতভাবে চালিয়ে দিতে পারে। এই শ্রেণীর প্রায় সকল কর্মীই আফিমখোর, এবং আফিম না খেয়ে এদের প্রায় সকলেই একাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। মসলিন বস্ত্রাদিতে ফুল তোলার কাজ এক ধরনের সূচী শিল্পীরা করে থাকে। এদেরকে 'চিকনদাজী' বলা হয়, এবং মসলিন, পশমী শাল ও রুমাল ইত্যাদি বস্ত্রের সোনা-রূপা ও রেশমী সুতার কাজকে বলা হয় 'জরদজী'। শেষোক্ত শ্রেণীর কাজ অর্থাৎ এখানকার অন্যান্য সূচী কর্ম অপেক্ষা জরদজী বা জড়াইয়ের কাজ ইউরোপে যথেষ্ট পরিমাণে সমাদৃত। শাল, গলাবন্ধ প্রভৃতি বস্ত্র কলকাতা থেকে আমদানী করা হয় এবং প্রধানতঃ বিলেতে পাঠাবার জন্যে এখানে বুঁটিতোলা ইত্যাদি নানা কারুকার্য করার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এই বছর প্রায় এক হাজার কাপড়ে বুটি তোলা হয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এর মধ্যে কয়েক খানা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্যে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু সূচী শিল্পের প্রধান শাখাটিই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাজের সংস্থান করে দেয়; এতে মুগা ও তসর সিল্কের সুতায় বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের গায়ে ফুল বা বুটি তোলা হয়। প্রধানতঃ বিলেতী সুতায় তৈরী এসব বস্ত্রের নাম কাসিদা। বুটি তোলার আগে লাল রঙ দিয়ে কাপড়ের উপর নির্দিষ্ট নক্শার নমুনা নিয়ে ছাপমারা হয়। এ ধরনের কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে বলা হয় 'চীপিগর'। এদের থেকে ওই সকল ছাপমারা বস্ত্রাদি ওস্তাগার ও ওস্তাগারনীগণ সংগ্রহ করে সূচী শিল্পীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এরা ব্যবসায়ীদের নিকট হতে টাকা ও সিল্ক সুতা নিয়ে শিল্পজীবিদেরকে অগ্রিম দাদনও দিয়ে থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমান রমণীরাই কাসিদার কারুকার্য ইত্যাদি করে। এছাড়া, ধোপা সম্প্রদায়ের স্ত্রী লোকেরাও তাদের সাধারণ গৃহস্থালী কাজের বাইরে অবসর সময়ে নিজেদের ও পরিবারের জন্যে এ কাজ করে কিছু বাড়্তি আয়ের ব্যবস্থা করে। সূচী শিল্পের কাজ সর্বশ্রেণী ও সর্ব অবস্থার মুসলমান রমণীদের মধ্যে খুব প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়। বর্তমান সময় অপেক্ষা পূর্ব কালে যখন কাসিদার চাহিদা অনেক বেশী ছিল

তখন এখানকার প্রথম শ্রেণীর পরিবারভুক্ত মেয়েরাও তাদের অবসর সময়ে বুটি তোলার কাজে নিয়োজিত থাকতেন। আমার বিশ্বাস বর্তমান সময়েও এমন কি তুরস্কের সুলতানের হারেমসহ বিশিষ্ট মর্যাদাসম্পন্না মহিলাগণ পর্যন্ত তাদের নিজস্ব হাতে বুটি তোলা বস্ত্রাদি কনষ্টান্টিনোপলের বিরিস্তিন বা বাজারে পাঠাতে সংকোচ বোধ করেন না। ঢাকায় প্রায় ২০,০০০ খণ্ড বুটি তোলা মসলিন কাসিদা তৈরী হয়, এবং পারশ্য, মিশর ও তুরস্কে পাঠানো হয়ে থাকে। সে সব স্থানে এ সকল বস্ত্র প্রধানতঃ শিরস্ত্রানরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়েক বছর পূর্বে মোহাম্মদ আলী পাশা তাঁর দেশ মিশরে এই শিল্পদ্রব্যের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু পরিমাণ তসর সিল্ক আমদানী করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরীক্ষামূলক কার্য ব্যর্থ হওয়ার অল্প কালের মধ্যে এ সকল দ্রব্য ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। অতপর উহা কলকাতার বাজারে বিক্রয় করে দেয়া হয়।

শুভ্রকরণ বা ধৌতকরণ

মসলিন বস্ত্রাদির ধৌতকরণ কার্য জেলার উত্তরাংশেই সীমাবদ্ধ; সেখানকার ব্রহ্মপুত্রের শাখাগুলোর স্বচ্ছ নির্মল পানি একাজের বিশেষ উপযোগী। আবুল ফজল সোনারগাঁও পরগণার একটি বিখ্যাত জলাশয়ের উল্লেখ করেন; এর পানিতে ধৌত মসলিন অদ্ভুত রকম সাদা হয়ে থাকে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বর্তমান কালেও এ অংশের কাঁকর মিশ্রিত, ও কর্দমাক্ত মাটিতে খনন করা সকল কূপের পানিতেই এ একই রকম বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে বলে জানা যায়। এখানে অবলম্বিত বস্ত্র-ধৌতকরণ পদ্ধতি হলো সাবান ও পানির একটি পাত্রে বস্ত্রাদি উত্তমরূপে চুবিয়ে নিয়ে সেগুলো নিংড়ে নেওয়া, অতপর তা মসৃণ ঘাসের উপর মেলে দেওয়া। রৌদ্রে ফেলে শুকানোর পর জলাশয় থেকে আনা উত্তম পানিতে পূর্ণ একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। তারপর শুরু হয় কাপড় সিদ্ধ করার কাজ। একাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এরপর একরাত ফুটানো পানির পাত্রেই কাপড়গুলো ফেলে রাখা হয় এবং পরের দিন এগুলো ধোপার পাটে বা তক্তার উপর আছড়ে নিয়ে রোদে শুকাতে দেয়া হয়। পর্যায়ক্রমে সিদ্ধ করা ও ধৌত করার এই পদ্ধতি চার পাঁচ বার চলতে থাকে এবং শেষ বারের সময় এতে লেবুর রস-মিশ্রিত পানি দেয়া হয়ে থাকে। উক্ত দ্রব্য এখানকার মসলিন বস্ত্র ধৌত করার কাজে সর্বদা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। উহা একই উদ্দেশ্যে রোচে

ব্যবহৃত হতো বলে তাভানিয়ার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, উক্তস্থানে লেবু গাছের বিরাট বিরাট বাগান থাকায় বাংলার সুতী বস্ত্রাদি ধৌত করার জন্য সেখানে পাঠানো হতো। আবে রায়নাল উল্লেখ করেন যে, ভারতের সুতী বস্ত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলো যেখানে প্রস্তুত হয় সেস্থান ব্যতিরেকে অন্যত্র কোথাও তা' কখনও উত্তমরূপে ধৌত করা যায় না। মসলিন কাপড় শুভ্র করে নেওয়ার পর এসব বস্ত্রাদি সাধারণভাবে ধৌত করা, আছড়ানো ও ভাঁজ করার প্রাক্কালে সুতা এলোমেলো হয়ে গেলে, তা ঠিক করার জন্যে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রথমেই নাগফনির পাঁজরার হাড়ে তৈরী সূক্ষ্ম ব্রাশ দিয়ে আঁচড়ে নেয়ার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এটি একটি স্বতন্ত্র ব্যবসা, এবং "নদিয়া" নামক এক শ্রেণীর মুসলমান একাজ করে থাকে। মসৃণ ও বড় ধরনের শঙ্খ দ্বারা উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রাদি ঘষে দেয়া হয়, এবং মোটা ধরনের বস্ত্রাদি ঘষার জন্য কাঠের ছোট হাতুড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর কারিগররা সম্পাদন করে। বস্ত্রাদি ভাঁজ করার ও গাঁট বাঁধার কাজগুলো নদিয়া সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য কর্ম

এই শিল্পকর্মে নিয়োজিত ঢাকার কর্মকারগণ ফিলিগ্রী বা তারের কাজে বেশ পারদর্শী। তারা বলয়, গলার হার, ইয়ারিং এবং আতরদান ও গোলাপপাশ নিখুঁতভাবে তৈরী করে থাকে। এসব জিনিসপত্র দেশের বিভিন্ন অংশে রপ্তানী হয়। শহরে এ কাজে তিন শতাধিক কারিগর নিয়োজিত আছে। এছাড়া রয়েছে এক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোকজন (সংখ্যায় ৬০ জনেরও বেশী) যারা এ সকল কারখানা থেকে ধুলা বা ঝাঁট-দেয়া জঞ্জাল, পোড়া কয়লার গুঁড়ো ইত্যাদি পূরক পদার্থ লাভের জন্য ক্রয় করে নেয়, এবং তা' ধৌত করে উহা সংগ্রহ করে।

শঙ্খ শিল্প

শহরে প্রায় ৫০০ জন শঙ্খ কারিগর আছে। এরা এই শিল্প কর্মের তিনটি স্বতন্ত্র শাখায় যেমন, দাগরাজিকরণ, করাতে কেটে এগুলো মণ্ডলাকৃতিকরণ, এবং ঘষে মেজে মসৃণ ও চিক্কন করা, বক্রকরা এবং বিভিন্ন টুকরা জোড়া লাগানো ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত। কলকাতা থেকে আমদানীকৃত চাঙ্ক

শঙ্খের বার্ষিক গড়পড়তা পরিমাণ ৩,০০,০০০। শহরে বাৎসরিক বিরাট বিরাট সাময়িক মেলাসমূহে বিপুল পরিমাণ কুঁদান ও রঙীন শঙ্খের অলংকারাদি বিক্রয় হয়ে থাকে।

অন্যান্য শিল্প

এই শহরে ও সমগ্র জেলায় প্রচলিত অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্পকর্ম হচ্ছে নৌ-শিল্প, তাম্র ও পিতলের জিনিসপত্র নির্মাণ এবং সাবান ও কাগজ শিল্প ইত্যাদি।

১৮৩৮ সালে লোক-গণনায় নিরূপিত, শহরের অধিবাসীদের পেশা, ব্যবসায় ও কাজের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

আইনজীবিগণ।
রুটি প্রস্তুত কারক।
নাপিত।
ঝাঁবরদার বা বিয়ে-সাদিতে পতাকা-বাহক ইত্যাদি।
বাদলাওয়ালা বা রূপোর সুতা প্রস্তুতকারক।
ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, যারা জজমানী অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করে।
ফড়িয়া।
কসাই।
বাঈজী বা নর্তকী-রমণী।
বৈরাগী।
কাঁসারি।
খাঁচা-নির্মাণকারী।
তাস-পাশা প্রস্তুতকারক।
চিকন্-দাজ, বা বুটিতোলা মসলিন বস্ত্রের সীবন-শিল্পী।
চীপিগর, বা সূচীকর্মের জন্য

ভিস্তিসাজ বা ভিস্তি
হুকা প্রস্তুতকারক।
ঢুলী ও পালকি বাহক।
ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়।
ছুতার মিস্ত্রী।
বোঝাওয়ালা বা মুড়ি-মুড়কি বিক্রেতা।
কামার।
পুস্তক বাঁধাইকারী।
ইত্‌মামদার, বা খাজনা আদায়কারী।
জেলে।
মালী।
ঘাটমাঝি।
গ্লাস-ব্লোয়ার।
স্বর্ণকার।
গোরখন্দ বা কবর খননকারী।
গরু দাগানিয়া বা যারা উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে গবাদিপশুর চিকিৎসা করে।
ঘাস-কাটার লোক।

(মসলিনের) ছাপামারার লোকজন।
চেরা-কষ, বা তাম্র-নির্মিত বাসন-কোসন ইত্যাদির খোদাইকারী।
ময়রা বা মিষ্টান্ন বিক্রেতা।
কল্লিওয়ালা বা পানপাত্রওয়ালা।
সুতা-পরিষ্কারকারক।
রাখাল।
উত্তেজক মাদক দ্রব্যের ভাটিখানার মালিক ও বিক্রেতা।
ডোম, বা মৃতদেহ বহনকারী।
দোমনী বা মুসলমান মহিলা-বাদ্যকর।
ঢাকী বা ঢুলী।
দস্তরবন্ধ বা পাগড়ী নির্মাতা।
দস্তফরাশ বা পুরনো বস্ত্র-বিক্রেতা।
ইংরেজীর দেশীয় লিখক।
খরানী মোল্লা বা যে সমস্ত লোক সরকারী অফিস সমূহে শপথনামা পাঠ করায়।
কের্দানী, বা কোমরে বাঁধবার মোটা বস্ত্রের প্রস্তুতকারক।
কালি প্রস্তুতকারক।
দড়ি ও টোনসুতা প্রস্তুতকারক।
গালা করার মোম প্রস্তুতকারক।
দরজা জানালার জন্যে পর্দা (চিক) প্রস্তুতকারক।
গম-পেষক বা গম ভাঙ্গনী।
গাইনদার বা নৌকা মেরামতকারী।
ছাতা প্রস্তুতকারক।
হেকিম ও কবিরাজ, বা মুসলমান ও হিন্দু চিকিৎসক।
হাত-কুটি, বা ইট-গুঁড়াকারী।
হাউশীগর, বা আতশবাজি প্রস্তুতকারী।
শুকর-রক্ষক।
হুক্কা বা পুঁতি দানা প্রস্তুতকারী।
জহুরী বা মূল্যবান পাথর বিক্রেতা।
প্রতিমা-নির্মাণকারী।
ইস্তিরিওয়ালা, বা যারা কাপড় চোপড় ইস্ত্রি করে।
কাঁসারি বা তামা কাঁসার বাসন কোসন ইত্যাদি নির্মাণকারী।
খুন্দিগর, বা শিঙ্গা ও গজদন্তের কারু শিল্পী।
খোঁড়াতি, বা কুন্দকার।
গিল্‌টিকারী।
কলু বা তেলী।
কুটিয়াল, বা খাদ্যশস্য পরিষ্কারকারক।
মালাকার বা কৃত্রিম পুষ্প প্রস্তুতকারক।
কম্বল-প্রস্তুতকারক।
তুঁতে প্রস্তুতকারক।
মোমবাতি প্রস্তুতকারক।
বেতের চেয়ার প্রস্তুতকারক।
ঢোলক বা ঢোল প্রস্তুতকারক।
পৌতা বা বালা ও অলংকারাদির জন্য রেশমী দড়ি প্রস্তুতকারক।
পাটনী বা খেয়ার মাঝি।
অবসর প্রাপ্ত লোকজন।
পোদ্দার বা টাকা পয়সা বদলকারী।

বেহালা প্রস্তুতকারক।
ঘটক।
মহাজন, ব্যবসায়ী ও গোলদারসহ বণিক সম্প্রদায়।
মর্শিয়া গায়ক বা হুসেনী দালানে শোকগীতির গায়ক।
ধাত্রী।
মোহরার বা লেখক।
মোল্লা।
মুদী-দোকানী।
মুরগীওয়ালা।
মুরাকষ বা কাগজ ও কাপড় রঙকারী।
মোড়াদার বা ফড়িয়া, যারা খাদ্যশস্য বিক্রয় করে।
মুগজি বা যারা কাপড়ের আঁচল বা পাড় সেলাই করে।
মনিহারী, বা চকবাজারের নানাবিধ দ্রব্যের দোকানদার।
বাদ্যকর।
নেউলবন্ধ বা যারা ঘোড়ার পায়ে নল লাগায়।
নীলগর বা নীল কাপড়ের রঙকারক।
নখা বা চিত্র ও পেইণ্ট বিক্রেতা।
নদিয়া বা যারা মসলিনের এলো-মেলো সুতো ঠিক করে দেয়।
নৈচাবন্ধ বা সর্পাকৃতি হুক্কা প্রস্তুতকারী।
ওস্তাগর, ওস্তাগারনী যারা কাসিদা মসলিনের উপর সুচীকর্মের তত্ত্বাবধান করে।

কুম্ভকার।
পতিতা।
পণ্ডিত।
পসারী বা মসলা ও ওষুধবিক্রেতা।
পরতাল্লা বা চাপরাস অথবা তকমার জন্য পট্টি প্রস্তুতকারক।
রাজ বা রাজ মিস্ত্রী।
রঙওয়ালা বা টিন ও সীসার উপর কারুকার্যকারক।
রেজা বা ছাদ-পিটানী।
রিফুগর বা ছেঁড়া অংশ সিলাইকারী।
রঙরাজ বা বস্ত্র-রঞ্জনকারী।
রঙসাজ বা বাড়িঘর, নৌকা ও পালকি ইত্যাদি রঙকারক।
শাঁখারী সম্প্রদায়।
সেঙ্গার বা ছুরি কাঁচি, তরবারী ইত্যাদি নির্মাতা বা বিক্রেতাগণ।
করাতী।
শিকলীগর বা ইস্পাত পালিশকারক।
আতর ও সুগন্ধি তৈল বিক্রেতা।
বাঁশ ইত্যাদি বিক্রেতা।
টুপী ইত্যাদি বিক্রেতা।
কাঠকয়লা ও হুক্কার গোল বিক্রেতা।
কাষ্ঠবিক্রেতা।
ময়দা বা ছাতু ইত্যাদি বিক্রেতা।
ফলমূল ইত্যাদি বিক্রেতা।
লেবু বিক্রেতা।
পানের চুন বিক্রেতা।
ঠাকুর পূজা বা হিন্দু মন্দিরে পূজা পরিচালনাকারী ব্রাহ্মণ।

পান্নীওয়ালা বা স্বর্ণ সংগ্রহকারী।
পাটীয়াল বা বিছানা ও মাদুর বিক্রেতা।
জুতো বিক্রেতা।
খড়কুটা বিক্রেতা।
তাড়ি বা দেশীয় মদ্য বিক্রেতা।
তামাক বিক্রেতা।
তরি-তরকারী বিক্রেতা।
বরকন্দাজ ও পিয়নসহ ভৃত্য সম্প্রদায়।
শালগর বা শাল ধোয়া ও রিফু করার লোক।
শিকারী বা জন্তু মারার লোক।
জুতো-মেরামতকারী।
সাবান প্রস্তুতকারক।
চশমা প্রস্তুতকারক।
সাঁধুয়া বা স্বর্ণকারের দোকানের ঝাঁট দেয়া গুঁড়ো কয়লা, জঞ্জাল ইত্যাদি থেকে স্বর্ণরেণু বা পূরক পদার্থ সংগ্রকারী।
সানতরাশ, বা পাথর কাটার লোক।
ঝাড়ুদার।
দরজি সম্প্রদায়।
তালুকদার।
তাম্বুলী বা পানবিক্রেতা।
তারকষ বা সুক্ষ্ম তার দ্বারা পার্থক্য নিরূপনকারী।
কাঠের বেপারী বা কারবারী।
শিঙ্গাওয়ালা বা রক্ত চোষণকারী।
সড়ক কুলি।
সমাজী বা নৃত্যে যোগদানকারী বাদ্যকর।
মিসি বা দাঁতের মাজন বিক্রেতা।
মদ বা আফিম দ্রব্য বিক্রেতা।
কাগজ ইত্যাদি বিক্রেতা।
বাক্স পেট্‌রা ইত্যাদি বিক্রেতা।
সুবলওয়ালা বা বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুতকারক।
সাপুড়িয়া বা সাপ ধরার লোক।
উকিল সম্প্রদায়।
ধোপা।
তাঁতি।
খাদ্যশস্য ইত্যাদির ওজনদার।
চামড়ার কারবারী।
জমিদার।
জরদজী বা রেশমী, সোনা ও রূপার সুতায় চিকন্ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গ।

রপ্তানী দ্রব্য

প্রধান প্রধান রপ্তানীদ্রব্য হলো নানাবিধ বস্ত্র, নীল, সুপারি, জাফরান, পাট, সাবান, চামড়া, শঙ্খবালা, অলংকারাদি, তাম্র-নির্মিত বাসন-কোসন, পনীর ও সংরক্ষিত ফলমূল ইত্যাদি। প্রথমোক্তটির মধ্যে নানারকমের ফুল বা বুটিতোলা মসলিন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করা হয় এবং

কাসিদা বা বিভিন্ন রঙের কারুকার্য-খচিত বুটীতোলা মসলিন একচেটিয়া ভাবে বস্‌রা ও জেদ্দায় রপ্তানী করা হয়ে থাকে; পুনরায় জেদ্দা থেকে ঐ সব বস্ত্রাদি মিশর ও তুরস্কে রপ্তানী করা হয়। বিগত চার বছরে এর রপ্তানীর মোট পরিমাণ ছিল অনধিক ৯½ লক্ষ টাকা। নীল ও জাফরানী রঙ কলকাতায় প্রেরিত হয় এবং সুপারি পাঠানো হয়ে থাকে রংপুর, আসাম, আরাকান ও পেগু প্রভৃতি দেশে।

চামড়া

বেশ কিছু পরিমাণ চামড়া কলকাতায় এবং উদ্বিড়ালের চামড়া চীনদেশে রপ্তানী করা হয়। দেশের বিভিন্ন অংশে, মৌরিটিয়াসে এবং পূর্বদিকস্থ দ্বীপসমূহে সাবান এবং পনীর ও সংরক্ষিত ফলমূল নিম্নাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের বিভিন্ন স্থানে এবং জিদ্দা ও বসরা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী করা হয়ে থাকে।

আমদানী দ্রব্য

আমদানী দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে আসাম ও ময়মনসিংহ থেকে সরিষা ও তৈলবীজ: ফরিদপুর ও গৌরিপুর থেকে চিনি; সিলেট থেকে চুনাপাথর; আসাম, মোরাঙ্গ, রংপুর ও অন্যান্যস্থান থেকে কাঠ; পূর্ণিয়া ও রংপুর থেকে তামাক; আরাকান, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ থেকে তুলা; এবং আরাকান ও পেগু থেকে খয়ের, গজদন্ত, গোলমরিচ, সেঁকোবিষ, মোম, স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া আসাম ও সিলেট থেকে মুগা বা তসরসিল্ক; চট্টগ্রাম ও বাকেরগঞ্জ থেকে নারকেল ও বাকাম কাঠ; সিলেট থেকে ঢাল ও আগর কাঠ, বা সুগন্ধি আলোঙ্গ কাঠ; পাটনা থেকে গম, খাদ্যশস্য, জুতো ও কলকাতা থেকে চাঙ্ক-শঙ্খ, বিলেতী সুতো এবং লংক্লথ, নানা রঙের সুতী ছিট-কাপড়, মিহি সাদা সুতীবস্ত্র, শাল, পশমীবস্ত্র, মাটি ও কাঁচনির্মিত বাসন-কোসন, সুঁই, দেশীয় ঔষধপত্র, মশলা ও ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি বহু দ্রব্য আমদানী করা হয়ে থাকে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ চতুষ্পার্শ্বস্থ জেলা-সমূহের উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্য স্থানও বটে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরা থেকে খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ, এবং চট্টগ্রাম ও ভুলুয়া থেকে লবণ ইত্যাদি দেশের বিভিন্নস্থানে চালান দেয়ার জন্য নারায়ণগঞ্জে আমদানী করা হয়ে থাকে।

ওজন

এক সেরের ওজন ৮০½ সিক্কা। একমাত্র এ ওজনেই সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খুচরা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সামান্য কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া, যেমন পিতলের দ্রব্যাদি সের প্রতি ৭৮ সিক্কায় এবং চুন ৯০ সিক্কায় বিক্রয় হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্য মণিমুক্তা, মশলাদ্রব্যাদি, ঔষুধপত্র, সুতা ও মসলিনবস্ত্র ইত্যাদির ওজনের ক্ষেত্রে তোলার ব্যবহার হয়। এক তোলায় মাশার সংখ্যায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্যের জন্য ১০; ওষুধপত্র ও মশলাদির জন্য ১২ মাশা দু'রত্তি, এবং মণিমুক্তার জন্য ১২½ মাশা। ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ জেলায় এক সেরের ওজন মাত্র ৬০ সিক্কা। খাদ্যশস্য ও তরল বস্তুর পরিমাপ বেত অথবা চাঁচ, কঞ্চি ইত্যাদি নির্মিত ঝুড়ি এবং ফাঁপা বাঁশের চুঙ্গা দ্বারা করা হয়। নির্ধারিত ওজনের সঙ্গে এগুলোর সম্বন্ধ আছে এবং ৮০½ সিক্কা ওজনের সেরের সঙ্গে সবটারই নির্দিষ্ট অনুপাত রয়েছে।

পরিমাপ

আগের দিনে শহরে দু'ধরনের বস্ত্র-পরিমাপন-পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল, যথা, সুলতানীগজ ছিল ৩৬½ ইঞ্চির সমতুল্য, এবং কোম্পানীগজ ছিল দৈর্ঘে ৩৯½ ইঞ্চি। বর্তমানে ইংলিশগজ ব্যবহৃত হয়ে থাকে; এবং এর সঙ্গে কাটনিগজ প্রচলিত আছে, যা' দৈর্ঘে ৩৪¾ ইঞ্চির সমতুল্য। অত্যুৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রাদি ঢাকিনামে প্রচলিত ওজনের দ্বারা বিক্রয় করা হয়ে থাকে। এতে ওজন হ্রাস, কাপড়ের দৈর্ঘ্য এবং ব্যবহৃত সুতার সংখ্যার অনুপাত অনুসারে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। সুতা ওজন করা হয় দানিস-দাড়িপাল্লার মান অনুযায়ী।

বণিক সম্প্রদায়

চার পাঁচজন মুসলমান এবং প্রায় অনুরূপ সংখ্যক খ্রীস্টান ব্যতীত সমস্ত বণিক সম্প্রদায়ই হিন্দু। ঢাকার অধিবাসী ব্যবসায়ীগণ তাদের পণ্যদ্রব্য কলকাতায় রপ্তানী করে; অন্যদিকে যারা পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ সমূহের অধিবাসী এবং এখানে বসতি স্থাপন করেছে, তারা দেশের ঐ অংশের সঙ্গে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে থাকে। এদের অনেকে বাৎসরিক মেলায় যোগদান করে। এসব মেলার পাঁচটিই শহরের কাছাকাছি অবস্থিত। মেলায় যোগদানের পরে এরা তাদের বাদবাকি পণ্যদ্রব্য শহরে বিক্রি করে দেয়। বস্ত্র ব্যবসায়ীরা

আরব্য জাহাজের নাখোদাদের নিকট তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কলকাতায় গমন করে, এবং সাধারণতঃ চারপাঁচ মাস অনুপস্থিত থাকে। যৌথ কারবারী সঙ্ঘ কর্তৃক পরিচালিত বেশ কিছু পরিমাণ ছোটখাট ব্যবসা-বাণিজ্য এখানে চালু আছে। এই সংস্থা প্রায়শঃই কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষ নিয়ে গঠিত, যারা এ পণ্যসম্ভারের মালিক। এছাড়া, নৌকার মালিক ও মাঝি মাল্লারাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকে, যারা পারিশ্রমিকের পরিবর্তে ফটকা বাজারীর আয়ের অংশ লাভ করে। এখানে একজন এজেণ্ট থাকে, যে কলকাতা বীমা অফিসের পক্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়, এবং দুজন স্থানীয় বণিক থাকে, যারা পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলোতে পণ্যদ্রব্যে প্রেরণ নিশ্চিত করে।

দালাল বা শরফ

দালাল এবং শরফ বা পোদ্দারগণ এক সময় শহরের খুবই গণ্যমান্য ও সম্পদশালী লোক ছিল। প্রথমোক্তরা ছিল ফড়িয়া; এরা কোম্পানীর বাণিজ্য বিষয়ক কর্মচারীগণ কর্তৃক তাদের পুঁজি সংগ্রহের জন্য নিয়োজিত হতো এবং পাইকারদের এজেন্সীর মাধ্যমে ব্যবসার খুঁটিনাটি বিষয়াদি নিষ্পত্তি করতো। মুদ্রা বিনিময় ও দেশের বিভিন্ন অংশে অর্থকড়ি প্রেরণের ব্যাপারে বণিক সম্প্রদায় ও জমিদারদের সঙ্গে শেষোক্তদের বিরাট লেনদেন বিদ্যমান ছিল। এই দু'টোশ্রেণী ব্যাপকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলো, এবং এতে নিয়োজিত মূলধনের বড় অংশ এদের আয়ত্বাধীন ছিল। কিন্তু আর্কটমুদ্রা ব্যবস্থা বাতিল এবং সুদের হার শতকরা ১২ ভাগ নির্ধারণ করে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত তারা তাদের মূলধন গুটিয়ে নেয়। বর্তমানে পোদ্দারদের কাজকারবার কলকাতা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, সিলেট ও মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানের উপর হুণ্ডি প্রদান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় সংগৃহীত বিলসমূহের উপর নীলচাষীদেরকে তারা টাকা অগ্রিম প্রদান করে এবং অধিবাসীদেরকে তাদের বাড়ি ঘর ও জমিজমা বন্ধকীর উপর ঋণ দেয়। এছাড়া, মণিমুক্তা, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলংকারাদিও এদের নিকট বন্ধক রাখা হয়। এদের অনেকে কলকাতা থেকে বিলেতী সুতা আমদানী করে এবং তাঁতিদের নিকট খুচরো বিক্রি করে দেয়। কিন্তু শীতের মৌসুমে কলকাতা গমনকারী বণিকরা এ দ্রব্য বিপুল পরিমাণে ক্রয় করে থাকে। এখনকার শিল্পজাতদ্রব্য ও ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত পাইকারদের সংখ্যা প্রচুর।

এরা শহরের বণিকদের জন্য তাদের প্রতিনিধিরূপে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বাজার থেকে দেশী সুতো ক্রয় ও মসলিন বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে থাকে। ব্যবসায়ী অগ্রিম টাকা প্রদান করে এবং পাইকার তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ একটি পরিমাপ, মান ও সুতার নম্বর অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক কাপড়ের গাঁইট সরবরাহ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। অতঃপর পাইক তাঁতিদের মধ্যে টাকা বিতরণ করে দেয় এবং তাদের কাজের অগ্রগতির তত্ত্বাবধান করে। সে তার পরিশ্রমের জন্যে প্রায় শতকরা ২½ ভাগের মত সামান্য কমিশন পেয়ে থাকে। অর্থের বিনিময় ব্যাপক হলে পাইকার কর্তৃক বস্ত্রাদি বণিকের নিকট উপস্থিত করার পর একজন যাকিন্দার (যাচনদার) বা মূল্য নির্ধারণকারী কর্তৃক তা' যাচাই করা হয়। গুণাগুণ অনুসারে বস্ত্রাদি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। প্রতিটি শ্রেণীর মূল্য নির্দিষ্ট করা আছে, এবং যে সমস্ত মোটা বস্ত্রের চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত হওয়ারও যোগ্যতা নেই, সে সব বস্ত্রাদি প্রত্যাখান করা হয় বা পাইকারের হাতের উপর ছুঁড়ে মারা হয়।

ঢাকা ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক

প্রাচীনকালে দেশের এই অঞ্চলের সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্য মাসালিয়া (মসলিপত্তন), তাপরাবন (সিংহল) হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বৈরাগর (বোচ) নামক স্থান দিয়ে চালানো হতো। এ' শেষোক্ত স্থান থেকে উহা লোহিতসাগরের তীরে অবস্থিত আদালি ও মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং সেখান থেকে ভূমধ্য-সাগরীয় সীমান্ত এলাকা জুড়ে ইউরোপীয় বিভিন্ন' প্রাচীন বন্দরগুলোতে উক্ত ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত হয়েছিল। সম্ভবতঃ শস্যদানা, মণিমুক্তা ও বস্ত্রাদি ছিল রপ্তানী দ্রব্য। দু'জন মুসলমান পরিব্রাজক কর্তৃক প্রদত্ত ভারতবর্ষ ও চীনের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীস্টীয় নবম শতকে দেশের এই অংশ থেকে চীনারা সুতীবস্ত্র, গণ্ডারের শিং ইত্যাদি ক্রয় করতো এবং ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে ভার্তোমানসের সময়ে বাংলার এ অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যাদি তুরস্ক, সিরিয়া, আরব, পারস্য, ও ইথোওপিয়া প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হতো। তিনি লিখেছেন যে, বাংলা শহরে "বহু বিদেশী বণিক" ছিলো যারা মূল্যবান পাথর ক্রয় করতো এবং ৫০টি জাহাজে বোঝাই[১] বম্বাসিন ও রেশমীবস্ত্র প্রতি

১ তুলার জন্য ব্যবহৃত ইতালীয় একটি শব্দ—'বম্বাসিন'।

বছর উপরোল্লিখিত দেশ সমূহে পাঠাতো। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে র‍্যালফ্ ফিচ্ ও সোনারগাঁও সম্বন্ধে উল্লেখ করে বলেন যে, "সর্বোৎকৃষ্ট বস্ত্র এখানে প্রস্তুত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে সে সব বস্ত্র ও চাল সমগ্র ভারতবর্ষে ও সিংহল, পেগু, মালাক্কা, সুমাত্রা এবং অন্যান্য বহুদেশে রপ্তানী হয়।" তাভার্নিয়ার ঢাকার খাসা মসলিন, রেশমী ও সুতীবস্ত্র, নকশা-করা কারুকার্যখচিত বস্ত্রাদি প্রভেন্স, ইতালী লাঙ্গুয়েদক ও স্পেন প্রভৃতি দেশে (১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পরিদর্শনের পূর্বে) রপ্তানী হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে জলপথ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে সুরাট বন্দর যখন ইউরোপ ও ভারতের পণ্যদ্রব্যের জন্য প্রকাণ্ড বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হয়, তখন সেই স্থানের সঙ্গে ঢাকা বেশ কিছু পরিমাণ ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতো। এখানকার চাউল রপ্তানী হতো করমণ্ডল উপকূলে এবং বস্ত্রাদি যেত সুরাট বন্দরে। বিনিময়ে চাঙ্ক ও কচ্ছপের শঙ্খ আমদানী করা হতো, কিন্তু বাণিজ্যোদ্বৃত্ত তখন বিপুল পরিমাণে ঢাকার অনুকূলে ছিল। মশলাদ্রব্য সরাসরি আমদানী করা হতো এবং এভাবে বাংলার পূর্বাঞ্চলে আর্কট মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়। আগের দিনে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন অংশেও কাপড় রপ্তানী অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। দিল্লীতে সম্রাটের তোষাখানার জন্য এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তার দরবারের প্রয়োজনে বার্ষিক অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মসলিনের সবটাই একচেটিয়া করে নেয়া হয়েছিল। উৎপাদনকারীগণকে এ ধরনের মসলিন বস্ত্রাদি দেশী ও বিদেশী লোকদের নির্ধারিত মূল্যের ঊর্ধ্বে বিক্রি করতে দেয়া হতো না। রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করার জন্য সেখানে একজন বিশেষ প্রতিনিধি বসবাস করতেন। তিনি বিচারক ও সরকারী রাজকর্মচারীদের থেকে স্বতন্ত্র ছিলেন এবং মসলিন বস্ত্র তৈরীতে নিয়োজিত সমস্ত ফড়িয়া, তাঁতি ও সুচীশিল্পিগণের উপর কর্তৃত্ব করতেন। তাভার্নিয়ারের সময়ে ভুটান, আসাম ও শ্যামদেশে প্রবাল, অম্বর ও কচ্ছপ খোল বা শঙ্খ ইত্যাদি নির্মিত নানাবিধ অলংকার রপ্তানী হতো। মসলিন দ্রব্য, উদ্বিড়ালের চামড়া ও শঙ্খবলয় ইত্যাদি নেপালে প্রেরণ করা হতো

এবং চাউরি, চীনা রেশমী ও তোশবস্ত্র (এক প্রকার গরম কাপড়) ঢাকায় আমদানী করা হতো। পেগু ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের সঙ্গে প্রচুর ব্যবসা বাণিজ্য চলতো। বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং খয়ের আমদানী হতো। এ সব দ্রব্যের বিনিময়ে মসলিন ও রেশমী বস্ত্র, শাল, সুপারি ও নানারকম অলংকার দ্রব্য এখান থেকে যেতো। টাকশাল উচ্ছেদের ফলে স্বর্ণ ও রৌপ্যখণ্ডের আমদানী হ্রাস পেতে থাকে, এবং বর্মী যুদ্ধের সময় থেকে বাণিজ্য বহুল পরিমাণে স্তিমিত হয়ে আসে এবং কার্যতঃ উহা কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়ে যায় বলে প্রতীয়মান হয়। মিঃ হলওয়েল উল্লেখ করেন যে, ১৭৬৫ সালে সাবান্দার শুল্কের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল দু'কোটি টাকা। কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি, এটা ছিল মোট বাণিজ্যের পরিমাণ; কেননা, এতে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এখানকার সায়ার শুল্ক পর্যন্ত কখনও উক্ত অর্থের সমতুল্য হয়নি। ১৭৬১ সালে দেখা যায় যে, ঢাকা কারখানায় কোম্পানীর পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল প্রায় ২২ লক্ষ টাকা এবং সর্বপ্রকার খরচপত্র ও বেতনসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৭,৬৬৭ টাকা। ১৭৮৭ সালে কলেক্টর মিঃ ডে জেলার ব্যবসা বাণিজ্যের মূল্যায়ন করেন এক কোটি টাকা বা ১½ মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং, এবং ঐ অর্থের মধ্য থেকে বার্ষিক ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা ইউরোপে রপ্তানীর জন্যে কাপড় ক্রয়ে ব্যয়িত হতো। ইউরোপীয় বাজারের জন্যে ১৮০৭ সালে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ছিল ৮, ৬১, ৮১৮ টাকা ৮ আনা ৫ পাই। ১৮১০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৫, ৫৬, ৯৯৬ টাকায়। কিন্তু ১৮১৩ সালে এর মূল্যমান ৩,৩৮,১১৪ টাকা ১২ আনা ৮ পাই-এর উর্ধে ওঠে নি। অতএব, ১৮১৭ সালে বাণিজ্যিক প্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয় এবং উক্ত সময় থেকে কার্যতঃ ইউরোপে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ হয়ে যায় বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে ঢাকার তাঁতে দেশের সাধারণ পর্যায়ের বস্ত্রাদি ছাড়াও, প্রধানতঃ বুটি তোলা ও কাসিদা মসলিন প্রস্তুত করা হয়ে থাকে; কিন্তু প্রস্তুত দ্রব্যাদির পরিমাণ পূর্বের তুলনায় খুবই সামান্য।

১৮১৭ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত ঢাকার শুল্ক বিভাগের মাধ্যমে রপ্তানী দ্রব্যরূপে প্রেরিত সূতীবস্ত্রের মূল্যের একটি তুলনামূলক সমীক্ষা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

বছর	টাকা	আনা	পাই	বছর	টাকা	আনা	পাই
১৮১৭-১৮	১৫,২৪,৯৭৪	—১	—৮	১৮২৯-৩০	৫,০৪,৮৮২	— ১২	—০
১৮২১-২২	১২,১৬,২৫২	—০	—৫	১৮৩১-৩২	৩,৬০,৭৪৭	— ৫	—০
১৮২৫-২৬	৬,২৯,১৮৩	—১১	—৩	১৮৩৪-৩৫	৩,৮৭,১২২	— ০	—০

সপ্তম অধ্যায়

[মুঘল শাসনামলে রাজস্ব—মহামান্য কোম্পানীর প্রশাসনের প্রারম্ভকাল থেকে রাজস্ব—১৭৬৫ সাল থেকে বেসামরিক প্রশাসন এবং স্থানীয় ঘটনাবলী।]

মুঘল শাসনামলে রাজস্ব

মুঘল সম্রাটদের আমলে ধার্য করসমূহ মহল ও সায়ার[১] নামে দু'টো শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ১৫৮৮ সালে রাজা তোডরমল কর্তৃক বিভক্ত বাঙলার ১৯টি সরকারে পূর্বোক্ত কর বা ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হতো। অন্যদিকে, আমাদের বর্তমান করের অনুরূপ শুল্ক বা কর নিয়ে গঠিত সায়ার হাট, গঞ্জ ও বাজার সমূহ থেকে আদায় করা হতো। ঢাকার সঙ্গে সংযুক্ত সরকার ছিল বাজুহা ও সোনারগাঁও। বাজুহা ঢাকা শহরসহ বরবকাবাদ থেকে সিলেট অভিমুখে পূর্ব দিকে প্রসারিত ছিল। এর আওতাভুক্ত পরগণা ছিল ৩২টি, এবং নির্ধারিত খাজনা ছিল ৯,৪৭,৯২১ টাকা।

সোনারগাঁয়ের বেশীর ভাগ অঞ্চল মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে বিস্তমান ছিল, এবং বর্তমানে গঠিত ত্রিপুরা জেলার বেশকিছু পরিমাণ অংশ ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। এর পরগণার সংখ্যা ছিল ৫২টি; এবং রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৫৮,২৮৩ টাকা। বাজুহা ও সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত পরগণাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নানাবিধ ভূমি-মঞ্জুরী ও খণ্ড-খণ্ড জমি নিয়ে গঠিত "তক্‌সিম জমার" ক্ষেত্রে তোডরমল কর্তৃক স্থিরীকৃত তাদের নির্ধারিত জমা বা খাজনা ছিল। এটা সম্ভবতঃ মৌজাওয়ারী ভাবে নির্ধারিত অর্থাৎ, প্রতিটি গ্রামের খাজনার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল তা' সে গ্রাম জমিদারগণের 'নিজ' তালুকগুলোর অন্তর্ভুক্তই হোক, বা জিম্মাদার কিম্বা স্বতন্ত্র তালুকদারগণের আওতাভুক্তই হোক। শাহ্ মাহমুদের রাজত্বের সময়ে এবং ১৭২২ সালে জাফর খানের সুবাদারীত্বের আমলে তোডরমলের মূল-সরকার সমূহের সঙ্গে ১৬৫৮ সালে সুলতান সুজা কর্তৃক পরবর্তী সময়ে পরগণাগুলো একত্রে ৩টি চাক্‌লা বা সামরিক ও

১ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিষয়াদির উপর পঞ্চম রিপোর্ট দ্রষ্টব্য।

১০—

বেসামরিক অধিক্ষেত্রে (অংশে) পরিণত করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর (বা ঢাকা) চাক্‌লার অন্তর্ভুক্ত ছিল সোনারগাঁও ও বাক্‌লা (বাকেরগঞ্জ) সরকার, বাজুহা ও ফাত্তেহাবাদের (নোয়াখালি) অংশ বিশেষ, এবং উদয়পুর (ত্রিপুরা) সরকার ও মোরাদকান্দি (সুন্দরবন)। এই বিরাট বিস্তীর্ণ এলাকা আবার কিছু সংখ্যক জমিদারীতে উপবিভক্ত করে সর্বশ্রেষ্ঠ জমিদারী জালালপুরের অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়; এতে ২৩৬টি পরগণা ছিল, এবং খাজনা ধার্য ছিল ১৯,২৮,২৯৪ টাকা। সুজাখান প্রদেশের সরকার পরিচালনায় জাফর খানের স্থলাভিষিক্ত হন এবং উক্ত ব্যবস্থাপনার দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বণ্টন করা হয়েছে বিবেচনা করে ১৭২৮ সালে তিনি সংশোধিত খাজনা তালিকা বা "জমা তামারি তৌজি" গঠন করেন-যার ফলে বাঙলা প্রদেশ ২৫টি ইহ্‌তিমাম বা জমিদারিত্বে বিভক্ত হয়।

ঘোড়াঘাট ও যশোহর পার্শ্ববর্তী বা সংলগ্ন চাকলা সমূহের অন্তর্গত এলাকার অংশসহ, চাকলা জাহাঙ্গীরনগর সমুদয় খালসা বা রাজকীয় সম্পত্তি ইহ্‌তিমাম জালালপুরের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল; ফলে উহা একজন নায়েবে-নাজিমের শাসনাধীনে, একটি বিশাল ঢাকা প্রদেশরূপে গঠিত হয়। রেনেল সাহেবের জরিপ অনুসারে এর আয়তন ছিল ১৫,৩৯৭ বর্গমাইল।

জায়গীর প্রদান

দেশের সামরিক ও বেসামরিক সংস্থাপনসমূহের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ঢাকা জেলায় প্রদত্ত জায়গীরগুলোর পরিমাণ ছিল সমগ্র ভূমির এক-তৃতীয়াংশ। প্রধান প্রধান জায়গীরের বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল।

(১) মগদের আক্রমণের বিরুদ্ধে উপকুলভাগ রক্ষার্থে সশস্ত্র রণতরী সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমলে নওয়ারাহ্‌। আকবর কর্তৃক নৌবহর সৃষ্টির প্রাক্কালে এর রণতরীর সংখ্যা ছিল তিন হাজারেরও অধিক; কিন্তু পরবর্তীকালে উহার সংখ্যা ৭৬৮টিতে হ্রাস পায়। এছাড়া, জমিদারগণ কর্তৃক তারা এই জায়গীর নামের আওতায় যে সমস্ত জমি ভোগদখল করতেন, তার পরিবর্তে তারা বেশ কিছু সংখ্যক রণতরী ও লোকলস্কর সরবরাহ করতেন। নওয়ারাহ জায়গীর ছিল জেলার প্রধান সমর্পিত সম্পত্তি, এবং নিয়াবাতের (Neabut) উত্তম ভূ-খণ্ডগুলো এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলো

আবার বেশ কিছু সংখ্যক ছোট ছোট তালুকে উপবিভক্ত ছিল, যা বেতনের পরিবর্তে নৌ-বহরের নৌ-সেনা ও কারিগর বা কৌশলীদের প্রদান করা হতো।

(২) আমলে আহ্শাম। সাগর-উপকুলের দুর্গ-সমূহ রক্ষার্থে গোলন্দাজ সৈন্যসহ ২,৮২০ জন সৈনিকের ভরণপোষণের জন্য এই ভূমি-মঞ্জুরী কাজে লাগানো হতো।

(৩) সরকার আলী। পারিবারিক ব্যয়ভারসহ-নবাবের অন্যান্য খরচপত্র ইত্যাদি নির্বাহ করার জন্য এই মঞ্জুরী প্রদত্ত হয়; এই জায়গীরের অর্ধেক ভূমি ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

(৪) সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতির জায়গীর প্রদত্ত হয়েছিল তার নিজস্ব ভরণপোষণ এবং ২,৬৫০ জনের একটি অশ্বারোহী সৈন্যদলের রক্ষণাবেক্ষণার্থে। এই জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তি প্রধানতঃ ঢাকা ও সিলেটে অবস্থিত ছিল।

(৫) ফৌজদোরন। ঢাকা শহর-নায়েবের প্রধান কর্মস্থল হওয়ার পর থেকে এই মঞ্জুরী প্রদান করা হয়, এবং প্রথমে উহা মুর্শিদকুলি খানের সামরিক ব্যয়ভার বহনের জন্য দেয়া হয়েছিল, যিনি প্রথম এই নিয়োগ লাভ করেছিলেন। উক্ত খরচপত্রের পরিমাণ ছিল ১,০০,১৪৫ টাকা।

ভূমি রাজস্বের সঙ্গে সংযুক্ত করকে আবওয়াব বলা হতো

আঞ্চলিক রাজস্বের সঙ্গে সংযুক্ত আবওয়াব (Aboabs) নামে অভিহিত কর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, যা' নাজিমের পক্ষ থেকে সমগ্রদেশ ব্যাপী আদায় করা হতো। এসব কর সুলতান সুজার আমলে আরোপিত হয়; কিন্তু জাফর খানের শাসনামলেই প্রথম উহা নির্ধারিত করে পরিণত হয়। অর্থ প্রদানের হার বৃদ্ধি করা হয়। ঢাকা প্রদেশে সংগৃহীত আবওয়াবসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

খাসনবীসি

(১) খাসনবীস বা ভূ-সম্পত্তির ইজারা পুনরারম্ভ বা নবায়নের প্রাক্কালে সরকারী রাজস্ব বিভাগ বা খালসা-হিসাবরক্ষকগণ কর্তৃক জমিদারদের নিকট থেকে আদায়কৃত এক প্রকার ফি বা খরচ (দেয়ক)।

(২) নজর বা দর্শনীর খরচপত্র সংগ্রহ করার নিমিত্ত সুজাখানের নজরানা মুকারী, যা' ঈদ এবং অন্যান্য বড় বড় মুসলমান পর্ব উপলক্ষে প্রাদেশিক প্রতিনিধি দ্বারা সম্রাটের দরবারে প্রেরিত হতো।

(৩) জরমাথুত (Zermathoat) ছিল জমা-তামারী বা মূল আঞ্চলিক খাজনার উপর দেয় শতকরা ১½ টাকা এবং এটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আবওয়াব নিয়ে গঠিত, অর্থাৎ জমিদারদের থেকে তাদের বার্ষিক হিসাব নিষ্পত্তিতে নজরপূণ্যা বা উপহারাদি। বখেলাত হ'লো খেলাত বা পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যয় নির্বাহ করতে খরচপত্রাদি, যা এই সময়ে জমিদারকে উপহার প্রদান করা হতো। রুসুম নেজারৎ বা দশ লক্ষ টাকা প্রতি দশ আনা কমিশন, যা খালসা বা সরকারী রাজস্ব বিভাগের প্রধান পিয়ন বা জমাদার কর্তৃক আদায় করা হতো।

(৪) ফৌজদারী আবওয়াব। এটা জমির উপর স্থায়ী কর, এটা নায়েব কর্তৃক তোলা হতো এবং অফিসের বক্শিশ হিসেবে তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হতো।

(৫) মারাঠা চৌথ। মারাঠাগণ কর্তৃক এই সময়ে বলপূর্বক আদায়কৃত রাজস্বের জোগান দেওয়ার জন্য রাজকীয় ভূমির উপর আলীবর্দি খান কর্তৃক আরোপিত কর। অন্যান্য 'আবওয়াব' সমূহ কাসিম খান ও মোহাম্মদ রেজা খান কর্তৃক আদায় করা হতো; এরা জাফর আলী খানের শাসনামলে ঢাকার দেওয়ান ছিলেন। প্রধান কর ছিল ক্রীতদাস সিক্কা, এবং আবওয়াব খামসী। পূর্বোক্তটি সরকারী রাজস্ব বিভাগে প্রদত্ত খালসা জমা বা খাজনার প্রতি টাকার উপর ১½ আনা নিয়ে গঠিত ছিল, এবং পরবর্তীটি ১৭৬৫—৬৬ সালে আদায় করা হয়, এবং উহা মহামান্য কোম্পানীকে দেওয়ানী প্রদানের ফলে, তৎপরিবর্তে দিল্লীর সম্রাটকে উপহার দানের অজুহাতে কয়েকটি ছোটখাট কর নিয়ে গঠিত ছিল; যেমন—পোষাক-পরিচ্ছদ বা খেলাতের জন্য, মুর্শিদাবাদে নদীর তীরভূমি বাঁধানোর নিমিত্ত কর, কাচারীর ভৃত্যদের জন্য মফঃস্বল থেকে আনীত অর্থ সম্পদের উপর কমিশন এবং পুরানো টাকা পয়সা ভাঙ্গানোর উপর বাট্টা বা কর।

উপরিউক্ত রাজস্বের উৎসগুলো ছাড়াও অতিরিক্ত বেশ কিছু পরিমাণ অর্থ কৈফিয়ৎ ও তাউফির নামে বিভিন্ন সময়ে আদায় করা হতো। এ শব্দ দুটোর দ্বারা বোঝানো হতো কর পুনরারোপ থেকে অর্জিত অর্থ লাভ যা প্রাদেশিক নায়েব, দেওয়ান ও তাদের অধীনস্থ কর্মচারীগণ কর্তৃক বেআইনী-ভাবে আদায় হতো বলে প্রকাশ পায়। এ ছাড়া আকবরের সময় থেকে রাজকীয় ভূসম্পত্তির উপর যে পরিমাণ কর ধার্যকরা হয়েছিল, সেই অনুপাতে

জায়গীরগুলোর উপর কর বৃদ্ধি করার ফলে তা' থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যেতো তাও তারা গ্রহণ করতো। ঢাকা জেলার প্রধান কৈফিয়ৎ আসতো সায়ার কর বৃদ্ধিজনিত কারণে ও বক্‌শিশ আদায় থেকে যা নওয়াজিস মুহাম্মদ খান নায়েব ও দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে ভোগ করতেন। ১৭৬৫ সালে নওয়ারাহ, সরকারী আলী, আহশাম ও প্রধান সেনাপতির জায়গীর ইত্যাদি থেকে লব্ধ এই কর ও তাউকির কর সমূহের পরিমাণ ছিল ১৩ লক্ষাধিক টাকা।

রাজস্ব আদায়ের খরচ

রাজস্ব আদায়ে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ কখনও শতকরা ১০ ভাগের উর্ধ্বে যায়নি, এবং নানকর নামে এক বা একাধিক ভূ-সম্পত্তি (এস্টেট্‌স) জমিদারদের ভরণপোষণের জন্য স্বতন্ত্র করে রেখে তদ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা হতো, এর সঙ্গে পরবর্তীকালে জাফর খান কর্তৃক বনকর, জলকর, গোচারণভূমি, জ্বালানী ও মাছধরার অধিকারও প্রদান করা হয়েছিল। অন্যান্য ব্যয় মাসকুরাত বা ওজিয়ত নামে পরিচিত খাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরগণা সমূহের উপ-বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খালসা জমার ½ হারে নিমতাকি ও তাঙ্গা নামে কাননগুদের প্রাপ্য অর্থের এই খাতও মুসকুরাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মকদ্দমি ছিল নিজ বা স্বতন্ত্র তালুকদারদের জন্য একই ধরনের ভাতা বিশেষ, যারা সরকারী খাজাঞ্চিখানায় খাজনা প্রদান করতেন। দেশের ধর্মপ্রাণ ও বিদ্বান ব্যক্তিদের জীবিকার জন্য আয়মা, মদদ্‌মাশ' ও রোজিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল। পূর্বোক্ত দুটো সাধারণতঃ ভূমি মঞ্জুরীর মাধ্যমে এবং শেষোক্তটি দৈনিক ভাতার আকারে প্রদান করা হতো। ধর্মীয় কাজের উদ্দেশ্যে এই জেলায় বিনামূল্যে প্রদত্ত জমির অর্থমূল্য ছিল ১৭৬৩ সালে ৬,৬৩৪ টাকা। নাজিমের প্রয়োজনে সিবান্দী সৈন্যদল রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত প্রধান খরচের পরিমাণ ছিল ৯০,০০০ টাকা।

সায়ার কর নির্দ্ধারণ

রাজস্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা সায়ার কর মুঘল শাসনামলের প্রথম দিকেই প্রবর্তিত হয়েছিল। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর আদায়কৃত কর বা শুল্ক, এবং ব্যবসা বাণিজ্য, পেশা কার্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির

উপর আরোপিত কর ইত্যাদি নিয়ে উহা গঠিত ছিল। এই কর ব্যবস্থা প্রদেশের নায়েব এবং দেওয়ানের যৌথনিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং তারা যা যথার্থ মনে করতেন সেই ভাবে এই রাজস্বের সংশোধন ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা তারা ব্যবহার করতেন। এ সকল কর নির্দিষ্ট কতকগুলো গঞ্জ, ঘাট ও বাজার থেকে সংগ্রহ করা হতো, এবং সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী জমিদার, ইজারাদার, বা শতকরা নির্দিষ্ট হারে খাজনা-আদায়কারী কৃষিব্যবসায়ীদেরকে আদায়ের জন্য অনুমতি প্রদান করা হতো; কিম্বা এসব কর আদায়ের দায়িত্ব সরকারী কর্মচারী, যেমন আমীন ও তহসিলদারদের উপর অর্পণ করা হতো, যারা বার্ষিক ধার্যকৃত অর্থ প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতো। কর-নির্ধারণের হার ও উহা সংগ্রহের পদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সঠিক বর্ণনা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ভাড়াটে ও তাদের অধীনস্থদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাধীনে ছেড়ে দেয়ায়, এ সকল কর সাধারণতঃ একতরফা ও উৎপীড়ন-মূলক হতো। সায়ার করসমূহ মহল বা আঞ্চলিক রাজস্ব থেকে যদিও সম্পূর্ণ ভিন্ন, তথাপি উহা কখনও কোন নির্দিষ্ট নামে অভিহিত ছিল না। প্রতিটি মহলেই আরোপিত কর পেশা, কার্য, ব্যবসা বাণিজ্য বা দ্রব্যের স্থানীয় নাম থেকে তার বৈশিষ্ট্য সূচক নাম গ্রহণ করতো। ঢাকা সম্পর্কিত সায়ার শুল্ক সাবানদার ও চান্দিনা এ দুটো দফার অধীনে শ্রেণীবদ্ধ করা ছিল এবং নিম্নলিখিত মহল ইত্যাদি নিয়ে গঠিত ছিল।

(১) মীর বাড়ি। নৌযান নির্মাণের উপর ধার্যকৃত একটি কর, যা' তরীর আয়তন অনুসারে আট আনা থেকে এক টাকা চার আনা পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঢাকা জেলার অধিবাসী নয়—এরূপ নাবিক বা মাঝিদের যে সমস্ত নৌকা শহরে এসে পৌঁছাতো, কিম্বা শহর ছেড়ে যেত—সেই সমস্ত নৌকা থেকেও এই কর আদায় করা হতো। এটা আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত উৎপীড়নমূলক ও ক্ষতিকর ছিল। মুর্শিদাবাদগামী একটি নৌকার দাঁড় প্রতি ৮ আনা হারে, কলকাতাগামী নৌকার দাঁড় প্রতি ১০ আনা হারে এবং বেনারসগামী নৌকার দাঁড় প্রতি ১ টাকা ৮ আনা হিসেবে খাজনা আদায় করা হতো। অন্যদিকে, ঐ সমস্ত স্থান থেকে আগমনকারী তরীগুলোর উপর নৌকা প্রতি যথাক্রমে একটাকা, দু'টাকা ও চার টাকা আদায় করা হতো। মহল প্রথমে শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু

পরবর্তী সময়ে উহা গ্রামেও বিস্তৃত হয় ; যেখানে জমিদার ও কৃষি ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তাদের ভূ-সম্পত্তির উপর দিয়ে অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি নৌকা থেকে উহা আদায় করা হতো। এরূপ ব্যবস্থা ডাকাত ধরার ক্ষেত্রে খুবই উপকারী বলে বিবেচিত হয়েছিল ; কারণ জেলার অন্তর্গত নৌকা, মাঝি ও নৌকার লোকজনদের তালিকা জমিদারগণ কর্তৃক সংরক্ষিত হতো।

(২) চক—নিকাশ। জমির উপর দোকান-গৃহ নির্মাণের জন্য প্রদত্ত খাজনাবাদে বাজারে বিক্রয়-করা প্রত্যেকটি দ্রব্যের উপর এই কর আরোপিত ছিল। একটি ছাগলের জন্য টাকায় এক থেকে দু'আনা আদায় করা হতো ঃ ক্রেতার নিকট থেকে ১ টাকা ৪ আনা আদায় ব্যতিরেকেও, হস্তী ও অশ্বের মূল্যের উপর শতকরা ৫ ভাগ হারে এবং মহিষের উপর শতকরা ১৪ ভাগ হারে আদায় করা হতো। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধবতী মহিষের মালিকদেরকে প্রতিটি মহিষ রাখার জন্য বছরে ১ টাকা ৮ আনা হারে কর প্রদান করতে হতো। তাম্র নির্মিত বাসন কোশন, অস্ত্রশস্ত্র, ছুরি কাঁচি, সকল প্রকার ছুরি কাঁচির ব্যবসায়, আয়না, হুক্কা, অতি অল্পমূল্যের মনি ইত্যাদি অলংকারাদি, বালাচুড়ি, চিরুনি ইত্যাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিক্রেতাগণ এবং চকের ফেরিওয়ালা সম্প্রদায়, সকলের উপরই টাকায় এক আনা হারে কর ধার্য করা হতো।

(৩) ধূপ মহল। শহরে কাচের জিনিষ বিক্রেতাদের উপর আরোপিত কর। বাজারে এই দ্রব্য বিক্রয় কিম্বা কোন নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ অনুপাতে বছরে দু'টাকা থেকে ৬ টাকা পর্যন্ত উল্লেখিত কর আদায় হতো। ইউরোপীয়দের আস্তাবলে ঘাস-সরবরাহকারী ঘাস কাটা লোকদের উপর মাসিক আট আনা কর ধার্য ছিল। শহরের গরুর রাখালরাও এই একই হারে কর প্রদান করতো। অন্যদিকে, যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করতো, কিন্তু শহরে দুধ বিক্রয় করতো, তাদের উপর মাসিক দু'টাকা হারে খাজনা বসানো হতো।

(৪) মহল ঘরকাঠি। যে সকল ব্যক্তি শহরে বিক্রয়ার্থে কাঠ, বাঁশ ও ছন ইত্যাদি আনয়ন করতো, উক্ত খাজনা তাদের দেয় ছিল।

(৫) মহল ঢাল। এটি তোলা হতো ঢাল এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুতকারীদের থেকে। উহা বছরে এক টাকা থেকে এক টাকা আট আনা পর্যন্ত ধার্য হতো। পৃথকভাবে চামড়ার উপর টাকা প্রতি এক আনা দশ গণ্ডা হারে এবং উহা কালো রঙ করার জন্য বেল ব্যবহারের নিমিত্ত মণ প্রতি ছ'আনা হারে কর আরোপিত হতো।

(৬) মহল সিন্দুরী। হিন্দুগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সিঁদুর নামে পরিচিত এক ধরনের লাল রঙ তৈরীর উপর আরোপিত কর। করের পরিমাণ উল্লেখিত হয়নি।

(৭) পান মহল। শহরে বিক্রয়ার্থে আনীত পানের উপর শুল্ক। দামের পার্থক্যের উপর এটা নির্ভরশীল ছিল; এবং সাধারণতঃ বাণ্ডিল প্রতি একটা নির্দিষ্ট হারে আদায় করা হতো। শহরে ও শহরতলীতে পান বিক্রয়ে যারা একচেটিয়া সুবিধা ভোগ করতো, সেই সমস্ত ব্যক্তিরাই এই খাজনার কর্তৃত্ব গ্রহণ করতো। ১৭৭৩ সালে আঠারো হাজার চারশত একচল্লিশ টাকা সাত আনা বারো পয়সার জন্য পান মহলের ইজারা বা ভাড়া দেওয়া হয়েছিল।

(৮) সব্‌জি মহল। এটি শাক্‌সব্‌জি বিক্রেতাগণের উপর আরোপিত একটি কর। তাদের ব্যবসায়ের পরিমাণ অনুসারে উহা বাৰ্ষিক ১ টাকা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত ধার্য করা হতো।

(৯) কাগজ-মহল। এটি কাগজ বিক্রেতাগণের উপর বছরে দোকান প্রাত ৩৬ টাকা হারে আরোপিত একটি রাজস্ব।

(১০) চান্দিনা আলমগঞ্জ। ঢাকা নগরে ব্যবসা-বাণিজ্যরত সকল ব্যক্তিদের উপর বছরে ১ টাকা থেকে ২ টাকা ৮ আনা পর্যন্ত আরোপিত একটি খাজনা।

(১১) শিরে চান্দিনা, চকোন্দি ও পেশকশ বাজার। সোনা ও রূপার তার এবং আতশ বাজি নির্মাণকারীসহ শাঁখারি, পুষ্পখচিত মসলিনের (ছাপা জামদানীর) তাঁতী এবং স্বর্ণকার ও সেকরা, শহরের রকমারি কারিগর ও দোকানদারশ্রেণীর উপর এই কর আরোপিত ছিল। করের পরিমাণের কোন উল্লেখ নেই।

(১২) চান্দিনা-দামদারী। এটি ভল্লুক, বানর ও সর্প-নৃত্য প্রদর্শনকারী এবং পাখিশিকারী, গায়ক, ফকির ও ভেলকিবাজ প্রভৃতি ব্যক্তিদের উপর বসানো একটি কর।

(১৩) চান্দিনা বাইজেনটি। সকল ধরনের বাস্তুকরদের উপর আরোপিত একটি কর। এই কর ও পূর্বোক্ত করের সর্বমোট পরিমাণ ছিল বাৰ্ষিক ৪,৫০০ টাকা।

(১৪) চান্দিনার অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য শুল্কাদি ছিল মাহীমহল বা শুটকি মাছ বিক্রেতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর। লবণ বিক্রেতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত হতো নিমক-

দলালি, ধোপা কর্তৃক প্রদত্ত হতো গুজর মহল। কাঠ বিক্রির উপর আরোপিত হতো ইমাহ্ মহল বা ইমাহ্ শুল্ক।

(১৫) বাতছাপি ও পঞ্চতি মহল। ইত্তিসাবের পদ বিলুপ্তির পর এসব কর বসানো হয় এবং রাজকর্মচারীদের কর্তৃত্বাধীনে এদের নিয়ন্ত্রণভার অর্পণ করা হয়, যারা শহরের সকল রকম ওজন ও মাপজোপ পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করতো। এসব কর্মচারীকে পণ্যদ্রব্য মূল্যের প্রতি একশত টাকার উপর আটআনা হারে কর আদায় করার কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছিল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরও কিছুকাল পর্যন্ত এই কর অব্যাহত ছিল এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের সেক্রেটারী ও কালেক্টর কর্তৃক নিযুক্ত আমীনদের তত্ত্বাবধানে আদায় করা হতো এসব কর। নেগাবানগণ বাজারে ওজন ও পরিমাপ পরিদর্শন করতেন এবং তাদের নিজ নিজ এলাকায় মাসে দু'বার এসবের উপর সীলমোহর এঁটে দিতেন ও দোষত্রুটিপূর্ণ ঘটনা সমূহ কালেক্টরের নিকট রিপোর্ট করতেন। কালেক্টর অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান করতেন।

অন্যান্য কর

সায়ার শাখাগুলোর মধ্যে চান্দিনা ও সাবানদারের আওতাভুক্ত বিক্রমপুরের বাণিজ্যস্থান ও গঞ্জগুলোতে এবং শহরের পার্শ্ববর্তী অন্যান্য স্থানসমূহে কয়েকটি মহল ছিল। এগুলো বিভিন্ন দ্রব্যের বেচাকেনায় কাজে নিয়োজিত বেপারী ও ফড়েদের (ফড়িয়া) উপর আরোপিত অত্যাধিক শুল্ক সহ পান, সুপারি, তামাক, সুতা ইত্যাদির উপর বসানো কর নিয়ে গঠিত ছিল; এবং মাঝি, জেলে ও নৌকা নির্মাণকারী প্রভৃতিদের উপর আরোপিত করসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত অত্যাধিক স্বেচ্ছাচারমূলক ও উৎপীড়ক ধরনের আরো কয়েকটি শুল্ক ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ "মোকাম টঙ্গি-জামালপুর" নামে অভিহিত মহলের উল্লেখ করা যায়। উক্ত স্থানের সকল ব্যক্তি, যারা দেশের অন্যান্য অংশে চাকুরীতে নিযুক্ত থাকতো তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তনের উপর শুল্ক বসানো ছিল; এবং এ স্থান থেকে অর্থকড়ি নিয়ে বাইরে গমনকারী সকল অপরিচিত ব্যক্তিকে তাদের তহবিলের টাকা প্রতি ১ আনা কর প্রদান করতে হতো।

হাট বাজারের উপর আরোপিত শুল্ক

এছাড়া, গ্রামাঞ্চলের সকল হাট ও বাজার থেকে চান্দিনা ও শাবানদার শুল্ক আদায় করা হতো। এগুলো সাধারণতঃ সায়ার শুল্কের একটি শাখা হিসেবে পরিগণিত ছিল। কিন্তু মিঃ ডগলাসের মতে, এসব শুল্কাদি উহা থেকে ভিন্ন দফার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোম্পানীর দেওয়ানীলাভের প্রাক্কালে ঢাকা প্রদেশের ৫৫৬টি বাজার থেকে এই সকল কর সংগৃহীত হতো, এবং এর পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৬৮,৭৮৪ টাকা ৮ আনা ১৩ পয়সা। ১৭৯০ সালে সায়ার শুল্কের সঙ্গে করসমূহ বাতিল করা হয় এবং এদের উচ্ছেদ সাধনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জমিদারদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। কিন্তু জমির উপর গৃহ-নির্মাণের জন্য প্রদত্ত খাজনার অধীনে ভূস্বামীগণ কর্তৃক ঐ সকল কর আদায় অব্যাহত থাকে; সায়ারের বেশ কিছু অংশ 'লাখেরাজ' বা নিষ্কর রাখা হয় এবং এদের ভূ-স্বামীরা পেনসন বা ভাতা লাভ করেন।

১৭৬৫ সাল থেকে রাজস্ব

১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের ফলে মহামান্য কোম্পানীর নিকট উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, তার মধ্যে ছিল পুরাতন দুর্গ সংলগ্নভূমি, যার উপর টাকশাল, সরকারী অফিস-আদালত ও নবাবের প্রাসাদ ইত্যাদি অবস্থিত ছিল। এ ছাড়া ছিল শহীদাবাদ ও জাফরাবাদ পরগণার রাজকীয় ভূ-সম্পত্তির অন্তর্গত প্রায় ৬০০ বিঘা জমি এবং পেশকশ দেওয়ানী ও অন্যান্য সম্পত্তি যা বৈধ উত্তরাধিকারীর অভাবে সম্রাটের অধিকারে চলে গিয়েছিল, কিম্বা যে সমস্ত সম্পত্তি মালিকগণ কর্তৃক অপরাধ সংঘটনহেতু বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও ছিল হাজীগঞ্জ ও দশরার রাজকীয় দুর্গ সমূহ এবং বড় কাটরা ও কয়েকটি বাড়ি, কিছু বিচ্ছিন্ন ভূমি ইত্যাদি, যা থেকে বছরে প্রায় ৫৫০ টাকা রাজস্ব আসতো। এ সব জমিজমা ছাড়াও চান্দিনার আওতাভুক্ত শহরের কয়েকটি বাড়ি, বহু সড়ক ও বাজার সরকার কর্তৃক অর্জিত হয়। এ সব সম্পত্তি থেকে প্রায় ৭০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হতো, কিন্তু বর্তমানে তা' বছরে মাত্র ১,৭৮০ টাকায় ইজারা দেয়া হয়। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবদের ব্যবস্থাধীনে সংরক্ষিত নওয়ারাহ সংক্রান্ত ভূসম্পত্তির মালিকানা সরকারের হাতে আসার সময় থেকে এখন তা' প্রধান সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত হয়। সম্রাট আকবরের আমলে নওয়ারাহ্ বা রণতরীর বহর

প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত বেশ কিছু সংখ্যক গ্রাম ও ভূসম্পত্তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। এই সমর্পিত সম্পত্তির রাজস্ব, খালসা বা সরকারী রাজস্ব বিভাগ থেকে নওয়ারাহ্ বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে একটি মাত্র পার্থক্য পরিলক্ষিত হলো এই যে, জমির মালিকগণ তাদের খাজনা প্রদেশের দেওয়ানের নিকট প্রদানের পরিবর্তে, নওয়ারা কর্মচারীদের নিকট দিত। নাবিক, নৌ সেনা, কারিগর প্রভৃতিদের অনুকুলে ভূমি-মঞ্জুরী বা অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে তাদেরকে এই সকল রাজ-কর্মচারীদের নির্দেশ নিয়ম ইত্যাদি পালনের জন্য দায়ী থাকতে হতো। এরূপভাবে নওয়ারাহ্ বিভাগে প্রথমে হস্তান্তরিত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৭,১২,৫০২ টাকা ১৩ আনা, এবং উক্ত অর্থের বেশ কিছু অংশ বিভিন্ন সময়ে ফেরৎ নেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রাক্কালে আদায়-যোগ্য অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫৭,৬৩০ টাকা, ৩ আনা, ১ পয়সা; এর মধ্যে ৩২,২২২ টাকা ১২ আনা জমিদারগণ কর্তৃক 'হিস্যারত' রূপে এবং ২৫,৪০৮ টাকা ১ আনা ১৭ পয়সা ঢাকার নবাবের অধীনে তাদের ভোগদখলে ছিল। কিন্তু বাদবাকি ৩,৪৩,৯৩৪ টাকা ৬ আনা ৫ পয়সার আর কোনো হিসেব পাওয়া যায়নি।

সরকার কর্তৃক উদ্ধারকৃত সম্পত্তি

১৭৯৮ সালে ঢাকা ও বাকেরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত হিস্যারত (Hissaraut) ও নওয়ারার লুক্কায়িত ভূ-সম্পদ নিয়ে হিসেব করে দেখা গেছে যে, উল্লিখিত অর্থের উপরে সরকার আরো ৯০,০০০ হাজার টাকা পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। ঢাকার নবাবের দখলিভুত অংশ সরকার বহুকাল আগে থেকেই পুনর্গ্রহণ করেছেন এবং হিস্যারত ও লুক্কায়িত ভূসম্পত্তির বেশ কিছু পরিমাণ অংশও জেলার রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। শহর ও তার চতুপার্শ্বস্থ ভূ-সম্পত্তির বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো যার মালিকানা বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক দাবী করা হয়েছিল, তাও বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ফলে এখনও লুক্কায়িত নওয়ারা জায়গীরের একটা অংশ ছাড়া, মুঘল সরকারের আমলের ষ্টেটের সমগ্র ভূ-সম্পত্তি বর্তমানে মহামান্য কোম্পানীর দখলে এসেছে। যে ভূ-খণ্ডের উপর শহর অবস্থিত তাও লাখেরাজ বা নিকর বলে কথিত হয়ে থাকে এবং

জেলার রাজস্ব কর্মচারীগণও অনুরূপ বিবেচনা করতেন বলে প্রতীয়মান হয়। কোম্পানী কর্তৃক অতি সাম্প্রতিক কালে দখলিকৃত অন্যান্য সম্পত্তিগুলো বিভিন্ন নদীগর্ভে অবস্থিত পলল-ভূমি নিয়ে গঠিত।

রাজস্ব হ্রাস

১৭৬৫ সালে কোম্পানীর পক্ষে দেওয়ানীর বন্দোবস্ত হওয়ার পর ঢাকার নিয়াবাত (Neabut), যা পূর্বে কিছু কালের জন্য মুহাম্মদ রেজা খানের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন তার প্রতিষ্ঠিত খাজনা ৩৮ লক্ষ টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ২০½ লক্ষ টাকায় এসে দাঁড়ায়।

পরপৃষ্ঠার বর্ণনায় এ সময়ে ঢাকা-জালালপুর প্রদেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকা লক্ষ্য-করা যায় : এর আয়তনের পরিধি ; আসল জমা-তামারি, বা ১৭২২ সালে রাজস্বের পরিমাণ ; ইজাফা সুবাদারী বা ঐ সময় থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত কর নির্ধারণ ও অন্যান্য উৎস থেকে আগত বৃদ্ধি ; মোট অর্থ থেকে হ্রাসপ্রাপ্তি এবং খরচ পত্র বাদে ১৭৬৫-৬৬ সালে দেওয়ান কর্তৃক বন্দোবস্তকৃত মোট রাজস্ব।

চাক্‌লা জাহাঙ্গীরনগর—উভয় খাল্‌সা ও জায়গীরসহ, ত্রিপুরা বাদে সিলেটের সেরাইল ও রতনশাহী সংযুক্তিসহ, চাক্‌লা করিবাড়ীর কড়িবাড়ি পরগণা, সৌজিং ও শ্রীপুর দশ আনিয়া ; ঘোড়াঘাট চাকলার ময়মনসিংহ, আলেফসিংহ ও জাফরশাহী এবং যশোহর ও বশনা থেকে আগত কিসমৎ পরগণা ইত্যাদিসহ ঢাকা-জালালপুর গঠিত ছিল।

১৭৭২ সালের উশিল জমা-তামারি।			১৭২২ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত ইজাফা সুবাদারীকর নির্ধারণ।						
বৃটিশ মাইলে আয়তন।	খলসা ও সায়ার মহল।	জায়গীর—মঞ্জুরীকৃত ভূ-সম্পত্তি।	মোট।	সাফ্‌ সিক্কাসহ আটটি আবওয়াব।	নওয়াবার আয়সহ তাওফির।	মোট	১৭৬৫-৬৬ সালের মোট উশিল ও ইজাফা	মুহম্মদ রেজা খান কর্তৃক আরোপিত দুটো অতিরিক্ত করসহ ১৭৬৩ সালের মুসকুরাত খাজনার উজিয়াত বাদে।	১৭৬৫-৬৬ সালে এম. রেজা খান কর্তৃক বাংলা-বন্দকৃত জালালপুরের রাজস্বের মোট পরিমাণ (প্রকৃত বাদে)।
মাইল	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১৫,৩৯৭	৬,১৯,৬৭৩	৫,৩১,০৫৩	১১,৫০,৭২৬	৩৫,১০,২৫	৫৪,৮২,৪৯	৮৯,৯২,৭৪	২০,৫০,০০০	৪৩,৬৭,৯৭	১৬,১৩,২০০

১৭৭২ সালে পাঁচ বছরে জন্য মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কর্তৃক বন্দোবস্ত দেওয়ার ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি

১৯৭২ সালে মুর্শিদাবাদের কাউন্সিল কর্তৃক পাঁচ বছরের জন্য জেলার বন্দোবস্ত প্রদানের ফলে রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ১৭৬৫ সালের বন্দোবস্তে মুহম্মদ রেজা খান কর্তৃক যে তহবিল তছরূপ করা হয়, ইজফা ও আবওয়াব খামসি দ্বারা তা' পূরণ করার ফলে পার্থক্য দূরীভূত হয়ে যায় এবং মোটমাট আদায় হয় ২৯,৭৮,১৪৩ টাকা। এই অর্থ থেকে রাজস্ব আদায়ের (সালিয়ানা) খরচ পত্র বাদে মোট লাভ হয় ২৬,৯৩,০৪১ টাকা। হাস্তাবাদ তদন্ত কমিশন গঠনের পর কাউন্সিল কমিটি কর্তৃক ১৭৭৭-৭৮ সালে জমিদারগণের কয়েকটি স্থানীয় জিম্মাদারী ভূ-সম্পত্তিতে পুনর্বহাল করা হয়; এর পূর্ববর্তী চার পাঁচ বছর সময়ে প্রদেশের ৩/৪ ভাগ অঞ্চলব্যাপী প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে আমিনগণ কর্তৃক উক্ত তদন্তকার্য পরিচালিত হয়েছিল। এ সময়ে জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তকৃত ভূমি বা আঞ্চলিক ও সায়ার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০,০৮,৯৭৪ টাকা। উহা থেকে জমিদারী ভাতাদি বাদ দেওয়ার পর ২৮,৪৯,১১০ টাকার একটি পাঁচমিশালী জমা থেকে যায়। ১৭৮৩-৮৪ সালে রাজস্ব-বিভাগীয় কর্মচারীগণ কর্তৃক জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল আদায়ের খরচপত্র বাদে ২৮,০৯,৯৯৮ টাকা। সালিয়ানা (১৭৭২ সালে প্রবর্তিত) ছাড়াও উক্ত ব্যয়ের মধ্যে ছিল হুণ্ডিয়ান (Hoondeauan) বা অর্থ প্রেরণের খরচ পত্র; শান্তি রক্ষার কাজে নিয়োজিত বিচারকরূপে জমিদারের কার্যকালে ফৌজদারী বা পিয়নদের জন্য ভাতা এবং আকরা-যোথ সংক্রান্ত কিছু সংখ্যক ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, যেমন আশুরা এবং বুরা ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহ করার খরচ পত্র।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ঢাকা কলেক্টরের এলাকা

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ঢাকা কালেক্টরেট এই জেলা (বর্তমানে যে ভাবে গঠিত) এবং বাকেরগঞ্জ নিয়ে গঠিত ছিল। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২½ লক্ষ টাকা এবং ভূ-স্বামীদের সংখ্যা ছিল ১৬,০০০। প্রথমে স্বতন্ত্র বা নিজ তালুকদারগণের সংখ্যা ছিল ৩৮০, কিন্তু ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে অধঃস্তন তালুকদারদের বেশীর ভাগ, যারা নিজ তালুকদারকে খাজনা

প্রদান করতো, তাদেরকে স্বাধীন করা হয় এবং সরাসরি ট্রেজারীতে রাজস্ব জমা দেয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়।

অধিকতর সহজ পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা

এই অসংখ্য ভূ-স্বামীদের সাহায্যার্থে এবং দূরবর্তী স্থানে তাদের ভ্রমণের কষ্ট লাঘব করার জন্যে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে জেলাটিকে কয়েকটি কালেক্টরেট জেলায় পুনর্বিভক্ত করা হয় এবং রাজস্ব গ্রহণের নিমিত্ত তহশিলদারগণকে সেসব স্থানে পাঠানো হয়। কিন্তু বিভিন্ন তালুকগুলো বহু পরগণাব্যাপী বিচ্ছিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকার কারণে রাজস্ব আদায়ের এ পদ্ধতি অবাস্তব প্রমাণিত হয়। অগত্যা এই ব্যবস্থা বাতিল করে কালেক্টরের কাচারীতে খাজনা প্রদানের বর্তমান রীতি চালু হয়।

মুঘল-শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের বিভক্তিকরণ

মুঘল শাসনামলে রাজস্ব বিভাগ হুজুরী ও নিজামত—এ দুটো শাখায় বিভক্ত ছিল; এবং ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ উভয় শাখার স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল। এ সময়ে উক্ত শাখা দুটোকে প্রথমোক্তটির নামের অধীনে সংযুক্ত করা হয়। ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দে কালেক্টরেট কয়েকটি জেলায় উপ-বিভক্ত হওয়ায়, হুজুরী তহসিল ও জেলা তহসিলের পার্থক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা এখনও কালেক্টরেটে চালু রয়েছে, যদিও পরবর্তী নামের দ্বারা চিহ্নিত রাজস্ব আদায় পদ্ধতি এখন আর অবলম্বন করা হয় না।

শহরে উত্তেজক কড়া মদ্য চোলাই ও বিক্রয় করা হতো; এবং এর জন্য সরকারকে কোনরূপ শুল্ক প্রদান করা হতো না। অবশেষে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে মিঃ ডগলাস কর্তৃক এই মহল গঠিত হয় এবং বার্ষিক ২,১০০ টাকার জন্য তৎ-কর্তৃক এর ইজারা প্রদান করা হয়। এই সময়ে মদের ভাটিখানার উপর সাধারণ শুল্ক ছাড়াও প্রতিটি চৌবাচ্চা ও আগুনের চুল্লি রাখার স্থানের উপর একটি কর আদায় করা হতো, কিন্তু মহর্‌রম, রমজান ও ঈদের সময় উক্ত কর প্রদান থেকে নিষ্কৃতি প্রদান করা হতো। কেননা, এসব পর্ব উপলক্ষে মদ ব্যবহারের মাত্রা থাকতো খুবই সামান্য। ফলে, চোলাইকারীরা তাদের কাজ বন্ধ রাখতো। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই করের পরিমাণ ছিল ৫,৬৯৬ টাকা, এবং ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে ৬,০০০ টাকা। এ সময়ে হিসেব করে

দেখা গেছে যে, তখন দৈনিক ৩২০০ কোয়ার্ট তাড়ি বা ধেনো মদ চোলাই করা হতো। আফিমের তৈরী নানাবিধ দ্রব্য যেমন, মদক ইত্যাদির উপর ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম শুল্ক আরোপিত হয়, এবং আফিমের উপর কর ধার্য করা হয় ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৭৯৩ সালে গাঁজার আমদানীকারকরা মণ প্রতি ২ টাকা ৪ আনার শুল্ক (কুৎমহল) প্রদান করেছিল, এবং শহরে এর বিক্রেতাগণ দিত মাসে দু'আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত।

নিম্নলিখিত বর্ণনায় ১৮৩৬-৩৭ সালের জন্য ঢাকা-জালালপুরের রাজস্বের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়েছে।

১৮৩৬-৩৭ সালে ঢাকা—জালালপুরের রাজস্বের পরিমাণ

		টাকা আনা পয়সা
ভূমি-রাজস্ব	হুজুরী তহসিল	২৮৯১৯৫—৯— ০
	জেলা তহসিল	১৪১১৫৪—৪— ৫½
		৪৩০৩৪৯—১৩—৫½
আকবরী রাজস্ব	আফিম, মদ ইত্যাদি	৪০৭৬৫—৩—১
	ষ্ট্যাম্প ইত্যাদি	৮৩২৬৫—৮—১
		১২৪০৩০—১১—১
	সর্বমোট :	৫৫৪৩৮০—৮—৬½

রাজস্বের অন্যান্য শাখাগুলো হলো চৌকিদারী ট্যাক্স এবং খেয়া ও ডাক বিভাগ কর ইত্যাদি।

১৭৬৫ সাল থেকে জেলার সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের সময়ে ঢাকা প্রদেশের সাধারণ প্রশাসন ব্যবস্থা হুজুরী ও নিজামত নামক দুটো বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছিল। পূর্বোক্তটি ছিল প্রাদেশিক দেওয়ানের অধীন, যিনি মুর্শিদাবাদে বসবাস করতেন, এবং তদীয় সহকারী রাজা হিম্মত সিংহের মাধ্যমে ঢাকায় তার শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। খালসার বা সরকারী রাজস্ব সমূহের প্রধান অংশের দায়িত্ব ছিল এই রাজকর্মচারীর হাতে। তিনি তার আওতাধীন রাজস্ব-সংক্রান্ত সকল

বিবাদের নিষ্পত্তি করতেন। জশরৎ খান কর্তৃক নিজামতের কার্যাদি পরিচালিত হতো, যিনি নায়েব বা নবাবে-নাজিমের সহকারীরূপে কার্য সম্পাদন করতেন। তিনি দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের তত্ত্বাবধান করতেন এবং রাজস্বের একটা অংশও তিনি আদায় করতেন যা' তার শাসনকার্য পরিচালনার খরচপত্র নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট করা ছিল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে মিঃ সিক্স ও মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রীগণ কর্তৃক স্বিরীকৃত ঢাকার সরকারী সংস্থাপন বিভাগ সমূহের বার্ষিক ব্যয়ের বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো।

টাকা আনা পয়সা

১। রাজবন্দীদের জন্য ভাতা ঃ ৩৪,৭৫৫—১৫—০

(লর্ড ক্লাইভ এদেরকে ১৭৬৭ সনে মুক্তিদান করেন)

২। নিম্নশ্রেণী ইত্যাদি অধিবাসীদের মধ্যে অনবরত সংঘটিত ঝগড়া-বিবাদ সংক্রান্ত সমস্ত মামলা মকদ্দমা পরীক্ষা করে দেখা ও নিষ্পত্তির জন্য নিযুক্ত ছয় সদস্যের 'কোর্ট অব্ জাষ্টিস' এর প্রত্যেক সদস্যের জন্য মাসিক ৫০ টাকা হারে ভাতা ৩,৬০০

৩। দেওয়ানী সংক্রান্ত ব্যয় ২৫,০০০

৪। কাচারী সংক্রান্ত খরচপত্র ৮,৫০০

(ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি, গালিচা, তৈল, মাদুর ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ পাইক, সরদার, মুনশীয়া ও ভৃত্যগণের পণ্য ব্যয়।)

৫। দান খয়রাত ৮,৩৮৮

৬। সাধারণ খরচপত্র ৮,৬১৮-১৫-২

৭। মাসিক ৬,০০০ টাকা হারে
জশরৎ খানের ভাতা ৭২,০০০

৮। মহাসিংহের প্রাদেশিক দেওয়ান,
মাসিক ৪,০০০ টাকা হারে ৪৮,০০০
(এই টাকা থেকে হিম্মত সিং পেতেন
মাসিক ৫০০ টাকা হারে)

৯। সুপারভাইজারের প্রতিষ্ঠানিক
খরচপত্র ৩৬,৫০০

সর্বমোট ঃ ২,৪৫,৩৬২-১৪-২

১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মিঃ কেলসল হুজুরী ও নিজামত উভয় বিভাগের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বসহ মাসিক ১,০০০ টাকা বেতনে রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দপ্তরে চুক্তিবদ্ধ তিনজন ইউরোপীয় কর্মচারী ছিলেন, যারা সহকারী, ফার্সীর অনুবাদক ও একজন ইংরেজী লেখকরূপে কাজ করতেন। এছাড়া ছিল ১ জন প্রধান সেরেস্তাদার ও দু জন সরকারী সেরেস্তদার, ১১ জন মোহরার, ৩ জন আমিন, ১ জন নায়েব ও ২ জন মুন্‌সী। তিনি আদায় উসুলের বিষয় তদারক করতেন যা' তখন মফঃস্বলে আমিলগণ কর্তৃক করা হতো এবং তার ফৌজদারী ক্ষমতাধীন এলাকার সকল বিষয়ে তিনি ছিলেন জশরৎখান ও মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম। এই সময়ের পূর্ব পর্যন্ত কোনরূপ উপরস্থ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় নায়েবই ছিলেন বাঁচা-মরার মালিক। কিন্তু মিঃ কেলসলের নিযুক্তির পর-অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলা মোকদ্দমার ক্ষেত্রে তার বিচারালয়ের ধারাবিবরণীগুলো প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা অনুমোদনের নিমিত্ত রেসিডেণ্টের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদের দরবার ও কাউন্সিলে দেশীয় মন্ত্রীদের নিকট পেশ করা হতো। নিজামতের সকল ব্যবসা সংক্রান্ত বিচার কার্যে, যাতে বিদেশী কারখানাগুলোর অন্তর্ভুক্ত লোকজন জড়িত থাক্‌তো, তা' কেবল তত্ত্বাবধায়কের বিশেষ তদন্তের জন্য সংরক্ষিত থাকতো।

১৭৭১ সালে মিঃ হ্যারিস তত্ত্বাবধায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে তত্ত্বাবধায়ক পদে মিঃ কেলসলের স্থলে মিঃ হ্যারিস নিযুক্তি লাভ করেন এবং তার মাসিক বেতন ১৮০০ টাকায় উন্নীত হয়। নওয়ারার রাষ্ট্রীয় রণতরী সমূহ ১৭৬৯ সাল থেকেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল, এবং এখন কোনগরের অপ্রয়োজনীয় পদ, এবং পরবর্তী সময়ে ইত্তিসাবের পদও বাতিল করা হয়। সায়ার কর এবং বিশেষ করে লবন, সুপরি, এবং তামাকের উপর কর আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে রাজস্বের এই শাখার তত্ত্বাবধান করার জন্য একজন চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। নিরপেক্ষভাবে যাতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়, তা দেখার জন্য আদালত কাচারীতে একজন ইউরোপীয় কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল, বিশেষতঃ যখন গুরুত্বপূর্ণ মামলার মীমাংসা করতে হতো।

নদীপথে ও সুন্দরবনে অসংখ্য ডাকাতদল

নদ-নদীগুলোতে অসংখ্য চোর ডাকাত ছিল এবং তাদেরকে ধরার জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করার জন্য শহরে ডাকাতদের হরকার (গুপ্তচর) থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চল চোর-ডাকাতে পরিপূর্ণ থাকার কথা, কলকাতা যাবার পথে ক্যাপটেন হলাণ্ডের হত্যাকাণ্ড ইত্যাদিও উল্লেখিত হয়েছে। এ বছরের প্রারম্ভে, আমিলদের স্থলে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হয়েছেন, যাকে মফঃস্বল থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, এবং আদায় করা রাজস্বের প্রায় সবটাই এ সময়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামের কারখানাগুলোতে দিয়ে দেয়া হয়। বাদবাকি সামান্য অর্থ কেবল বাণিজ্যিক বিল বা হুণ্ডির মাধ্যমে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হয়। দেওয়ানী নৌবহর রক্ষণাবেক্ষণের বার্ষিক খরচ ছিল ৪০,০০০ টাকা, এখন বহরের সংখ্যা হ্রাস করে ৩৭ থেকে ১৮ করা হয়।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে লাম্বার্ট নিযুক্তি লাভ করেন এবং কালেক্টর উপাধি নিয়ে মিঃ গ্রভারের স্থলাভিষিক্ত হন

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মিঃ লাম্বার্ট তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরের আগস্ট মাসেই কলেক্টর উপাধি নিয়ে তিনি মিঃ গ্রুভারের স্থলাভিষিক্ত হন এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি উক্তপদে বহাল থাকেন। এই বছর মোহাম্মদ রেজা খানের স্থলে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর, সরকারী দপ্তরসমূহে কয়েকটি পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। এর মধ্যে প্রধান ছিল দেওয়ানী আদলতের প্রতিষ্ঠা এবং কালেক্টরকেই এর তত্ত্বাবধায়ক করা হয়। সেখানে তিনি দেশীয় দেওয়ানের সহায়তায় দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমার বিচার-আচার করতেন, এসকল বিষয়ের খোঁজ খবর নিতেন, যা পূর্বে হুজুরী দপ্তরের সহকারী-প্রধান রাজা হিম্মত সিং এর নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করা হতো।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাসীদের বিরাট সমাবেশ

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে কালেক্টর সরকারের নিকট অতিরিক্ত সৈন্য দলের জন্য আবেদন করেন। এ সময়ে প্রায় ১০,০০০ হাজার সন্ন্যাসী মধুপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একত্রিত হয় এবং গ্রামাঞ্চল লুণ্ঠন করে। ফলে অধিবাসীরা গ্রাম

পরিত্যাগ করে নিরাপত্তার জন্য জঙ্গলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ক্যাপটেন টমাসের হত্যা এবং একদল সন্ন্যাসীর হাতে কিছু সংখ্যক সিপাইর পরাজয় বরণ ইত্যাদি বিষয় কলেক্টরের রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছিল।

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠিত হয়। এর প্রধান ছিলেন মিঃ বারওয়েল এবং মিঃ পার্লিং, মিঃ থ্যাকারে, মিঃ সেক্সপিয়ার ও মিঃ হলাণ্ড প্রমুখ ছিলেন এর সদস্য। এখন থেকে নায়েবদেরকে রাজস্ব সংগ্রহ কাজে ও দেওয়ানী আদালত পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ করা হয়, এবং উক্ত আদালত থেকে কাউন্সিলের নিকট আপিল করার ব্যবস্থা রাখা হয়। অন্য দিকে, ইউরোপীয় চুক্তিবদ্ধ সহকারীদের নিযুক্তি প্রদান করে নিম্ন লিখিত পদ-গুলো পূরণ করা হয়। প্রথম—বক্‌শি বা কোষাধ্যক্ষ; ২য়—কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্য রাজস্ব বিভাগের সহকারী; ৩য়—অল্পস্বল্প রপ্তানী সক্রান্ত (Sub-Export) পণ্যাগার রক্ষক ও রাজস্ব বিভাগের সাময়িক সহকারী; ৪র্থ রপ্তানী দ্রব্যের গুদামের সহকারী ও রাজস্ব বিভাগের সাময়িক সহকারী; ৫ম—সেক্রেটারী; ৬ষ্ঠ—হিসাবরক্ষক; ৭ম—দেওয়ানী কাচারীর নথিপত্রের জন্য সহকারী; ৮ম—সেক্রেটারীর সহকারী; ৯ম—প্রধানের সহকারী; ১০ম—ফার্সী অনুবাদক।

জশরৎখান স্ব-পদে বহাল থাকেন

জশরৎ খান ডাকাতদের ধরার জন্য তার অধীনস্থ ফৌজদার ও পুলিশদল পরিচালনা করেন, ফৌজদারী আদালতের তত্ত্বাবধান করেন এবং কোম্পানী কর্তৃক ইতিপূর্বে উল্লিখিত কয়েকটি পরিবর্তন সত্ত্বেও স্বপদে বহাল থাকেন। অতপর তাঁর বৃদ্ধ অবস্থা ও কোম্পানী সরকারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে নিজামত বিভাগের ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্ত মূল মঞ্জুরীকৃত বেতনেই প্রতিপালন করার ব্যবস্থা করা হয়।

ইংরেজ ও ফরাসীদের ঝগড়া

এবছরের প্রধান ঘটনা ছিল পূর্বোক্ত দপ্তরের অধীন জনৈক কর্মচারীর অবরোধ থেকে সৃষ্ট ইংরেজ ও ফরাসী কারখানার প্রধানদের মধ্যকার বিবাদ।

এই ঝগড়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের স্পৃহা জেগে ওঠে। অতঃপর, জশরৎখান ঘোষণা করেন যে, বিদেশী কারখানায় কোন দেশীয় ব্যক্তি আশ্রয় নিলে তাঁকে অপরাধীরূপে গণ্য করা হবে ও গ্রেপ্তার পূর্বক শাস্তি প্রদান করা হবে। এটা পরবর্তীকালে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসী সরকারদ্বয়ের মধ্যে একটি আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়।

ডাক দপ্তর

ডাক-দপ্তর বিভিন্ন বিভাগে প্রসারিত হয়। সবটাই স্বতন্ত্র ও অসংযুক্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং খরচপত্র কিছুটা কোম্পানী দ্বারা এবং কতকটা জমিদার ও জোতদারদের উপর আরোপিত শুল্কের দ্বারা নির্বাহিত হয়। এ অবস্থা সম্পর্কে বলা হয় যে, "কোনরূপ বাধা বা নিয়মশৃঙ্খলার অভাবহেতু ডাক বিভাগ দুর্বোধ্য জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সময় অপেক্ষা এতে অধিক বিলম্ব ঘটে।" চিঠিপত্র আদান-প্রদানের সুবিধা ইউরোপীয়রা ভোগ করতো।

ঢাকায় অবস্থানরত সৈন্যদলের পরিমাণ

এ সময়ে কোম্পানীর সৈন্য বলতে ঢাকায় কেবল মাত্র চট্টগ্রামের আওতাভুক্ত সৈন্যদলের দুটো কোম্পানী ছিল। কিন্তু এই সৈন্যদল অপ্রচুর বিধায়, একটি মিলিশিয়া রেজিমেণ্ট গঠন করা হয় এবং উহা কাউন্সিলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত বাহিনী ছ'টি কোম্পানী নিয়ে গঠিত ছিল। প্রতিটি কোম্পানীতে একশত সৈন্য ছিল এবং একজন এড্‌জুটাণ্ট ও দেশীয় সামরিক কর্মচারীদের একটা পূর্ণসংখ্যা নিয়ে উহা একজন ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে পরিচালিত হতো। এর কর্তব্য ছিল প্রধানতঃ দেশের কাচারীসমূহ ও শিল্প-নির্মাণ কার্যস্থল বা আড়তগুলো রক্ষা করা, অর্থসম্পদ সশস্ত্র পাহারাধীনে আনা-নেয়া, লবনের চোরাকারবার প্রতিরোধ করা, প্রাদেশিক কাউন্সিল ও ফৌজদারী আদালতের আদেশ-নির্দেশ কার্যকরী করা এবং অবাধ্য জমিদার ও তালুকদারদেরকে গ্রেপ্তার করা ইত্যাদি।

সরকারী ব্যাংক স্থাপন

এ সময়ের অন্যান্য সরকারী ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে ছিল সরকার কর্তৃক একটি ব্যাংক স্থাপন। মুদ্রার মূল্যনিরূপণ ও অগ্রিম ঋণদানের ক্ষেত্রে

শরফগনের মাত্রাধিক্য সুদ আদায় ও অসঙ্গত দাবীর অত্যাচার থেকে রায়ত এবং ভূম্যাধিকারীদের কিছুটা মুক্তিদান এর উদ্দেশ্য ছিল।

আর্কট মুদ্রা

এ সময় বাংলার পূর্বাঞ্চলে আর্কট টাকাই ছিল দেশের প্রচলিত মুদ্রা, এবং ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ আর্কট সহ সর্বসাকুল্যে' এই মুদ্রার দশটি ভিন্ন ভিন্ন মূল্য ও নামের ইউনিট বিশ্বমান ছিল। তাম্রমুদ্রার স্থলে কড়ি ব্যবহৃত হতো এবং চালু স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ৫০,০০০ হাজার টাকার ঊর্ধে ছিলনা। আর্কট মুদ্রাতেই রায়তগণ তাদের খাজনা প্রদান করতো, এবং তাঁতী ও সুতা প্রস্তুতকারকগণও এই মুদ্রাতেই অগ্রিম দাদন নিতো। প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক পোদ্দার ছিল, এবং এই সকল মুদ্রা শহরে সিক্কার সঙ্গে বিনিময়ের পূর্বে, এদের নিকট মুল্যায়ণের জন্য অর্পণ করা হতো। কারণ, সরকারী রাজস্ব সাধারণতঃ সিক্কাতেই পরিশোধ করা হতো। বিভিন্ন মানের প্রচলিত মূদ্রা মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাট্টার পরিমাণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হতো এবং এর পরিমাণ সময় সময় ঊর্ধে' শতকরা ১৬ ভাগ পর্যন্ত ছিল। এ ব্যাপারে ব্যাংক জনসাধারণের দুর্গতির উপশম করতে পারেনি বলেই মনে হয়। ফলে; এ প্রথা প্রচলনের প্রায় এক বছর পরেই ইহার বিলুপ্তি ঘটানো হয়। এই বছরে ক্যাপ্টেন এলারটনের নেতৃত্বে একদল সৈন্য জয়ন্তিয়ার রাজধানী দখল করে।

তাঁতি সম্পর্কিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য নায়েবদের নিয়োগ

যে সমস্ত মোকদ্দমায় তাঁতীরা জড়িত ছিল, তা নিষ্পত্তির জন্যে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন আরঙে নায়েবদেরকে নিয়োগ করা হয় এবং রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যতীত, ১০০ টাকা পরিমাণ মোকদ্দমাগুলো নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা এদেরকে দেয়া হয়েছিল, এবং দশ টাকার নিম্নে সমস্তক্ষেত্রেই তাদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত।

মিঃ বারওয়েল, যিনি এই বছরেই সুপ্রিম কাউন্সিলে নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁর স্থলে প্রধান কর্মকর্তার পদে মিঃ বাউস নিযুক্তি লাভ করেন; আর বাণিজ্য সংক্রান্ত বিভাগে আসেন মিঃ গ্রুভার। এই বছরের শেষের দিকে বাংলার নায়েবে নাজিমরূপে মহাম্মদ রেজা খানের নিযুক্তির পর, কয়েদীদের

আহার্য জোগানোর জন্য জমিদারদের উপর আরোপিত কর বাতিল করা হয়। ঢাকা জেলে এসময়ে আটককৃত ১১০ জন কয়েদীর মধ্যে ৮৭ জন ছিল ডাকাত; ১৫ জন হত্যাজনিত কারণে এবং ৮ জন চুরির অপরাধে আটক ছিল। কাউন্সিল প্রধান কর্তৃক সভার একটি কার্যবিবরণীতে বর্ণিত হয়েছে যে, উপরোল্লিখিত সংখ্যার মধ্যে ৯৫ জন ছিল সড়ক নির্মাণ ও লোহার কাজে ব্যাপৃত "আদালতে যাদের অপরাধ কখনও প্রমাণিত হয়নি; এবং এদের অনেকে এরূপ অবস্থায় ন' বছর যাবৎ ছিল।" পুণ্যাহ বা জমিদারদের সঙ্গে বার্ষিক হিসাব নিকাশ নিষ্পত্তির দিনে প্রাদেশিক কাউন্সিল কর্তৃক পাওয়া নজরের অর্থকড়ি এ সময়ে ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকার রাস্তাঘাট সংস্কারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করা হয়েছিল।

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে রাজা ও কোম্পানীর আদালতের মধ্যে সংঘর্ষ

১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের প্রধান ঘটনা ছিল রাজা এবং কোম্পানীর আদালতের মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়, যা সম্ভবতঃ এখানকার ও ইংলণ্ডের ঊর্ধ্বতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মিঃ পিট এটর্নী, শরীফ ডিপুটি ও হাইকোর্টের একজন বিভাগীয় কর্তা—এই তিন যোগ্যতাবলে ঢাকায় বসবাস করছিলেন; তৎকর্তৃক প্রাদেশিক ফৌজদার সৈয়দ আলী খানের গৃহে ফৌজদারী আদালতের পেশকার জগন্নাথ নামের জনৈক ব্যক্তির উপর পরওয়ানাজারী করার সময়ে তাতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়; এবং দু' পক্ষের মধ্যে সংঘটিত ধ্বস্তাধ্বস্তির প্রাক্কালে দুর্ভাগ্যবশতঃ ফৌজদারের জনৈক আত্মীয় মীরহুসেন গুলিবিদ্ধ হন। কোন একটি মোকদ্দমা থেকে এই পরওয়ানা জারী করার প্রয়োজন দেখা দেয়, যাতে সামান্য অপরাধে জন্যে কিরো (Kyeroo) নামের জনৈক ব্যক্তিকে জগন্নাথ আটক রেখেছিল। অতঃপর, উক্ত আটককৃত ব্যক্তি পলায়ন করে কলকাতায় গমন করে এবং সেখানে সে অনাধিকার প্রবেশ ও অবৈধভাবে আটক রাখার জন্য জগন্নাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

ইংরেজদের নিকট ফরাসী ফ্যাক্টরী সমর্পণ

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে লেফটেন্যান্ট কাউইয়ের নিকট ফরাসী ফ্যাক্টরী সমর্পণ করে; এবং প্রাদেশিক কাউন্সিলের সেক্রেটারী মিঃ লণ্ডের

আদেশে মিলিশিয়ার একটি দল ত্রিপুরা জেলার যুগদিয়া (ঢাকা ফ্যাক্টরীর একটি শাখা) দখল করে নেয়। ঢাকায় তাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল ২৬টি বাড়ী এবং বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের একটি গঞ্জ বা বন্দর। তাদের অবশ্য তেজগাঁও এবং বাকেরগঞ্জেও বাড়ী ঘর ছিল।

মিঃ সেক্সপিয়ার ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে মিঃ রাসের স্থলাভিষিক্ত হন এবং মিঃ হলাণ্ড, হ্যাচ, লজ ও ডে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হন।

১৭৮১ সালে কাউন্সিল বাতিল

১৭৮১ সালে কাউন্সিল বাতিল করা হয়। মিঃ ডে কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়, এবং এর প্রথম জজ্ ছিলেন মিঃ ডানকানসন। ফৌজদার ও থানাদারদেরকে ডেকে পাঠানো হয় এবং জজ ডাকাতদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য পরিচালনা করেন। এই বছরেই ওলন্দাজ (Dutch) ফ্যাক্টরীর দখল নিয়ে নেয়া হয়। ১৭৮৩ সালে মিলিশিয়া ভেঙ্গে দিয়ে তদস্থলে সিবন্দী বা প্রাদেশিক সৈন্যদল গঠন করা হয়। ওলন্দাজদের সম্পত্তি বলতে শহরে ৩১টি এবং তেজগাঁয়ে একটি বাড়ী ছিল।

১৭৮১ থেকে ১৮৩৯ সাল পর্যন্ত উন্‌ষাটজন সিভিল সার্ভেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য পরিচালনা করেন, কিন্তু এদের মধ্যে ত্রিশ জনই কেবলমাত্র সাময়িক ভাবে উক্ত পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং প্রতিজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের গড় পড়তা মেয়াদ দু' বছরের। দীর্ঘতম কার্য কালের মেয়াদ ছিল চার বছর সাতাশ দিন। ঐ একই সময়ের জন্য কলেক্টরদের সংখ্যা ছিল সাঁয়ত্রিশ জন। এদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন সাময়িকভাবে নিযুক্ত কলেক্টর। সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ব্যাপী যিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন, তিনি একজন স্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তার কার্যকাল ছিল ছ' বছর পঁয়তাল্লিশ দিন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বৈধ কর্তৃত্বের সীমা

ম্যাজিষ্ট্রেটের বৈধ কর্তৃত্ব ২০টি থানা বা পুলিশ জেলায় বিভক্ত; এর মধ্যে ১০টি শহরে এবং বাদবাকি ১০টি মফঃস্বলে। এই জিলায় নিয়োজিত চৌকিদারদের সংখ্যা হলো ২,৬১৯ জন; ৯০ জন বরকন্দাজ ও ১০ জন জমাদার ছাড়াও চৌকিদারদের ১৮৯ জন এই শহরেই কার্যরত আছে।

ঢাকা ও ফরিদপুরের বেসামরিক বিচার বিভাগ-ভুক্ত এলাকার পরিধি হলো ৪,৮০০ মাইল। এর সঙ্গে সংযুক্ত প্রধান প্রধান-কর্মচারীরা হচ্ছেন ১জন সিভিল ও সেসন জজ, ২ জন প্রধান সদর আমিন, ১ জন অতিরিক্ত সদর আমিন ও ৯ জন মুন্সিফ। মোট বার্ষিক খরচের পরিমাণ ৭৭,৭৪১ টাকা ১১ আনা ৯ পয়সা। ১৭৯৬-৯৭ সালে দলিল পত্র রেজিষ্ট্রিকরণ থেকে ১,৭৭০ টাকা আয় হয়। বর্তমানে এ থেকে বছরে প্রায় ৪৫০ টাকা আসে।

কালেক্টরের অফিস

কলেক্টরের অফিস—সাতটি ছোট ছোট বিভাগ যেমন, ট্রেজারী, দেওয়ানী, শেরেস্তাখানা, মুন্সীখানা, নেজারত, রেকর্ড অফিস, আকবরী ও ষ্ট্যাম্প অফিস ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। কলেক্টর ও ৩ জন ডিপুটি বাদে এতে কর্ম-নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ৯৩। মোট মাসিক খরচ হয় ৪,০৯৯ টাকা ১০ আনা ৫ পয়সা।

অষ্টম অধ্যায়

[অধিবাসী : হিন্দু—মুসলমান—খ্রীস্টান]

জন সংখ্যা

এই জেলার জনসংখ্যা কখনও সঠিকভাবে নির্ণীত হয়নি। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে কালেক্টর মিঃ ডগলাসের একটি হিসেব অনুসারে সংযুক্ত ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৯,৩৮,৭১২ জন। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩,০৭,১৪৪; এবং স্ত্রীলোকদের সংখ্যা ৩,১০,৬০৮ এবং পুরুষ-শিশুদের সংখ্যা ১,৭৫,৭৫২ ও স্ত্রী-শিশুদের সংখ্যা ১,৪৫,২০৮ জন। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কেবলমাত্র এই জেলার জনসংখ্যা হিসেব করেন ৫,১২,৩৮৫। অন্যদিকে, ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে ম্যাজিস্ট্রেটের দারোগাদের সরকারী বিবরণ অনুযায়ী ঢাকা শহরের অধিবাসীসহ জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৪,০৩,৬৩৯ জন। নিঃসন্দেহে, পরবর্তী এই হিসেবে প্রকৃত জনসংখ্যা অপেক্ষা কম দেখানো হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এ দুটোর মধ্যে পূর্বোক্তটি হচ্ছে বর্তমান সময়ের অধিবাসীগণের প্রায় নিকটতম সংখ্যা। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্রাণ্টের সহায়তায় আমি ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে এ জেলার আদমশুমারী শুরু করি, কিন্তু আমি আমার কার্যস্থল পরিত্যাগের পূর্বে মাত্র ২৫টি গ্রামের বিবরণ পেয়েছিলাম। আমি উল্লেখ করতে পারি যে, এই ২৫টি গ্রামে বাড়ির সংখ্যা ছিল ৮৩৩ এবং জনসংখ্যা ছিল ৫,১৫২। ফলে, গৃহ প্রতি লোক সংখ্যার অনুপাত ছিল ৬১/৪। অত্যন্ত জনবহুল থানাগুলোর একটিতে এই গণনা কর্ম পরিচালনা করায়, এর অনুপাত এতবেশী উচ্চে ছিল যে, এটাকে একটি গড় হিসেবে সাধারণভাবে সমগ্র জেলার জন্যে গ্রহণ করা যায় না। একই সময়ে পরিচালিত শহরের অন্য একটি আদমশুমারী অনুসারে, গৃহপ্রতি লোকসংখ্যার অনুপাত তিনের অধিক ছিল না। অতএব, ৪১/২ গড় অনুমান করে এবং ১৮২৪ সনে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাড়ির সংখ্যা ১,০২,৪৭৭ হিসেব করে, জেলার মোট জনসংখ্যা হয় ৪,৬১,১৪৬ জন।

ঢাকা শহরের লোকসংখ্যা

শহরতলীর গ্রামগুলো বাদে একমাত্র শহরের লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৬০,৬১৭ ; যথা,

	হিন্দু	মুসলমান
পুরুষ… …	১৫,৭৩৫ … …	১৫,৬৮৭
স্ত্রী … …	১২,৪১৯ … …	১৬,৭৭৬
	২৮,১৫৪	৩২,৪৬৩

এই জনসংখ্যার মধ্যে ১৭,৬৭৫ জনের বয়স ছিল ১৫ বছরের নিম্নে। শহরতলীর গ্রামগুলোতে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল ৭,৬৮৯।

এক বছরে বিবাহ, জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

লোকসংখ্যা	বিবাহ	জন্ম	মৃত্যু
৬০,৬১৭	৩৭০	৬২৮	৫৪১

এই গণনা থেকে অনুমান করা গেছে যে, শহরের বার্ষিক মৃত্যুর অনুপাত হচ্ছে প্রতি ১,১২০ জনে প্রায় একজন। এখন পর্যন্ত শহরের ইউরোপীয় অধিবাসীদের লোকসংখ্যার কোনরূপ গণনা না হওয়ায়, গির্জার নাম-তালিকাগুলো থেকে তাদের মধ্যে মৃত্যুর সঠিক কোন অনুপাতই নিরূপণ করা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রোটেস্টাণ্ট সমাধি ভূমিতে ৪৫০টি কবর আছে, এবং এই সমাধি ভূমি অন্ততঃ পক্ষে ১১৪ বছরের পুরানো। সেখানে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দের তারিখ যুক্ত একটি স্মৃতিসৌধ বিদ্যমান আছে। এটা হচ্ছে বছরে চারটি করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানের হার। কিন্তু যেহেতু ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ঢাকায় বৃটিশ অধিবাসীদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে উল্লেখিত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়নি, সেহেতু আমরা অনুমান করতে পারি যে, বিগত ৭০ বছরের অনুপাত উপরিউক্ত হার অপেক্ষা বেশ কিছু উর্ধ্বে ছিল। ১৮২৮ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত রেজিমেণ্টাল হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা ধরে মৃত্যুর অনুপাত দাঁড়ায় প্রতি ৩৮·২৪ জনে একজন ; এতে শতকরা অনুপাত হয় ২·৬৩। ১৮৩৩ সনে মিঃ হাচিনসনের গণনা অনুসারে জেলার কয়েদীদের মধ্যে মৃত্যুর হার অপেক্ষা এই অনুপাত অর্ধেক। ঐ বছরের জন্য তাদের মধ্যে মৃত্যুর

সাধারণ হার ছিল শতকরা ৪·৬৫। ১৮০১ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত উভয় সালসহ ভাওয়ালে রোমান ক্যাথলিক গির্জায় তালিকাভুক্ত বিবাহ, খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ ও অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ার বা সমাধিস্থ করার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

ভাওয়াল

নিরূপিত

মোট লোকসংখ্যার মোটামুটি হিসাব	বিবাহ	খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত	অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি
৫,০০০	৯৩৮	৩,২০৮	২,৭১৮

হাসানাবাদ

১৮১৮ থেকে ১৮৩৭ উভয় সাল সহ ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী হাসানাবাদের রোমাণ ক্যাথলিক গির্জার তালিকা থেকে নিম্নের সংখ্যা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

৫,০০০... ... ...৫৪৫... ... ...২,১৪৮·· ...১,০৬২

খ্রীস্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্তদের তুলনায় বিবাহের অনুপাত হচ্ছে ভাওয়ালে প্রতি ৩·৪২-এ ১ জন এবং হাসানাবাদে ৩·৯৪ এর অনুপাতে ১ জন। দীর্ঘজীবিদের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শহরে তিনজন লোক আছেন, যথা দু'জন হিন্দু এবং একজন মুসলমান। এদের প্রত্যেকের বয়স ১০০ বছরের উর্ধ্বে বলে কথিত হয়ে থাকে। এছাড়া, আরো কিছু লোক রয়েছে যাদের বয়স ৮০ বছরের উর্ধ্বে। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকদের উক্তির উপর অবশ্য খুব বেশী নির্ভর করা যায়না। এ বিষয়ের উপর অতিরঞ্জনের দৃষ্টান্তস্বরূপ পর্তুগীজদের বিবরণ থেকে নিম্নের বর্ণনা উদ্ধৃত করা গেল ঃ "তিন শ' বছর বয়স্ক বলে কথিত মূর নামীয় জনৈক ব্যক্তি তার অত্যধিক বয়সের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় মৃত্যুবরণ করেন। এবং এই সময়ের ৬০ বছর পূর্বে 'নান্না ডি কন্না' দিউ দখল করেছিলেন। এটা উল্লেখিত আছে যে, দু'শ' বছর কিম্বা তার নিকটবর্তী বয়সের লোক এইস্থানে আছেন; কিন্তু আমরা মাত্র একজন স্ত্রীলোককে পেয়েছিলাম যার বয়স ১০০ বছর ছিল। এই স্ত্রীলোকটি একের পর এক পূর্ববর্তী সাতজন স্বামীর মৃত্যুর পর, উক্ত বছরে বিবাহ করেছিলেন।"

হিন্দু সম্প্রদায়

জেলার দক্ষিণাংশে এই সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে এই মর্মে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, আদিশূর যখন দেখতে পেলেন যে, দেশের আদিব্রাহ্মণ সম্প্রদায় নিম্নবর্ণের পেশায় নিয়োজিত এবং তাঁর অভিপ্রেত কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে অক্ষম, তখন তিনি তাদেরকে বিক্রমপুর থেকে নির্বাসিত করেন এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশের কনৌজ শহর থেকে পাঁচজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণকে তাঁর রাজ্যে আমন্ত্রণ করে আনেন।

আদিশূর কর্তৃক আমন্ত্রিত কনৌজের ব্রাহ্মণ

সাণ্ডিল্লো, কাশ্যপ, বাৎসপ, ভরদ্বাজ ও সুবর্ন নামের ব্যক্তিগণ তাদের পুত্র সন্তান ও পরিবার পরিজন সমেত এই জেলায় আগমন করেছিলেন বলে জানা যায়। এদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫৯। কতকগুলো গ্রাম ও ভূখণ্ড বাংলার বিভিন্ন অংশে তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে নির্দিষ্ট করা ছিল। তদানুসারে পরবর্তীকালে তাদের বংশধরগণ তাদের জেলার নামানু-সারে পরিচিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়ে যান। জনশ্রুতি অনুসারে বল্লাল সেনের রাজবংশ আদিশূরের উত্তরাধিকারী ছিল এবং এই বল্লাল সেনই নিম্নবর্ণের মধ্যে বর্তমানের যে শ্রেণী বিন্যাস বিদ্যমান, তা' সম্পন্ন করে যান।

ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী

ব্রাহ্মণদেরকে তিনি রাঢ়ী, বরেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। এসব শ্রেণীর প্রথমোক্তটিকে তিনি পুনরায় কুলীন ও শ্রোত্রীয় এ দুটো আলাদা বর্ণে বিভক্ত করেন। আবার দ্বিতীয়টি বা বরেন্দ্র শ্রেণীকেও তিনি কুলীন ও কাশ্যপ এ'দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। রাঢ়ী কুলীন বা দেশের এঅঞ্চলের অভিজাত ব্রাহ্মণগণ আদিতে কনৌজ ব্রাহ্মণদের বাইশ পরিবার নিয়ে গঠিত ছিল। এটি আবার কুলীন ও গাঁও কুলীন পদবী দ্বারা বিভক্ত হয়ে দুটো পৃথক শ্রেণীতে পরিণত হয়। অন্যদিকে সাইত্রিশটি পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত শ্রোত্রীয়গণ সাধু, সিদ্ধ, সুসিদ্ধ ও দূরী ইত্যাদি চার শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

একজন রাঢ়ী কুলীন তার কৌলিন্য না হারিয়েই চারজন পর্যন্ত স্ত্রী গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। এসব স্ত্রীদের অন্তত একজনকে অবশ্যই শ্রোত্রীয়ের কন্যা হতে হয়, কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তিনি তার নিজ গোত্রের কুলীন কন্যাদের মধ্য থেকে বাছাই করতে পারতেন। এই সংখ্যার অধিক যদি কেউ বিয়ে করেন তাহলে তিনি তার বিশুদ্ধ কৌলিন্য থেকে বঞ্চিত হন এবং "স্কৃত ভঙ্গ" বা ভাঙ্গাবর্ণ কুলীনে পরিণত হন। এরা আরো ক্ষতিগ্রস্থ কিম্বা আরো বর্ণচ্যুতি না ঘটিয়ে, সেই সমস্ত লোকদের অনির্দিষ্ট সংখ্যক কন্যা বিয়ে করতে পারেন—যারা তার মতই তাদের কিম্বা তাদের বংশধরদের কৌলিন্য হারিয়েছেন। বল্লাল সেনের সময় থেকে একে অন্যের সঙ্গে কিম্বা উচ্চতর বর্ণে অসবর্ণ বিবাহের মাধ্যমে পরবর্তীদের বা "স্কৃত-ভঙ্গ" কুলীনদের বংশধরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচুর। এরা বর্তমানে "বংশজ" নামে অভিহিত হয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন। অনুরূপভাবে বর্তমানের রাঢ়ী কুলীন সম্প্রদায়ও যথাক্রমে কুলীন, শ্রোত্রীয় ও বংশজ এই তিন শ্রেণী নিয়ে গঠিত। একইভাবে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণগণও কুলীন, কাশ্যপ ও বংশজ এ তিনশ্রেণীতে বিভক্ত। একজন কুলীন যখন বংশজের কন্যা বিয়ে করেন, তখন তিনি তার বর্তমান স্ত্রীদের সংখ্যার অনুপাতে পণের অর্থ গ্রহণ করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যদি তিনি তার প্রথম বংশজ স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে ১,৫০০ টাকা পণ পান, তাহলে সম্ভবতঃ তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ের সময়ে পাবেন ১,৪০০ টাকা। এই টাকার পরিমাণ ৪০ থেকে ৩০ টাকায় নেমে না আসা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেকটি পরবর্তী বিয়েতে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। তিনি মনে করেন যে, একজন বংশজ ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণপূর্বক তিনি তাকে উচ্চ সম্মান প্রদান করে থাকেন; সুতরাং তিনি তার স্ত্রীপুত্র কন্যাদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব তার শ্বশুরের উপর ছেড়ে দেন। এ ধরনের বৈবাহিক সম্বন্ধের দ্বারা একমাত্র আর্থিক দায়িত্ব—যা' একজন কুলীন পালন করে থাকেন—তা' হচ্ছে তার কন্যাদের জন্য বিয়ের বন্দোবস্ত করা। একমাত্র পুরুষ শিশু সন্তানই পিতার কৌলিন্য লাভ করে থাকে। অতএব, বিয়ের ব্যাপারে শ্রোত্রীয় ও বংশজ যুবকদের প্রলুব্ধ করার মত অর্থ সম্পদ অবশ্যই কন্যাদের থাকতে হয়। কুলীনদের মধ্যে অবশ্য খুব কম ব্যক্তিই আছেন যারা কন্যাদের বিয়েতে যৌতুক দেবার মত ধনসম্পদের অধিকারী। এর ফলে বংশজ স্ত্রীদের গর্ভজাত কুলীন কন্যাদের বেশীর ভাগই নিঃসঙ্গ বা অবিবাহিতা থেকে যায়।

এ জেলার অধিকাংশ কুলীনই 'সুকৃত-ভঙ্গ' বর্ণের অন্তর্ভুক্ত, এবং এদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের মাত্র ৫০ জন পর্যন্ত স্ত্রী রয়েছে। যে সকল জেলায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশী সেই সকল স্থান অপেক্ষা এখানে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন কিছুটা কম। এর মূল কারণ হচ্ছে এই যে, এই জেলাতে ঘটকের সংখ্যাধিক্য। ঘটকের সংখ্যাধিক্যের দরুন, বিয়েতে বিরাট খরচপত্রের প্রয়োজন পড়ে। এইসব ঘটকদের সকলেই কুলীনের বিয়েশাদির সময়ে প্রদত্ত দর্শনী লাভের অধিকারী। এরা "মূলগোত্র" নামে অভিহিত কুলজী বা বংশ বিবরণের একটি তালিকা সংরক্ষণ করে থাকেন। এতে এই দেশের প্রত্যেক কুলীন পরিবারের বংশ-বিবরণ বল্লাল সেনের সময় থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে। এ কারণেই বিয়ে শাদির চুক্তিপত্র করার পূর্বে উভয়-পক্ষ তাদের নিকট থেকে সর্বদা পরামর্শ নিয়ে থাকেন। ঘটকদের প্রায় সকলেই বংশজ ব্রাহ্মণ। বিয়ে শাদি তালিকাভুক্ত করা ছাড়া এরা আর কোন পেশা অবলম্বন করেন না। এদের ৭৫০' টিরও অধিক পরিবার বিক্রমপুরে বিদ্যমান আছে। ছোট ছোট সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র এরাই এসব তালিকাসমূহ সংরক্ষণ করে থাকেন এবং গোত্রপ্রধানদের সকলেই বিবাহের সময়ে পারিতোষিক দাবী করে থাকেন। এরা কুলীনের বিবাহ উৎসবে খুব কমই অনুপস্থিত থাকেন এবং কষ্ট করে হলেও তাতে যোগদান করেন। ঘটক একজন বিশুদ্ধ কুলীনের নিকট থেকে তার বিয়ের দু' বছরের মধ্যে ইচ্ছা মাফিক যে কোন সময়ে উপস্থিত হয়ে পারিতোষিক আদায় করতে পারেন। কিন্তু কেবলমাত্র "সুকৃত-ভঙ্গ" কুলীনের ক্ষেত্রেই তিনি বিবাহ-উৎসবে বকশিশ দাবী করতে পারেন। একজন পণ্ডিত ঘটকের সম্পত্তি অনুসারে সর্বদা দানের পরিমাণ নিরূপিত হয়ে থাকে।

ব্রাহ্মণ

বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রথমে কনৌজ ব্রাহ্মণদের পঞ্চগোত্রের পুরোহিত বা বেদ-পাঠক ছিলেন। কনৌজীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গেই এরা এই জেলায় আগমন করেছিলেন। বাঙলার আদি ব্রাহ্মণগণ তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালনে তাদের অজ্ঞতার দরুন, আদিশূর কর্তৃক নির্বাসিত হন। কথিত আছে যে, বৈদিকগণও অনুরূপ কারণে বল্লাল সেন কর্তৃক কুলীন, শ্রোত্রীয় ও কাশ্যপ-গোত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদেরকে বল্লাল সেনই

উল্লেখিত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করে যান। সাধারণতঃ ঘটকগণ কর্তৃক বিবৃত এই হচ্ছে তাদের ইতিহাস। কিন্তু বৈদিকগণ নিজেরা জোরেশোরে বল্লাল সেনের বর্ণবিন্যাসের অধিকারের বিরুদ্ধাচারণ করে থাকেন এবং তাদের স্বগোত্রীয়দের উপর আরোপিত পদবীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে তারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বিক্রমপুরে বৈদিকদের সংখ্যা প্রচুর। প্রধানতঃ এঁরাই পণ্ডিত ও জ্যোতিষী। একই গোত্রভুক্ত হওয়ার দরুন, বর্ণের রীতিনীতি ও প্রথাপদ্ধতির দ্বারা তারা অপেক্ষাকৃত কম আবদ্ধ এবং তাদের কন্যা-সন্তানদের বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা তাদের অপেক্ষা কম ভাগ্যবান রাঢ়ী ও বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের উপর আরোপিত আর্থিক বাধা-নিষেধগুলোর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর অধীন নন।

দেশের আদি বা নির্বাসিত ব্রাহ্মণগণ ৭০০ ঘর বা পরিবারের সমন্বয়ে গঠিত ছিলেন বলে 'সাত-শতী' নামে অভিহিত হতেন। নির্বাসনের পর এদের অধিকাংশই ব্রহ্মপুত্রের উত্তর দিকে গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন, কিন্তু অনেকে আবার প্রদেশের সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়েন। বল্লাল সেনের পরবর্তী সময়ে এঁরা রাঢ়ী কুলীনদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাদের পুত্র সন্তানদের বিবাহ দেন। ত্রিপুরা, সিলেট ও ময়মনসিংহে এখনও তাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক বিদ্যমান আছে, এবং আমার বিশ্বাস, প্রদেশের প্রত্যেক বড় গ্রামে তাদের একটি বা দু'টি পরিবারের সন্ধান মেলে। এ জেলায় বরেন্দ্র ব্রাহ্মণদের সংখ্যা খুব কম।

বৈদ্য শ্রেণী

ব্রাহ্মণদের পরেই বৈদ্য শ্রেণীর স্থান। যারা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকেন এবং শূদ্রদের সঙ্গে সকল রকম সম্পর্ক বা আত্মীয়তা বর্জন করে চলেন। এদের থেকে তাদের উদ্ভব হয়েছে বলে কথিত আছে। সম্ভবতঃ এই সম্প্রদায় তাদের উচ্চতর মর্যাদার জন্য বল্লাল সেনের নিকট ঋণী, যিনি নিজে এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এবং যিনি অন্য বর্ণগুলোর পুনর্বিন্যাস করার সময়, স্বীয় বর্ণকে হিন্দু সমাজের শ্রেণীগুলোর মধ্যে বর্তমান পদমর্যাদায় উন্নীত করে যান। ঢাকা প্রদেশের দেওয়ান ও সহকারী নায়েব রাজা রাজবল্লভ প্রায় ১০০ বছর পূর্বে এই সম্প্রদায়ের জন্য পৈতাদান অনুষ্ঠানের অধিকার অর্জন করেন। এই

উদ্দেশ্যে তিনি রাজনগরে তার গৃহে নদীয়া ও বেনারসের প্রায় সকল বিদ্বান ও প্রভাবশালী পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন এবং এ উপলক্ষে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ব্যয় করেন। অবশ্য কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণের পৈতার তিন গুচ্ছ সুতোর বদলে, বৈদ্যদের পৈতা মাত্র দু'গুচ্ছ নিয়ে গঠিত। বৈদ্যগণ এ জেলায় হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবস্থাশালী সমাজ। তারাই প্রধানতঃ তালুকদার, দেওয়ান ও চিকিৎসাবিদ্।

কায়স্থ সম্প্রদায়

কায়স্থ শ্রেণীকে এখানে শূদ্রদের বংশোদ্ভূত বলে গণ্য করা হয়, যদিও তারা নিজেদের জন্য উচ্চতর বংশ মর্যাদা দাবী করেন। ব্রাহ্মণদের ন্যায়, এরাও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; এবং কুলীন, মুলী ও ভট্টাচার্য ইত্যাদি নামে পরিচিত। রাঢ়ীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক এদেরও ঘটক রয়েছে, যারা বংশ বিবরণ বা ঠিকুজীর তালিকা সংরক্ষণ করেন। এদের অর্থাৎ বৈদ্য শ্রেণীর অধিকাংশই এটর্নী, উকিল, লেখক, হিসেব রক্ষক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে পল্লী অঞ্চলে এবং শহরের বিভিন্ন আদালতে জমিদারগণ কর্তৃক কর্মে নিয়োজিত আছেন। ভট্টাচার্য (Bhatatur.s) বা অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর স্থানীয় লোকেরা স্থানীয় পরিবারগুলোতে পাচক, চাকর ইত্যাদি রূপে কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং অনেকে ময়রা ও শহরে চাল, লবণ ও ঘি প্রভৃতি দ্রব্যের খুচরো-বিক্রেতা হিসেবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে।

শূদ্র

শূদ্রগণ নয়টি বিশুদ্ধ বর্ণ বা বল্লাল সেনের নব সাখ নিয়ে গঠিত। এদের মধ্যে তাঁতি বা বয়ন-শিল্পীর সংখ্যা এ জেলায় প্রচুর। এরা ঝাপানিয়া ও ছোট ভাগিয়া নামে দু'ভাগে বিভক্ত। এরা একে অন্যের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া কিম্বা কোন রকম বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না। পূর্বোক্তদের বিয়ের মিছিলে পাল্কির পরিবর্তে ঝাঁপা বা এক প্রকার আসনে করে কনেকে বহন করার অদ্ভুত প্রথা থেকে তাদের এই পদবীর উদ্ভব হয়েছে। শহরে ও গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় এদের সংখ্যা অনেক। পরবর্তী বা ছোটভাগিয়া সম্প্রদায় প্রথমে কায়েত ছিল এবং তন্তুবায়ের পেশা অবলম্বন করার দরুন, তারা কায়স্থ সম্প্রদায় কর্তৃক গোত্র থেকে বহিষ্কৃত হয়। সমগ্র জেলায় এরা ছড়িয়ে আছে, এবং শহরে তাদের মোট গৃহের সংখ্যা পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে নয়।

শাঁখারী

শাঁখারী বা শঙ্খের কাজে নিযুক্ত লোকেরা সম্পদ ও সংখ্যার দিক থেকে তাঁতিদের পরেই স্থান পায়। এরা সকলে একই বাজারে দু ধারে বসবাস করে; সেখানে তারা শহর পত্তনের সময়েই বসতি স্থাপন করেছিল। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী ও কর্মঠ জাতি, এবং অত্যন্ত ধনী হওয়ার মত গুণ তাদের আছে, কিন্তু তারা মাত্রাতিরিক্ত কৃপণ। স্থানীয় সাধারণ লোকদের চেয়ে তাদের বেশীর ভাগই অপেক্ষাকৃত অধিক সুন্দর চেহারার অধিকারী। এদের কোন কোন পরিবারে কিছু সংখ্যক আলবেনীয় অধিবাসী বসবাস করে।

কামার

কামার বা লোহার কারিগররা শহরের কর্মকারদের মধ্যে একটি সংখ্যাবহুল শ্রেণী। কিন্তু তাদের অধিকাংশই স্বর্ণকার ও রৌপ্যকাররূপে কার্যরত। বল্লাল সেনের সময়ে এদেশে বিক্রমপুরেই সর্বপ্রথম ধাতু সংমিশ্রণ শিল্পের সূচনা হয় বলে কথিত আছে। ভাল কারিগর হিসেবে ঢাকার কাঁসারি ও তাম্রকারগণের বিশেষ খ্যাতি আছে এবং ছোট ছোট বাক্স পেঁটরা ও হুক্কাদণ্ড তৈরীর কাজে তারা বেশ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকে। এদের অধিকাংশই ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী।

কুমার

কুম্ভকারগণ শহরতলীতে তাদের ব্যবসায়ে নিয়োজিত আছে। সেখানে তারা হস্তচালিত যন্ত্রে খেলনা ও মাটির দ্রব্যাদি নির্মাণ করে। খোট্টা-কুমার নামে অভিহিত পশ্চিম দেশীয় লোকেরা ঢাকার সাহায্যে রান্না-বান্নার বাসনকোসন তৈরী করে। আর যে সমস্ত কারিগররা পুতুল ইত্যাদি বানায় তারা কৃষ্ণনগরের অধিবাসী। এরা সাধারণতঃ অন্যান্য কুম্ভকার কর্তৃক অর্জিত অর্থের প্রায় তিনগুণ বেশী উপার্জন করে থাকে।

সদ্‌গোপ গোয়ালা

সদ্‌গোপ গোয়ালারা শহরে সংখ্যায় প্রচুর। তারা গ্রামের প্রজাদের কাছ থেকে দুধ ক্রয় করে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে গাইগরু রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। আহিরু গোয়ালা নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর সংখ্যা দেশের এ অঞ্চলে খুব বেশী নয়। এই শ্রেণীর অল্প কিছু সংখ্যক লোক, যারা শহরে বসবাস করে,

তারা দেশওয়ালী গাইগরু পালন করে থাকে। এর থেকে তারা ঘৃত ইত্যাদি বিক্রয় করে। এই গোত্রের কিছু লোক আবার গরুর চিকিৎসক হিসেবে মাঝে মাঝে পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহ ভ্রমণ করে। এরা সাধারণত শীত ঋতুর শুরুতে বের হয়ে পড়ে। রায়তদের গরু মহিষাদির মচকানি, ঘা' ও বাতরোগ ইত্যাদি উপশমের জন্য তাদের চিকিৎসা কার্যের খুব প্রয়োজন দেখা দেয়। এদের অবলম্বিত প্রধান প্রতিকারমূলক পন্থা হচ্ছে আকুপাঙ্কচার (acupuncture) বা ক্ষতস্থানে উত্তপ্ত লৌহশলাকা দিয়ে পোড়ানো।

মালাকার

মালাকার শ্রেণী সাধারণতঃ মালী, এবং বিয়ের শোভা যাত্রার জন্য মুকুট, মাল্য ও কৃত্রিম পুষ্প-প্রস্তুতকারী লোকদের নিয়ে গঠিত। শেষোক্তরা আতশ বাজিও তৈরী করে। সাধারণত এই জাতীয় প্রচুর কাজ হাতে থাকলে মুসলমান বাজিকরগণও নিজেদের সাহায্যার্থে এদের নিয়োগ করে থাকে। বিয়ের সাজসজ্জা প্রস্তুতকরণের ব্যবসা মালাকারদের কয়েকটি পরিবারের হাতে একচেটিয়া। এরা স্মরণাতীত কাল থেকে এ শহরে বসবাস করে আসছে। এদের দ্বারা শহরটি কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত এবং এই একই ব্যবসায়ে নিয়োজিত অনধিকার প্রবেশকারী ব্যক্তিদের বহিষ্করণের নিমিত্ত এসকল জায়গায় তারা তাদের নিজেদের পণ্যদ্রব্য সরবরাহ করে থাকে।

নাপিত সম্প্রদায়

নাপিত শ্রেণীর প্রায় সকলেই ত্রিপুরা জেলা থেকে এসে থাকে, এবং শল্য-চিকিৎসক ও ক্ষৌরকর্মকারী রূপে তাদের ব্যবসা কার্য চালায়। নয়টি বিশুদ্ধ গোত্রের শেষোক্ত বারুইগোত্রের তাম্বলীদের ব্যবসায় অনধিকার প্রবেশ করে পান ও সুপারির চাষাবাদ করে এবং খুচরো বিক্রেতা হিসেবে ব্যবসা চালায়। নানান ধরনের পেশা ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত অসংখ্য লোক অবিশুদ্ধরূপে গণ্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এরা এ জেলার হিন্দু মুসলমান শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ।

গণক বা আচার্য ব্রাহ্মণ

গণক বা 'আচার্যরা' (Assagee) হচ্ছে অধঃপতিত ব্রাহ্মণ। এরা প্রতিমা নির্মাণ, এবং এর চিত্রাঙ্কণ ও সজ্জিতকরণের কাজে নিযুক্ত আছে। এরা বিক্রম-

পুরের পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক প্রস্তুত পঞ্জিকাদি নকল করে। তারা জ্যোতিষী ও ভাগ্য গণনাকারী। চুরি উদ্ঘাটনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এদের দক্ষতার বিশেষ চাহিদা আছে। এরা সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদেরকে দিয়ে চাল চিবিয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে বাধ্য করে থাকে।

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ

শ্রাদ্ধ ইত্যাদিতে প্রদত্ত প্রথমদান গ্রহণকারীদেরকে অগ্রদানী ব্রাহ্মণরূপে অভিহিত করা হয়। এদেরকে পূর্ববর্তী সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিক অবিশুদ্ধ ও অধঃপতিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। এই জেলায় বসবাসকারী কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ শবদাহকার্যে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান পূর্বক তাদের জীবিকা অর্জন করে। সাধারণত এদেরকে দান-করা জিনিসপত্রের মধ্যে থাকে খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, কাপড়-চোপড়, ছোট্ট এক টুক্‌রা স্বর্ণ বা রৌপ্য ইত্যাদি। কিন্তু এ সকল দান গ্রহণের পূর্বে, এদেরকে মৃতের প্রতি উৎসর্গীকৃত সিদ্ধ "চাল পাতরাণের" কিছুটা অংশ গ্রহণ করতে হয়।

সুবর্ণ বণিক

সুবর্ণ বণিক সম্প্রদায় শহরের অধিকাংশ পোদ্দার, এবং যারা বিলেতী দ্রব্যাদি বিক্রির জন্যে দোকানপাট চালায় তাদের নিয়ে গঠিত। এরা কাপড়, মূল্যবান পাথর ইত্যাদির ব্যবসায় নিয়োজিত আছে।

সৌন্দুক বা সাউলোক

সৌন্দুক বা সাউলোকগণ দু'ভাগে বিভক্ত। যথাঃ বরেন্দ্র সাউ ও রাঢ়ী সাউ। বরেন্দ্র সাউরা খাদ্যশস্য, লবণ, চিনি, সুপারি ইত্যাদির ব্যবসা করে, এবং গ্রামাঞ্চলে দোকান চালায়; অন্যদিকে, রাঢ়ী সাউরা হচ্ছে মাদকদ্রব্যের চোলাইকারী। এদের কেউ কেউ বেশ ধনী এবং প্রতিবেশী অঞ্চলে এদের জমিদারী আছে।

কাপালিক সম্প্রদায়

কাপালিকগণ চটের কাপড় বোনে এবং দড়ি, পাকানো সুতো ও থলে ইত্যাদি তৈরী করে থাকে। এদের অনেকে আবার গরুর গাড়ির গাড়োয়ান হিসেবেও কাজ করে।

পাটিয়াল

পাটিয়ালরা শীতল পাটি বা সুন্দর সুন্দর মাদুর তৈরী করে থাকে। স্থানীয় লোকেরা এসব পাটির উপর শোয়। পুরুষ ও রমণী উভয়েই পাটি তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকে।

পাটনী

পাটনীরা হচ্ছে খেয়া নৌকার মাঝি। যখন খেয়াঘাটে তাদের কাজ বন্ধ থাকে তখন এরা ঝুড়ি বা চুপড়ি ইত্যাদি বানায় এবং গ্রাম্য হাটে মাছ ক্রয় বিক্রয়ের কাজে ও নিযুক্ত থাকে।

কৈবর্ত

কৈবর্তগণ দুটো স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা চাষা কৈবর্ত অর্থাৎ চাষী লোক এবং জেলে-কৈবর্ত বা জেলে। জেলেরা দেশের এ অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল মাঝি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

তাম্বলী সম্প্রদায়

'তাম্বুলী' পদবী এই শ্রেণীর নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও তারা শুধু পান-সুপারি বিক্রির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং বরেন্দ্র সাউদের ন্যায়, তেপাল্লির ব্যবসা অনুসরণ করে এবং শহরে তৈল, খাদ্য শস্য, লবণ ইত্যাদি বহু জিনিসের ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকে।

গন্ধ বনিক

গন্ধ বণিক বা নানাবিধ মশলা দ্রব্য ও ওষুধপত্রের খুচরা-বিক্রেতাগণের বসতি প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে। ধোপী বা ধোপা সম্প্রদায় সোনারগাঁও ও ডেমরা শহরে বসবাস করে এবং সেখানকার বণিকদের মসলিন বস্ত্রাদি ধোয়ার কাজে নিযুক্ত থাকে। গ্রামাঞ্চলে ধোপারা অপেক্ষাকৃত ধনী দেশীয় পরিবারগুলোর দ্বারা ধোয়ার কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। খাদ্য শস্যে এবং নগদ অর্থে এদের পারিশ্রমিক দেয়া হয়। কোম্পানী কর্তৃক এদেশে ব্যবসা আরম্ভ করার প্রাক্কালে, এই শ্রেণীর মধ্যে বার্ষিক প্রায় তিনলক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। তৎকালে ফ্যাক্টরীতে নিযুক্ত এদের কিছু সংখ্যক পরিবার এখনও

শহরাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ-সম্পদের অধিকারী। সুতার বা সুতার মিস্ত্রীদের সংখ্যাও প্রচুর। এরা প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে কাঠ কাটা, করাত দিয়ে কাঠ চেরাই, নৌকাদি নির্মাণ ও লাঙ্গল তৈরীর কাজে নিযুক্ত থাকে।

ডোম ও অন্যান্য সম্প্রদায়

ডোম বা শবদাহকারীরা সাধারণত শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তারা শূকর পালন করে, ঝুড়ি ইত্যাদি তৈরী করে, এবং এদেরকে কুকুর মারার কাজেও নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রায় ডোমদেরই সদৃশ, চামড়ার কাজে নিযুক্ত চামার, এবং ভূঁইমালী বা ঝাড়ুদার শ্রেণী। পূর্বোক্ত সম্প্রদায় চামড়া প্রস্তুত করে (অর্থাৎ বিভিন্নকাজে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে) এবং জুতা, ঘোড়ার সাজ, ঢাক ও সুতা পরিকার করার কাজে ব্যবহৃত ধনুকের তার ইত্যাদি বানায়।, এছাড়া, বিবাহ ও অন্যান্য শোভাযাত্রায় এরা বাদ্য-করের কাজ করে। অন্যদিকে ভূঁইমালী শ্রেণীর প্রায় সকলেই শহরাঞ্চলে ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি পরিকারক হিসেবে কার্যরত থাকে। দেশের এ অংশে চণ্ডালেরা অন্তজ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যায় অনেক।

চণ্ডাল

জেলার উত্তর বিভাগে ভাওয়াল ও অন্যান্য এষ্টেটে রায়তদের বেশ বড় একটা অংশ চণ্ডাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে, এই জেলায় ও শহরে এদের উল্লেখযোগ্য একটা অংশ ঘাস কাটা লোক, মালী, মাঝি-মাল্লা, পাল্‌কি ও ডুলীর বেহারা ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় নানাভাবে নিয়োজিত আছে।

যোগী সম্প্রদায়

এ জেলায় ও ময়মনসিংহে যোগীরা আর একটি সংখ্যা বহুল সম্প্রদায়। অন্যান্য সব নিম্নশ্রেণীর ন্যায়, এদেরও বিবাহ অনুষ্ঠান এবং পূজা পার্বন ইত্যাদি উদযাপনের নিমিত্ত নিজস্ব ব্রাহ্মণ রয়েছে; কিন্তু সকল ব্রাহ্ম-উপাসকদের প্রচলিত রীতি-বিরুদ্ধ একটা কাজ তারা করে এবং তা হচ্ছে মড়া পোড়ানোর পরিবর্তে তারা মৃতদেহ কবর দেয়। গোলাকার করে কবর খোঁড়া হয় এবং এর মধ্যে বসার ভঙ্গীতে মৃতদেহ স্থাপন করে। অতপর এর সঙ্গে একত্রে একটি ক্ষুদ্র পানির কলস, একটি হুঁকা ও চাটাই রেখে দেয়। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাস বিরাট অজ্ঞতার

অন্ধকারে চাপা পড়ে রয়েছে। জনশ্রুতি এই যে, এরা হচ্ছে কোন এক সন্ন্যাসীর বংশধর যিনি দীর্ঘকাল কৃচ্ছ্রসাধন এবং বিচ্ছেদের পর এ ধরনের জীবন পদ্ধতিতে ক্লান্ত হয়ে তার যোগ ভেঙ্গে ফেলেন, এবং তার পরিবার পরিজনদের নিকট ফিরে আসেন। ভিক্ষাজীবি যোগীগণও তাদের মৃতদেহ কবর দেয়, কিন্তু তারা এই একই অনুষ্ঠানাদি পালন করে কিনা সে সম্পর্কে আমি অবহিত নই। অবশিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজন প্রথমে পাল রাজাদের পুরোহিত ছিলেন বলে ডঃ ব্যুকানন ধারণা করেন। এ সকল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ বর্তমানের যোগীদের দুটো স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ই পূর্বে একই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল এবং বানিয়া রাজাদের সঙ্গে একত্রে দেশের এ অংশে বসতি স্থাপন করেছিল।

বাংলাদেশের সর্বত্র যোগীদের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত জেলাগুলোতেই তাদের সংখ্যা প্রচুর। এরা সকলেই তাঁতী, এবং নারী পুরুষ সবাই তাঁতে কাজ করে থাকে। তারা সাধারণ গ্রাম্য মোটা কাপড়-চোপড় তৈরী করে, এবং খৈয়ের পরিবর্তে তারা সিদ্ধভাতের মাড় ব্যবহার করে, এবং সে কারণে অন্যান্য তাঁতীদের নিকট তারা মাত্রাতিরিক্ত অবিশুদ্ধ জাতিরূপে গণ্য হয়।

গারুড়ী

গারুড়ী নামে অদ্ভুত এক শ্রেণীর লোক এ জেলায় বাস করে। তারা ভোঁদড়, শুশুক ও কুমীর ইত্যাদি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রথমোক্তটি মারা হয় চামড়ার জন্য এবং শেষোক্ত দুটো তেলের জন্য—যা' তারা সিদ্ধ করে বের করে আনে, এবং ঔষধিরূপে বিক্রি করে। তাদের একমাত্র ব্যবহৃত অস্ত্র 'ট্যাডা' নামের এক প্রকার ক্ষুদ্র বর্শা; এ দিয়ে তারা কয়েকশ' গজ দূরের কোনো বস্তুকেও সঠিকভাবে আঘাত হানতে পারে। এই অস্ত্রের ব্যবহারে তাদের দক্ষতার জন্যে নদী পথের ডাকাতদের নিকট তারা মূর্তিমান বিভীষিকা স্বরূপ এবং আগের দিনে বণিকরা তাদের নৌকায় এই শ্রেণীর কতিপয় লোকছাড়া কখনও কলকাতার পথে যাত্রা করতে সাহসী হত না।

বাঁদিয়া বা বেদে সম্প্রদায়

আর একটি নিম্ন ও অশুদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক হচ্ছে বেদে। দেশের এ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা প্রচুর। তারা হিন্দু, কি মুসলমান তা' নির্ণয় করা কঠিন। কেননা

বাহ্যতঃ তাদের ধর্মীয় মত দেশের যে যে অঞ্চলে তারা বসত করছে, সেই সেই এলাকায় প্রচলিত ধর্মমতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এখানে এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পয়গম্বরের অনুসারীরূপে নিজেদের পরিচয় দেয়, এবং গারুড়ীদের ন্যায় নদীর দেবতা "বদরের" পূজা করে। বেদেরা সারা বছর পানির উপরে বসবাস করে, এবং সাধারণত সংঘবদ্ধভাবে আট বা দশ নৌকার এক একটা বহরে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ায়। এদের মধ্যে প্রচলিত একটি প্রথা অনুসারে, রাত্রিবেলা যে সব নৌকা দল থেকে সরে পড়ে, কিম্বা নৌকার বহর থেকে দূরে নোঙ্গর করে, পুনরায় দলে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে জরিমানা দিতে হয়। বেদেরা নানান ধরনের কলা-কৌশল আয়ত্ত করে থাকে। তারা খুব দক্ষ ডুবুরী, এবং প্রধানতঃ শীতমৌসুমে পরিস্কার পানিতে মাছধরার কাজে ব্যাপৃত থাকে। তাদের পাওয়া ছোট ছোট মুক্তা দিয়ে তারা নাক ও কানের জন্য অলংকার তৈরী করে থাকে; এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত হয়-এমন কয়েকটি দ্রব্য যেমন, শঙ্খ ইত্যাদি তারা বাজারে বিক্রি করে। এরা পুঁতির মালা, খুব অল্প মূল্যের মনি, তুঁতিনা ও টিনের আংটি, বাঘ-নখরের তৈরী গলার হার ইত্যাদি বিক্রি করে। এগুলো দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীগণ তাদের ছেলেমেয়েদের সাজাতে ভালবাসে। এছাড়া, তারা ওষুধপত্র, এলাচ, মরিচ প্রভৃতি মশলা এবং তাঁতীদের বুনটের সুতাগুলো পৃথক করার কাজে ব্যবহৃত 'হান্না' বা বাঁশের তৈরী চিরুনী ইত্যাদিও এরা প্রস্তুত করে থাকে। এরা শিঙা লাগিয়ে রক্তচোষণ বা কাপিং-পদ্ধতি অনুসরণ করে। এ উদ্দেশ্যে তারা যে যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, তা' হচ্ছে চামড়া ছিদ্র করার জন্য কাঁকিলা মাছের ধারালো দাঁত, এবং গরুর শিং এর অগ্রভাগ যা' দিয়ে চুনুক দিয়ে তারা রক্ত শুষে আনে। বেদেরা শিকারে ও পাখিমারায়ও দক্ষ, এবং পালক সংগ্রহের জন্য ফাঁদপেতে ও নানান উপায়ে পাখি শিকার করে।

বেদেদের ভেলকিবাজি

এরা জনসাধারণকে ভেলকির কলাকৌশল, ফিকির-ফন্দী, ভল্লুক ও বানর নাচ দেখিয়ে আনন্দ দিয়ে থাকে। এভাবে যখন তারা জীবিকা উপার্জনে অক্ষম হয় তখন তারা সাধারণত চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় নিয়ে থাকে। অন্যান্য দেশে তাদের সমশ্রেণীর ভ্রাতৃবর্গের ন্যায়, তারা আংশিকভাবে মোরগ-মুরগী

ইত্যাদি পালার পক্ষপাতী এবং তাদের নৌকাগুলোতে সাধারণত হাঁস মোরগ-মুরগী, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংরক্ষিত থাকে। তারা সাধারণত সব রকম পশু পাখির মাংস খায় এবং গাঁজা ও কোহল বিশিষ্ট উগ্র মদের প্রতি এরা অতিমাত্রায় আসক্ত; ফলে তাদেরকে অত্যন্ত অশুদ্ধ একটি জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বাঘ শিকারীগণ (বাঘ হত্যাকারী) এবং ইঁদুরের গর্তে লুক্কায়িত খাদ্য-শস্যের অন্বেষণকারী বাঁইদাগণ উভয়েই বেদে শ্রেণীর অন্তর্গত।

কোচ ও রাজবংশী

জেলার উত্তর ভাগের অরণ্যাঞ্চলে দুই শ্রেণীর উপজাতি বাস করে এবং এরা তাদের বৈশিষ্ঠ ও সাধারণ প্রকৃতিতে যে কোন সম্প্রদায় থেকে বহুল পরিমাণে পৃথক।

এদের চোয়াল উচু, মুখ চ্যাপটা এবং মঙ্গোলীয় প্রজাতির ন্যায় চোখের পাতা সংকীর্ণ ও তির্যক। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের তুলনায় এরা অনেক বেশী শক্ত ও অধিকতর কষ্ট-সহিষ্ণুজাতি। এরা কোচ ও রাজবংশী নামে পরিচিত। রংপুর ও আসামের এই একই নামের উপজাতিদের মত একই উৎস থেকে এদের উৎপত্তি হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এরা এ জেলার উত্তরাঞ্চলের আদিম অধিবাসী। দেশের এ অংশে এরা প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের জনসংখ্যার শেষ চিহ্ন বা অবশিষ্টাংশ। উক্তরাজ্য বুড়িগঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, একথা আগেই বর্ণিত হয়েছে। দিনাজপুরের কোচ ও রাজবংশীদের কথা বলতে গিয়ে, ডঃ বি, হ্যামিলটন উল্লেখ করেন যে, সেখানকার কিংবদন্তী অনুসারে, তারা হচ্ছে জাতিতে ক্ষত্রিয় এবং এরা রাজা পরশুরামের অত্যাচার থেকে চীনে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পান ও "নর" নামে অভিহিত তাদের রাজপুত্রেরা ভগবান শিবের বংশধর বলে ভান করেন। এই জেলার কোচ উপজাতি রংপুরে "পানিকোচ" নামে পরিচিত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এরা দরিদ্র ও অজ্ঞজাতি। তারা তাদের নিজস্ব ইতিহাসের কিছুই জানেনা, কিংবা তাদের পূর্বপুরুষ সম্পর্কিত কোন ঐতিহ্যও তাদের নেই। ভাওয়াল, কাসিমপুর ও আটিয়ার অরণ্যের অভ্যন্তরে, এবং মধুপুর পর্যন্ত সমগ্র ভূ ভাগে তারা বাস করে। দেশের এ অংশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা সত্ত্বেও, তারা উন্নত স্বাস্থ্য ও শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী এবং পূঁতিগন্ধময় দূষিত বাষ্প ইত্যাদিতে জেলার একই অংশে বসবাসকারী প্রতিবেশীদের চেয়ে অনেক

কম ভোগে। তারা কুঠার ও লম্বা বাটওয়ালা কোদালের সাহায্যে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে, এবং ধান, তৈলবীজ ও তুলার চাষাবাদ করে থাকে। তারা কাঠ-কয়লা বানায় ও হরিণের শিং সংগ্রহ করে। এসব দ্রব্য তারা অরণ্যের কাছাকাছি সাপ্তাহিক হাটগুলোতে মাদক দ্রব্যের জন্য বিক্রয় অথবা বিনিময় করে থাকে। কোচেরা তাদের চাষের আওতায় আনা জমির জন্য খাজনা দিতে পরাঙ্মুখ, এবং এক্ষেত্রে অর্থ দানের পরিবর্তে, বরং তারা প্রায়শঃই অকস্মাৎ তাদের কুঁড়েঘরগুলো পরিত্যাগ করে অরণ্যের অভ্যন্তরে চলে যায়; এবং সেখানে পুনরায় জঙ্গল পরিস্কারের কাজ শুরু করে দেয়। জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে থাকে; এবং এর পরিবর্তে কোচ ও রাজবংশীরা তাদের স্ব-স্ব জমিদার বা ভূমি-মালিকদের প্রয়োজন পড়লে, তাঁদের বরকন্দাজ ও যোদ্ধা হিসেবে কাজ করে। কোচেরা সাধারণত কয়েকটি নির্জন কুঁড়েঘর নিয়ে গড়ে-ওঠা ছোট ছোট গ্রামে বাস করে। অনেক ক্ষেত্রেই ঘরগুলো একটা থেকে অন্যটা বেশ কিছু দূরে দূরে অবস্থিত।

তাদের জীবন যাপন পদ্ধতি

এরা ভেড়া, ছাগল, হরিণ, শূকর ও মোষের মাংস খায় এবং মাদকদ্রব্য পান করে। এই পদ্ধতির জীবন যাপনের ফলে তারা বিস্তর দৈহিক শক্তি ও সাহসের অধিকারী হয়ে থাকে।

কথিত আছে, এরা বল্লম নিয়ে পদদলে বন্য হাতী ও বাঘ ইত্যাদি শিকার করতেও দ্বিধা করে না। এরা তাদের সকল রকম লেন-দেনের ব্যাপারে নিতান্ত সৎ ও বিশ্বস্ত। সত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সৎ গুণ তাদের রয়েছে, যা' তাদের প্রতিবেশীগণের মধ্যে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে পুরোহিত কিম্বা নাপিত কোনটাই না থাকায়, এরা হিন্দুগণ কর্তৃক তাদের গোত্রভুক্ত নয় বলে প্রত্যাখ্যাত হয়ে থাকে।

কিন্তু রাজ বংশীরা যারা প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে, এবং সাধারণভাবে হিন্দু-রীতি নীতি ও প্রথা-পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসরণ করে, তারা হিন্দু সমাজ বহির্ভূত নয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। অন্যেরা কোচ উপজাতি থেকে আকৃতি-প্রকৃতিতে খুব একটা স্বতন্ত্র নয়; এবং বাস্তবিক পক্ষে তারা নায়ক বা

সর্দারদের বংশধর হওয়ার কল্যাণে, একই বর্ণের উচ্চতর পদমর্যাদার অধিকারী মাত্র। এদের নিজস্ব একটি ভাষা রয়েছে।

এদের ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ নিয়ে দেয়া হ'ল।

মাধাই — সৃষ্টি কর্তা বা ঈশ্বর

মিয়া	মানুষ	মিরাঙ্গ	চাল
হা	পৃথিবী	থিরি	কলা
চিরাঙ্গ	পানি	নিয়েকা	হলুদ
হুনোয়ান	অগ্নি	রুঙ্গ	নৌকা
মুচুক	হরিণ	শীল	লোহা
চুপ	সর্প	মাছিএ	ব্যাঘ্র
সা	মাছ	ওয়াক্	শূকর
গুম	নাক	জোক	হাত
নতুন	কান	চুনা	কাপড়
ডাব্বা	হুকা	নুক	ঘর
গুয়াই	সুপুরী	ফঙ্গ	একটি গাছ
জামচা	লঙ্কা	বাউম	বাতাস

জেলার উত্তর ভাগে এবং ময়মনসিংহের মধুপুর পর্যন্ত বিস্তৃত জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগ জুড়ে বসবাসকারী কোচ ও রাজবংশীদের সংখ্যা গণনা করা হয়েছে ৮,০০০।

উপরিল্লিখিত শ্রেণীগুলো ছাড়াও, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত কিছু সংখ্যক বাস্তত্যাগীর এখানে স্থায়ী উপনিবেশ আছে। দেড়শ বছরেরও অধিক কালব্যাপী পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অধিবাসী প্রায় শ'তিনেক সড়ক-কুলী এখানে বসতি গেড়েছে। তেজগাঁও এলাকায় কিছু সংখ্যক মনিপুরী অধিবাসী বসবাস করছে, এবং সেখানে তারা ইক্ষু ও শাক্-সবজির চাষাবাদ করে এবং মনিপুরী খাসবস্ত্র বয়ন করে। বীরভূম হতে আগত তিন থেকে চারশত বনিয়া কুলী অত্র জেলায় নীলের কারখানাগুলোতে কার্যরত আছে। থানাগুলোতে এবং জমিদারদের কার্যে নিয়োজিত বহুসংখ্যক বরকন্দাজ ও পিয়ন মূলতঃ পশ্চিম প্রদেশসমূহের অধিবাসী।

কালী ও কৃষ্ণ উপাসকগণ

ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়েস্থগণের মধ্যে ⅞ ভাগ, এবং শূদ্রগণের মধ্যে সমস্ত কামার ও কাঁসারী সম্প্রদায় কালীর উপাসক; এবং বাকি অষ্টমাংশ, সমগ্র তাঁতী সম্প্রদায়, শাখারীদের অর্ধাংশ, ও সৌন্দুকদের (sounoidikus) ⅞ ভাগ লোক বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ উপাসক। শহরে তিনজন গোঁসাই আছেন, যাদের চতুর্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে সুদূর আসাম ও চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রচুর সংখ্যক শিষ্য আছে। এদের নিকট থেকে গোঁসাইরা বার্ষিক চাঁদা আদায় করে থাকেন। এখানে প্রায় শ' তিনেক বৈরাগী আছে। এরা সকলে আখড়া বা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে বসবাস করে থাকে এবং এসব আশ্রম গোঁসাইদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ধর্মসম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বে দীক্ষালভের সময় একজন বৈরাগী প্রায় একটাকা আট আনা প্রদান করে থাকে। এবং গোঁসাই কর্তৃক আরোপিত জরিমানা প্রদানে সে বাধ্য থাকে। এছাড়া, বৈরাগীর মৃত্যুকালে তার যা' কিছু সম্পত্তি থাকে তার সবটাই গোঁসাই উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়ে থাকে।

প্রধান বৈষ্ণব উৎসব

এখানকার প্রধান বৈষ্ণব-উৎসব আগস্ট মাসে কৃষ্ণের জন্মের পরবর্তী দিনে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে, তাঁতি সম্প্রদায় 'লক্ষী-নারায়ণ' ও 'মুরলীমোহন' নামে অভিহিত দু'টি দেবমূর্তির সম্মানার্থে দুটো শোভাযাত্রা বের করে। প্রথমটি হচ্ছে গন্ধক নদী থেকে আনা শালগ্রাম বা শিলা; এটি একজন অবস্থাশালী তাঁতি কর্তৃক প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে পূজার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্তটি হচ্ছে একটি কৃষ্ণ মূর্তি, যা বেশ কিছু পরবর্তী সময়ে ঐ একই পেশার জনৈক ব্যক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ সকল শোভাযাত্রায় রঙীন কাগজ, চটকদার উজ্জ্বল বস্ত্র ও কৃত্রিম পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত ও বহন যোগ্য মঞ্চোপরি সমাসীন বালকেরা কৃষ্ণ ও তদীয় পরিবার বর্গের রূপ ধারণ করে। হস্তি ও অশ্বশ্রেণীসহ গানবাজনা সহকারে এইসব মঞ্চ নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হয়ে থাকে; এবং রাত্রি বেলা আতশবাজি পোড়ানো হয়। স্থানীয় লোকদের নিকট এ এক বিরাট আনন্দ-উৎসব; এবং এ উপলক্ষে চতুর্পার্শ্বস্থ সকল এলাকা থেকে এরা বিপুল সংখ্যায় শহরে এসে ভীড় জমায়। আগের দিনে তাঁতি সম্প্রদায় যখন বর্তমান সময়ের চেয়ে অধিক অবস্থাপন্ন ছিল, তখন এই ধরনের শোভাযাত্রাগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ খরচ হতো,

এবং শতাধিক মঞ্চ শোভাযাত্রায় শোভা পেতো। আর একটি বিরাট হিন্দু মেলা অনুষ্ঠিত হয় সোনারগাঁও পরগণায় ব্রহ্মপুত্র নদীর (নদীর পুরাতন শাখার) তীরে। নদীতে স্নানার্থী হাজার হাজার মানুষের ভীড় জমে। উৎসবটি মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং আট কি দশদিন পর্যন্ত চলে। শহরে হিন্দুদের ধর্ম কর্মের স্থানগুলো হল ৫২টি আখড়া, ৫৫টি কালী বাড়ী ও ১২টি স্নান ঘাট। ঢাকেশ্বরী দুর্গা মন্দিরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণদের সংখ্যা ছিল ১৮, এবং যারা যজমানী অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করেন ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাদের সংখ্যা ছিল ৩৪৫।

মুসলমান সম্প্রদায়

এক হিসেব অনুযায়ী জেলার হিন্দু মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান সমান। কিন্তু শহরে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে অধিক। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারী অনুসারে শহরতলীর গ্রামগুলো বাদে মোট জনসংখ্যা ছিল ৬৮,৬১৭। এর মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ৪,৩০৯ জন বেশী ছিল। মুসলমান কর্তৃক এদেশ বিজয়ের সময় থেকে, তারা পূর্বাঞ্চলীয় জেলা সমূহে প্রচুর সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছিল বলে প্রতীয়মান হয় এবং প্রথম দিকে তারা মেঘনার মোহনার অদূরে জনপদে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রধান অংশে পরিণত হয়। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে সীজার ফ্রেডারিক উল্লেখ করেন যে, "সন্দীপের অধিবাসীরা মুরজাতি"। পুরকাসের ভ্রমণবৃত্তান্তমূলক সংগ্রহে বর্ণিত হয়েছে যে,. ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় শেষপাদে "উপকুলের সন্নিকটবর্তী অধিবাসীগণ" প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। তারা প্রায় সকলেই শেখ। সৈয়দ, মুঘল ও পাঠনগণ ছিলেন মোট জনসংখ্যার নগন্য অংশ। পাঠানরা অবশ্য, পূর্বকালে এ জেলায় সংখ্যাবহুল ছিলেন। ডেমরার নিকটে পাঠানটুলী গ্রামে এখনও তাদের সামান্য কিছু সংখ্যক বংশধরের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সেখানে তারা পূর্বেকার শাসকগণ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সনদের বলে কিছু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী।

কতিপয় নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান সম্প্রদায়

নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাদের পেশা ও চাকুরি অনুসারে তারা পৃথক পৃথক সামজিক শ্রেণীর রূপ ধারণ করেছে; এবং এরা একে অন্যের সঙ্গে বিয়ে শাদি ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে

সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের মত বর্জন নীতি গ্রহণ করে চলে। এদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, প্রথম—কসাই, বা মাংস বিক্রেতা, যারা তাদের জবাই করা পশু অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। দ্বিতীয়—কলু, বা তিল ও সরিষার তৈল উৎপাদনকারী। তৃতীয়- জোলা বা গ্রাম্য মোটা বস্ত্র প্রস্তুতকারী তাঁতি। চতুর্থ—মালী এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে মোহর্‌রম ও বেড়া উৎসব-কাল এবং বিয়ের শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত কৃত্রিম পুষ্প ও সাজসজ্জার প্রস্তুতকারী ও মালীগণ। পঞ্চম—জেলে বা সেইসব ব্যক্তি যারা মাছ ধরে থাকে। ষষ্ঠ—বিলদার বা গোরখন্দকারী, বা সড়ক নির্মাণকারী, কবর খননকারী, মৃতদেহ বহনকারী প্রভৃতি। সপ্তম—দড়িয়াগণ, কুকুর রক্ষক, ভূঁইমালী, ঘটক ও জলৌকা প্রয়োগ-কারী চিকিৎসক সম্প্রদায় ও অন্যান্য। অষ্টম—মৃশকারিয়া, বা পাখি মারা ব্যাধ সম্প্রদায়। নবম—দাই বা ধাত্রীগণ। শহরে এই পেশা অবলম্বনকারিণী স্ত্রীলোকেরা মহলদারনীগণের নির্দেশ মোতাবেক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে। মহলদারনীগণ তাদের ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করে দেয় বলে তাদের উপার্জিত অর্থের একাংশও তারা পাওয়ার অধিকারী হয়।

এই পৌরবিধি সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং প্রথমাবস্থায় পুলিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। মহলদারনীদেরকে কর্তৃপক্ষের নিকট অপ্রাপ্তবয়স্কদের শ্রম ও শিশু হত্যার ঘটনাগুলো রিপোর্ট করতে হতো। এরা মেয়ে মহলে প্রবেশ করা ও অনুসন্ধান কার্য চালানো এবং যে সমস্ত মহিলারা তাদের বংশ মর্যাদার প্রেক্ষিতে বিধিনিষেধের জন্য উন্মুক্ত আদালতে আসতে অপারগ, সেসব মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণে সাহায্য করা, ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হতো। অনুরূপ কার্যের জন্য এখনও শহরের ম্যাজিস্ট্রেটদের এদের থেকে সাহায্য লাভের প্রয়োজন পড়ে।

হাজ্জাম। ধোপা। মাহিফরাস। বেহারা। সাপুড়িয়া। বাজিগর।

দশম—হাজ্জাম বা নাপিতগন। একাদশ—ধোপা। দ্বাদশ—মাহিফরাশ বা মাছ বিক্রেতাগণ। মুঘল সরকারের আমলে শহরে মাছ বিক্রয় ব্যবসা এই শ্রেণীর হাতে একচেটিয়া ছিল, এবং এখন ও এই ব্যবসা প্রধানতঃ তাদের দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে। ত্রয়োদশ—বেহারা বা ডুলী বাহক। চতুর্দশ—সাপুড়িয়া বা যারা সাপ ধরে। পঞ্চদশ—বাজিগর, বা ভেল্কিবাজ ও দড়ি নৃত্যকারীগণ।

পীর ও কতিপয় ফকির

শহরের সন্নিকটে বিরাট সম্মানিত পবিত্র দু'জন পীরলোক, এবং বেশ কিছু সংখ্যক ফকির আছেন। এসব ফকিরদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে মুহররম ও রমজানের উৎসবের প্রাক্কালে মাটির নীচে নিজেদেরকে কবরস্থ করে তাদের ধর্মীয় আবেগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে কবরের আকারে একটি গর্ত খোড়া হয়; এবং কৃচ্ছ্র সাধনের প্রাক্কালে নেহায়েত জীবন-ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে করে ভক্ত লোক উক্ত কবরে নেমে পড়েন। কেবল বাতাস প্রবেশের জন্য সামান্য একটুখানি ছিদ্রের ব্যাবস্থা রেখে, অতঃপর এই কবরগুহা বাঁশ, মাদুর ও মাটি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফকির এ অবস্থায় অবস্থান করেন।

মহররম অনুষ্ঠান

মহররমের অনুষ্ঠানাদি হুসাইনী দালানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এটি একটি বৃহৎ দালান এবং সেখানে এক সঙ্গে বহুলোকের স্থান সংকুলান সম্ভব। ''আশুরা'' বা প্রথম দশদিন রোজার প্রাক্কালে এর অভ্যান্তরভাগ কৃত্রিম পুষ্পরাজি, স্বচ্ছ দ্রব্যাদি—বিশেষত বস্ত্র, উট পাখির ডিম ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। ইমাম হাসান ও হুসেনের প্রতিকৃতি সংরক্ষিত স্থানের ঠিক উপরে দেয়ালগুলোতে কালো বস্ত্রের লাইন-টানা থাকে। কক্ষের কেন্দ্র স্থলে একটি ঝরণা রয়েছে এবং রাত্রিকালে যখন এ কাজের জন্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একদল গায়ক কর্তৃক ''মর্শিয়া খানি'' বা মৃতের জন্য শোক গীতি ও উচ্চ প্রশংসাবাণী গীতি হয়, তখন সমগ্র কক্ষটি প্রচুর প্রদীপ ও রঙীন মোমবাতির আলোকে আলোকিত থাকে; এবং এরা সারাটা রমজান মাসব্যাপী তাদের ''সব বেদারী'' বা রাত্রিকালীন জাগরণ অব্যাহত রাখে। প্রার্থনার ৭ম দিনে পুষ্পরাজি ও জড়িদার বস্ত্রে সজ্জিত কাষ্ঠদণ্ডের উপর স্থাপিত একখানি মুক্ত খোলা হাতের প্রতিকৃতি নিয়ে গানবাদ্য সহকারে রাস্তা প্রদক্ষিণ করা হয়। দশম তারিখে বা রোজার দশম দিনে, তবিয়ত বা এ দু'জন শহীদের প্রতিকৃতি বিরাট জাঁক জমক ও উৎসব সহকারে শহরের নিকটবর্তী একটি স্থানে বহন করে নেয়া হয়, এবং সেখানে এই প্রতিকৃতি সমাধিস্থ করা হয়। এই উৎসবের সময়, লাল ও সবুজ বস্ত্রে সজ্জিত বালকগণ পানি বা শরবতে পরিপূর্ণ

চর্মনির্মিত থলে ও পতাকা বহন করে এবং শহরের এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। এরা পথযাত্রীদের শরবত ও পানীয় বিলায়।

বেড়া উৎসব

খাজা খিজিরের (পয়গম্বর ইলিয়াস বলে অনুমান করা হয়) সম্মানার্থে বেড়া উৎসবটি বিরাট আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। এ সময়ে এখানে নওয়ারাহ সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু একদিক থেকে বিচার করে দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে এই উৎসব বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে মুর্শিদাবাদ ও দেশের অন্যান্য শহর অপেক্ষা এখানে অপেক্ষাকৃত কম আড়ম্বর ও চাকচিক্যের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে। এখানে "বদর" নামীয় নদীর দেবতা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যাপকভাবে পূজিত হয়ে থাকেন। প্রধানতঃ মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে এটা বহুল প্রচলিত।

নদীর কূলে মোরগ মুরগী জবাই করে, এবং ফলমূল ও পুষ্পাদি উৎসর্গ করে উক্ত দেবতার তুষ্টিসাধন করা হয়, এবং এসকল উৎসর্গীকৃত দ্রব্যাদি মৃৎপাত্রে বা ফাঁপা করা কুমড়ার খোলে রাখা হয়, ও নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। বদর পূজা, সোনা থেকে শুরু করে পূর্ব চট্টগ্রাম পর্যন্তই নয়, আমার বিশ্বাস সুদূর আরাকান পর্যন্তও বিস্তৃত।

মুসলমানদের এক নতুন সম্প্রদায়

বিগত দশ বছরের মধ্যে দেশের এ অংশে মুসলমানদের ভিতরে একটি নতুন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, এবং এ'রা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এই জেলায় ও ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও ময়মনসিংহে বিস্তার লাভ করেছে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শরিয়তুল্লাহ নামের জনৈক ব্যক্তি। এ লোক মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কায় হজ্জযাত্রা করেন। পুনর্বার তিনি হজ্জব্রত পালন করেন ও ওহাবীদের মধ্যে আশ্রয় লাভ করেন। দীর্ঘ বিশ বছরকাল অনুপস্থিত থাকার পর ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনের পর থেকে, তিনি তাঁর মতবাদ প্রচারে নিযুক্ত রয়েছেন, এবং ধারণা করা হয় যে, উপরি-উক্ত স্থানসমূহের মুসলমান জনসংখ্যার ⅙ ভাগ লোককে তিনি তাঁর শিষ্যত্বে পরিণত করতে সফলকাম হয়েছেন। শহরে মুসলমান

অধিবাসীগণের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই তাঁর শিষ্য বলে অনুমান করা হয়। এরা ফরায়েজী নামে অভিহিত এবং মৌলবীদের থেকে পৃথক।

ফরায়েজী নামে পরিচিত এই সম্প্রদায় পশ্চিমাংশের জেলাসমূহের মৌলবীদের থেকে কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। অবশ্য মৌলবী আবদুল্লার বেশ কিছু শিষ্য[১] এখানেও বসতি স্থাপন করেছেন। তারা কোরানের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কথা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন এবং এর দ্বারা অননুমোদিত সকল অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে চলেন। মহররম উৎসব যে ভাবে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁর পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ কর্তৃক পালিত হয়েছে বলে তারা দাবী করেন তা' অর্থাৎ এ মাসের দশম তারিখ অপরিবর্তনীয় ভাবে রক্ষা করা হয়েছে। উক্ত তারিখটি আদম ও হাওয়ার পৃথিবীতে অবতরণ ও আরশ্ (নবম বা ঊর্ধ্বতম স্বর্গালোক) এবং কুর্শির (অষ্টম বা স্ফটিকবৎ) স্বর্গসমূহ সৃষ্টির তারিখ হওয়াতে, তারা এদিনটিকে বিশেষভাবে পবিত্র জ্ঞানে উদ্‌যাপন করে থাকেন।

ফরায়েজীগণের নীতি

তদানুসারে তারা এই দিন ও পরবর্তী দিন রোজা রাখেন, সারা রাত এবাদৎ করেন; গরীব মিস্‌কিন ব্যক্তিদের ভোজদান করেন এবং একে অন্যের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে পুনর্মিলন সাধন করেন। তারা পয়গম্বর কর্তৃক ন্যস্ত-করা কর্তব্য প্রশংসনীয়ভাবে পালন করে, থাকেন। কিন্তু শহীদ হাসান হুসেনের আত্মোৎসর্গের স্মৃতি-উৎসব যা' এ সময়ে পালিত হয়ে থাকে তা, তাদের নিকট শুধু নিষিদ্ধই নয়, এমন কি এর সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি দর্শন করা থেকেও তাঁরা দূরে থাকেন। তাঁরা পুতি, ছাতি ও চিল্লার আচার-অনুষ্ঠানও বর্জন করে চলেন। এসব অনুষ্ঠান শিশু-জন্মের চল্লিশ দিনের মধ্যে পালিত হয়ে থাকে। তারা একমাত্র আকিকা-উৎসব পালন করেন, এবং এতে পুরুষ শিশুর জন্যে দুটো ছাগল, ও কন্যা সন্তানের জন্যে একটি ছাগল উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। এই সময়ে শিশুর মাথা কামানোর অনুষ্ঠান পালিত হয়, এবং পিতামাতার আর্থিক অবস্থানুসারে চুলের ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১ মৌলবী আবদুল্লাহ্ মুরিদ করেন এবং তাতে শর্কিতুল্লাহ্ আপত্তি জানান।

বিয়ে-শাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি

একইভাবে তারা বিবাহ-অনুষ্ঠানকেও এর নানা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত করেছেন। এ উপলক্ষে নানাবিধ প্রথা-পদ্ধতি পালন করা হতো, যেমন, "জাঁকজমকের সহিত বসে থাকা," "হলুদ বহন করে নিয়ে যাওয়া ও লাগানো", "বিয়ের পোশাক পরিচ্ছদের জন্য পরিমাপ", এবং "সব গসত্ শোভাযাত্রা" ইত্যাদি, সব কিছু নিষিদ্ধ করা হয়। একমাত্র অনুমোদিত আড়ম্বর বা জাঁকজমক হচ্ছে বর-কনেকে তাদের শাদী বা বিয়ের দিনে সাজানো। সাক্ষীগণের সম্মুখে উভয় পক্ষের স্বীকৃতিতে বিয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। এ উপলক্ষে গান-বাজনা ও নৃত্যগীত বর্জন করা হয়, এবং এতে একমাত্র খরচপত্র হচ্ছে তাদের বন্ধুবান্ধব ও দরিদ্রব্যক্তিদের জন্য "আলেমা খানা" নামে পরিচিত ভোজদান।

সৎকার কার্যাবলী

তাদের সমাধি সংক্রান্ত সৎকার কার্যাদি অনুরূপ সরলতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে থাকে। কবরে ফলমূল ও পুষ্পাদি অর্পণ এবং নানাবিধ ফাতেহা খানি অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। তাদের কবর মাটির উপরি ভাগে উচ্চ করে তোলা হয় না, কিম্বা কোন রকম ইট বা প্রস্তর নির্মিত সৌধ দ্বারা চিহ্নিত হয় না। ধর্মীয় রীতি নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে ফরায়েজীরা তাদের অন্যান্য মুসলমান ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা অবলম্বন করে থাকেন; কিন্তু তারা অসহিষ্ণু ও উৎপীড়নের পক্ষপাতী। তাদের প্রতিবেশীদের ধর্মীয় মতামতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে গিয়ে, প্রায়ই তারা শহরে প্রকাশ্যস্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে থাকেন। তাঁদের নেতা "হাজী শরিয়তুল্লাহ" এই উপলক্ষে একাধিকবার হাজতে ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস খাজনা প্রদান বন্ধ করার অভিপ্রায়ে গ্রামাঞ্চলে তাঁর শিষ্যদের উত্তেজিত করার অভিযোগে বর্তমানেও তিনি পুলিশের নিষেধাজ্ঞাধীনে আছেন।

খ্রীস্টধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়

খ্রীস্টধর্মাবলম্বীগণ প্রায় সাড়ে তিনশত বছর ধরে দেশের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছেন। ভার্থোমেনাস ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলা শহরের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "এখানে আমরা বহু খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বণিকদের দেখতে

পাই, যারা সার্নান শহরে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানান। তথাকার বিরাট বাণিজ্য বন্দরে তারা পশমীবস্ত্র এবং আলোই কাঠ ও লেজার (Lazer) ইত্যাদি নিয়ে গমন করেন। লেজার (Lazer) থেকে এক ধরনের মিষ্টি আদাজাতীয় উৎপন্নদ্রব্য 'লেসার পিটিয়াম' রূপে পরিচিত। এটা এক প্রকার সুগন্ধি-নির্যাস হওয়াতে একে সাধারণভাবে 'বেলজুঁই' (Belzoi) বলা হয়।"

চট্টগ্রামে বসতিস্থাপন ও পরবর্তীকালে শ্রীপুরে

এসব খ্রীস্টান লোকেরা সম্ভবত সিরীয় গির্জার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে পর্তুগীজেরা বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেননি। এই বছরে জন ডি সিলভেরা বাংলায় একটি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপ থেকে চারটি জাহাজসহ আগমন করেন। সেখানে তিনি শীতকাল অতিবাহিত করেন এবং দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ভীষণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। এর অল্প কাল পরেই, তাদেরকে চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়, এবং এর অল্প কয়েক বছর পরে তারা নিজেরা মেঘনার তীরবর্তী শ্রীপুরে বসতি স্থাপন করেন।

১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে নির্মিত তেজগাঁও গীর্জা

ঢাকার সন্নিকটে তেজগাঁও-এর গির্জা ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে সেণ্ট-অগাস্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে কথিত আছে। কিন্তু ভারতের দক্ষিণ দিকে নেস্টরীয় উপাসনালয় গুলোর সঙ্গে এই গির্জার সাদৃশ্য থেকে অনুমান হয় যে, প্রথমে উহা ভার্তোমেনাস কর্তৃক উল্লেখিত খ্রীস্টীয় বণিকদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং তা' পরবর্তীকালে রোমান ক্যাথলিক মিশনারীগণ কর্তৃক কেবল-মাত্র সংস্কার সাধিত বা পুনর্নির্মিত হয়। পর্তুগীজগণ এখানে বসতিস্থাপন করে মেঘনার মোহনায় প্রধানতঃ জলদস্যুবৃত্তি দ্বারা জীপন যাপন করতো বলে প্রতীয়মান হয়। শ্রীপুরের অধিবাসীরা প্রধানতঃ পর্তুগীজ ছিল এবং ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ, এদেরকে, "সম্রাট জালাল উদ্দিন আকবরের বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহী বলে উল্লেখ করেছেন। এ স্থানে এত বেশী নদনদী ও দ্বীপ আছে যে, তারা এর একটা থেকে অন্যটায় পলায়ন করে ; ফলে সম্রাটের অশ্বারোহী সৈন্যরা এদের বিরুদ্ধে আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনা।" পরবর্তীকালে প্রদেশের মুঘল শাসনকর্তাগণ তাদেরকে নানা কার্যে নিয়োগ করেন। ১৬২১ খ্রীস্টাব্দে তাদের একদল ইব্রাহিম খানের সঙ্গে তার রণতরী

সমুহের গোলন্দাজ সৈন্য হিসেবে যোগদান করে। ইব্রাহিম খান যখন সম্রাট শাজাহান কর্তৃক রাজমহলে বিতাড়িত হয়েছিলেন সেই সময়ে এ ঘটনা ঘটেছিল। আরো পরবর্তী সময়ে এদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক আরাকান রাজার চাকুরি ত্যাগ করে চলে আসে এবং শায়েস্তাখান এদেরকে ফিরিঙ্গি বাজারে বসতি স্থাপন করার সুযোগ প্রদান করেন।

উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে নবাবের অশ্বারোহী সৈন্য দলে নিযুক্তি

এই সময়ে তারা রণতরী ও গোলন্দাজ সৈন্যদের সেনাধ্যক্ষ হিসেবে এবং গোলন্দাজ সৈন্যবাহিনী ও নওয়ারা বিভাগগুলোর কারিগররূপে নিয়োগ লাভ করে। তাভার্নিয়ারের মতে তাদের বেশ কিছু পরিমাণ লোক নবাবের অশ্বারোহী সৈন্যদলে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলো। তারা ধলাইখালের সন্নিকটে (Dullye creek) বসবাস করতো এবং সেখানে তাদের একটি গীর্জা ছিল। তাভার্নিয়ার এর নির্মাণ-রীতির সৌন্দর্যের প্রশংসা করেন। এখানে একটি সেইণ্ট অগাস্টাইন মনাষ্ট্রী বা মঠও বিগুমান ছিল বলে থিবিনাট উল্লেখ করেন। ঢাকা, ভাওয়াল ও হোসনাবাদে অবস্থিত তিনটি পর্তুগীজ গীর্জার অধীনে খ্রীস্টীয়ানদের মোট সংখ্যা ছিল ১০,১৫০ জন।

ইংরেজদের প্রথম বসতি স্থাপন

ইংরেজগণ এখানে ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বসতি স্থাপন করেন বলে মনে হয়। ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে তাভার্নিয়ার কথা প্রসঙ্গে ইংরেজদের কারখানার উল্লেখ করেন এবং এর প্রধান কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে প্রথম ভারতীয় মসলিন বস্ত্র আমদানী করা হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের আগে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের সংখ্যা কখনও পাঁচজনের অধিক ছিল বলে প্রতীয়মান হয়না।

বিনা শুল্কে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অধিকার লাভ

১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ সুলতান মোহাম্মদ আজিমকে ২১,০০০ টাকা নজর প্রদান করেন, এবং এর ফলে তারা বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি লাভ করেন। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে শায়েস্তা খান উক্ত কারখানা বাজেয়াপ্ত করেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে এই নবাব বা তাঁর সহকারী বাহাদুর খান আওরঙ্গজেবের আদেশে বাংলায় অবস্থিত সমস্ত ইংরেজ সম্পত্তি সাময়িক

ভাবে বাজেয়াপ্ত করেন এবং এখানকার কোম্পানীর কর্মচারীদেরকে বন্দী করেন। ১৭৭৮ এবং ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে এখানকার ইংরেজ অধিবাসীদের পেশা ও চাকুরার একটি তুলনামূলক বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল।

১৭৭৮ ও ১৮৩৮ সনের ইংরেজ অধিবাসীগণের পেশা ও চাকুরীর অবস্থা

১৭৭৮

প্রাদেশিক কাউন্সিলের সদস্যবর্গ	৫
শুল্ক-কলেক্টর	১
দেওয়ানী আদালতের তত্ত্বাবধায়ক	১
সচিব	১
সহকারী সচিব	১
ফার্সী অনুবাদক	১
বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্থাপনের প্রধান	১
বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রধানের সহকারী	১
লবণ-প্রতিনিধি	১
সার্জন	১
সহকারী সার্জন	১
নিম্নপদস্থ কর্মচারী	১
বণিক	৪
এটর্নী	১
কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবসায়ী ও লেখক	৫
পাইলট	১
সহকারী পাইলট	১
দর্জি	১
ভৃত্য	২
বেকার লোক	৫
	৩৭

১৮৩৮

পদ	সংখ্যা	
রাজস্ব সংক্রান্ত মহাধ্যক্ষ বা কমিশনার	১	বেসামরিক
সিভিল ও সেসন জজ	১	
ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর	১	
জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট	১	
ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী	১	
সদর আমিন	১	
সহকারী কালেক্টর	১	
বেসামরিক কর্মচারী (বেকার)	১	
প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত	১	
সার্জন	১	
সহকারী সার্জন	১	
দেশীয় অশ্বারোহী বাহিনীর রেজিমেণ্টের কমিশন প্রাপ্ত অফিসার	১৩	সামরিক
সৈনিকদের রসদ সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারী	১	
কার্যনির্বাহক কর্মচারী	১	
গোলন্দাজ সেনাধ্যক্ষ	১	
নন-কমিশনড্ অফিসার	৩	
ব্যাপটিস্ট মিশনারী	১	
নীলকর ও বণিক	১৬	
	৪৭	

আর্মেনীয় ও গ্রীক অধিবাসী

শহরে প্রায় ৪০টি আর্মেনীয় ও ১২টি গ্রীক পরিবার আছে। আর্মেনীয়গণ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রাক্কালে এখানে বসতি স্থাপন করেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের অনেকে বস্ত্র, লবণ ও সুপারীর ব্যাপক ব্যবসা চালিয়ে জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন; এর কিছু কিছু এখনও তাদের বংশধরগণের হাতে আছে। তাদের গির্জা ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়। গ্রীকগণ আরও

পরবর্তী সময়ে শহরে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোলকাতার গ্রীক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেক্সিস আর-গীরী এখানে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু-বরণ করেন, এবং বেশ কিছু সম্পত্তি রেখে যান। অতঃপর উক্ত সম্পত্তি তাঁর পুত্রদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তারা ঢাকা ও বাকেরগঞ্জে তাদের আশ্রয়স্থল নির্মাণ করেন। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে তাদের গির্জা তৈরী হয়। মাউণ্ট সিনাইয়ের মঠ বা সন্ন্যাস আশ্রমের অধীনস্থ জনৈক পুরোহিত এই গির্জার পুরোহিত হন। আর্মেনীয়দের ন্যায় গ্রীকরাও প্রধানতঃ আন্তবাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল এবং এখনও তাদের কিছু সংখ্যক লোক নারায়ণগঞ্জে লবণের বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছেন।

১৮৩৮ সনে শহরে খ্রীস্টিয়ানদের মোট সংখ্যা

১৮৩৮ সনে ইংরেজ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, পর্তুগীজ, আর্মেনীয় অধিবাসী, গ্রীক এবং ফরাসী ও ডাচদের বংশোদ্ভূত লোকজন প্রভৃতিদের সমন্বয়ে গঠিত খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের মোট সংখ্যা ছিল ৩০৪ জন।

নবম অধ্যায়

[চরিত্র—আচার আচরণ—পোশাক পরিচ্ছদ—রীতিনীতি—আমোদ প্রমোদ—শিক্ষা—মামলা মোকদ্দমা, অপরাধ ও এর বাস্তব কারণসমূহ।]

বাংলার অধিবাসীগণের প্রকৃতি ও জীবনযাত্রা

বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাসমূহের অধিবাসীগণ সাধারণভাবে তাদের স্বদেশীয় অন্যান্যদের ন্যায় মধ্যমাকৃতি, পাতলা গড়ন ও দুর্বল দেহ বিশিষ্ট। তারা কখনও সাহসিকতার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন না, বরং তাদেরকে ভীরু ও কাপুরুষরূপে অভিহিত করা হয়েছে। একশত পঞ্চাশ বছরেরও উর্ধ্বে কালপূর্বে, হ্যামিলটন ঢাকার বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন; "দেশটি জনবহুল, কিন্তু কোন সাহসী লোকের জন্মদাত্রী সে নয়। কেননা, মাত্র পাঁচ ছ'জন লোকই এদের এক হাজার ব্যক্তিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

প্রকৃতিগতভাবে এরা অলস ও নিষ্কর্মা

অধিবাসীরা নিষ্কর্মা, শ্রম বিমুখ ও অলসতাপ্রবণ এবং খুব সামান্যই কষ্ট সহ্য করতে পারে। কিন্তু তারা খুব ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী এবং স্বাভাবিক-ভাবেই সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যে সমস্ত পেশায় শারীরিক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়—সেগুলো অপেক্ষা তারা সাধারণতঃ শিল্পকলায় পারদর্শী—যাতে দীর্ঘস্থায়ী প্রচেষ্টা ও হস্তকৌশল প্রদর্শন দরকার হয়। সেজন্য তারা সুতা কাটায় পারদর্শী ভাল তাঁতী, সুলেখক, সুক্ষ্ম সুচীকর্ম শিল্পী, রৌপ্য ও স্বর্ণকার, এবং শাঁখারি; কিন্তু তারা দ্বারবান, মুটে, প্রহরী বা সৈনিক হিসেবে অনুল্লেখযোগ্য।

স্বভাবে নিরীহ ও শান্ত

একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসাবে এরা শান্তশিষ্ট, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়, এবং শাসকদের প্রতি অনুরক্ত, ও আনুগত্যের জন্যে খ্যাত। কোম্পানীর

শাসনক্ষমতা লাভের পর থেকে এপর্যন্ত একটি মাত্র গণ-অসন্তোষ প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হয়েছে ১৮১০ সালে। সেই সময় গৃহ-কর আরোপিত হওয়া উপলক্ষে শহরের নাগরিকগণ একত্রিত হয়ে কালেক্টরের নিকট তাদের দাবী দাওয়া পেশ করেন। অভিযোগ সম্বলিত আবেদনপত্রে স্থানীয়দের প্রায় ৯,০০০ গণ্যমান্য গৃহকর্তা স্বাক্ষরদান করেন। এরা কেবলমাত্র এই নিন্দনীয় কর রহিত করার জন্যই দরখাস্ত করেননি, বরং দলিলপত্রাদি লেখার কাজের উপর আরোপিত কর বাতিল এবং নিম্নপদস্থ পদসমূহে প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্যও আবেদন জানান। কাচারী অবরোধকারী সঙ্ঘবদ্ধ জনতার হাত থেকে কালেক্টর এই দরখাস্ত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে, তাদের মধ্যে বিক্ষোভের ভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাস্তায় একদল সিপাহীর আগমনই এদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে যথেষ্ট ছিল : ফলে জনতা পরের দিন দরখাস্ত পেশ করার নিমিত্ত প্রতিনিধি নিয়োগের উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে অসাধুতা। এরা মামলাবাজ এবং ছোটখাট ঝগড়া ফ্যাসাদ ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা তাদের খুব বেশী। মামলা মোকদ্দমা বিচারের সময়, তারা ব্যাপকভাবে প্রবঞ্চনা, ও ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় ও সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। তাদের এই স্বভাব সম্বন্ধে এ জেলার প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত প্রায় সকল সরকারী কর্মচারীই মন্তব্য করেছেন। এদিক থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দেশের মধ্যে সবচেয়ে গোলযোগসৃষ্টিকারী লোক বলে অখ্যাতি অর্জন করেছেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা বিরল। উভয় শ্রেণী সম্পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছেন এবং দুটো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই এতদূর পর্যন্ত সংস্কারমুক্ত হয়েছেন যে, তারা একই হুকা থেকে ধূমপান পর্যন্ত করে থাকেন। দেশের এ অংশের ব্রাহ্মণগণ বহুল পরিমাণে বর্ণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতার জাল ছিন্ন করেছেন, যা তাদেরকে পৌরহিত্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। বর্তমানে তারা প্রায়শঃই দেওয়ান, লেখক, উকিল ও অন্যান্য লোকায়ত বৃত্তিতে নিয়োজিত রয়েছেন। একটি বিশেষ গোষ্ঠি হিসেবে উল্লিখিত লোকেরা শহরের নিম্নবর্ণের লোকদের থেকে বিশেষ কোন সম্মান লাভ করেন না। এই গোত্রের যেসব ব্যক্তিবর্গের প্রতি বাস্তবিক যথেষ্ট শ্রদ্ধাসম্মান প্রদর্শন করা হয় তারা হচ্ছেন মন্দিরের প্রতিনিধিত্বকারী পুরোহিত সম্প্রদায় ও গোঁসাইগণ। এরা পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের শিষ্য যেমন,

তাঁতি, শাঁখারি এবং অন্যান্য কৃষ্ণ-পূজারী প্রভৃতিদের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছেন।

হিন্দুদের সংগঠিত সমাজ বা সংঘগুলো "দল" নামে আখ্যায়িত

হিন্দুরা তাদের সামাজিক মেলামেশা কাজ কর্মে "দল" নামে আখ্যায়িত বিভিন্ন সমাজ বা সঙ্ঘে বিভক্ত। অনেক সময় একই বর্ণে একাধিক সমাজ বা সঙ্ঘ রয়েছে, এবং এমন কি, একই পরিবারের কয়েকজন সদস্যের বিভিন্ন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়াও বিচিত্র নয়।

সমাজপতি

প্রত্যেকটি সমাজ একজন সভাপতি বা সমাজপতি কর্তৃক শাসিত—যিনি ব্রাহ্মণদের মধ্যে দলপতি নামে, তাঁতি, স্বর্ণকার, নরসুন্দর ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রামাণিকরূপে এবং তাঁতালিদের মধ্যে মুকিয়া উপাধিতে পরিচিত। সদস্য-বর্গের কুঁদুলে স্বভাব থেকে এদের দলগুলো পুনরায় 'দলাদলি' নামে প্রসিদ্ধ বা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। বিভিন্ন দলের সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ করে এবং আতিথেয়তা বা ভোজানুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে থাকে। গোষ্ঠিগত-ভাবে নিজস্ব সম্প্রদায়ের নিয়ম-কানুন ও প্রথাপদ্ধতি লঙ্ঘনের বিষয়াদি সম্বন্ধে জ্ঞাত হয় এবং সঙ্গী-সহযোগিদের সামাজিক ও নৈতিক আচার আচরণ তথা নানাবিধ কার্যকলাপের উপর খবরদারি করে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে একই ধরণের সমাজ ও অন্যান্য বিষয়

মুসলমান শ্রেণীগুলো যেমন রিফুগর বা রিফুগরী, মাহিফরাস বা মৎস্য-বিক্রেতা প্রভৃতিদের মধ্যে কিছুটা একই ধরণের সমাজ বিদ্যমান। পূর্বোক্তদের মধ্যে সমাজপতির পদ বংশগত এবং এর বক্শিশ বা উপরি পাওনা হচ্ছে ভোজানুষ্ঠান সমূহে সবচেয়ে বিশিষ্ট মর্যাদা এবং দ্বিগুণ বরাদ্দ খাদ্য ও পানীয়। ভোজসভায়, শেষকৃত্যে কিম্বা ধর্মীয় উৎসবে কোন সদস্যের যোগদানের অস্বীকৃতির জন্যে সমাজপতি বিধিবিধান লঙ্ঘনের দায়ে অপরাধী ব্যক্তিদের জরিমানা ধার্য করেন এবং ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করেন। মাহিফরাসদের সভাপতি শুল্ক ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সব রকমের বিবাদের ফয়সলা করেন। তিনি প্রত্যহ সমাজের সদস্যদের নিকট থেকে

চাঁদা আদায় করেন এবং তৎপরিবর্তে তিনি তাদের জন্য বছরের শেষে একটি ভোজ প্রদানের ব্যবস্থা করেন। হিন্দুদের মধ্যে পরিবারের সদস্যবর্গ পিতার মৃত্যুকাল পর্যন্ত একত্রে বসবাস করেন। অতঃপর কনিষ্ঠতম পুত্র তার মায়ের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে।

বিয়ে-শাদি

মেয়েদের বেলায় অত্যন্ত অল্প বয়সে তাদের বিয়ের বাগ্‌দান করা হয়। কুলীন ব্রাহ্মণ, বৈদিক ও ঝাপানী তাঁতিগণ ব্যতিরেকে, অন্যান্য সকল বর্ণগুলোর মধ্যে বরের পিতা এ উপলক্ষে কনের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করেন। টাকার পরিমাণ ২০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাটিয়ালদের মধ্যে মাদুর তৈরীর কাজে কনে কর্তৃক প্রদর্শিত নৈপুণ্যের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ নিরূপিত হয়ে থাকে এবং বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বে কনের কাজের দক্ষতার উপর টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হয়। এই শ্রেণী কর্তৃক প্রদত্ত সর্বোচ্চ অর্থের পরিমাণ ১০০ টাকা।

শ্রেণী অনুসারে খরচ পত্রের তারতম্য

বিবাহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের খরচপত্রের বিরাট তারতম্য ঘটে থাকে; কিন্তু শহরে অধিক অবস্থাপন্ন হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্নলিখিত হারে এর পরিমাণ নিরূপণ করা যেতে পারেঃ যেমন, উচ্চ শ্রেণীর জন্য ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা, এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ১০০ থেকে ২০০ টাকা। সে সকল ব্যক্তি তাদের পদমর্যাদা দ্বারা স্থিরীকৃত অর্থের পরিমাণ লঙ্ঘন করেন, তারা অধিক সম্মানিত অধিবাসীগণের মধ্যে তাদের নিজেদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হন এবং এ-উপলক্ষে তাদের আচরণ দলের সদস্যদের নিকট নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়ে থাকে। অবশ্য এ অর্থের বেশীর ভাগ অংশ রাত্রিকালীন শোভাযাত্রার সময় পথে পথে ছড়িয়ে দেয়া হয়। সাধারণতঃ এই ধরনের মিছিলে দেশীয় দুর্দশাগ্রস্থ, অর্ধাহারী, টাট্টু ঘোড়ার উপর সমাসীন দামামা-বাদকদল ও ছিন্নবস্ত্র পরিহিত পতাকাবাহীদের একটি সারিসহ—বর বা কনের বন্ধুবান্ধব, বাদ্যকর, কৃত্রিম পুষ্পরাজি বহনকারী, রঙিন আলো এবং আতশবাজি ইত্যাদি বহু কিছু থাকে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিতান্ত দরিদ্র

শ্রেণীগুলোর সর্বনিম্ন খরচে যে অনুষ্ঠানাদি উদ্‌যাপিত হতে পারে, তার পরিমাণ হচ্ছে দশ টাকা। যেমন ঃ

একটি অনুষ্ঠানের সর্বনিম্ন হার

হিন্দু

			টাকা	আনা
ব্রাহ্মণ	...	...	১	০
বর ও কনের জন্য কাপড়-চোপড়	...	...	২	০
শঙ্খ নির্মিত বালা	...	...	১	০
চিরুণী ও সিঁদুর	...	...	০	৪
অলঙ্কারাদি	...	...	১	০
বাদ্যকরগণ	...	...	০	৪
কনের মাথার চূড়া বা চাঁদি	...	...	১	০
ধোপা	...	...	০	৪
নাপিত	...	...	০	৪
ভোজ	...	...	২	০
বিবিধ	...	...	১	০
		সর্বমোট	১০	০

মুসলমান

			টাকা	আনা
কাজী	...	...	০	৮
পোশাক পরিচ্ছদ (বর কনের)	...	...	৩	০
চিরুণী ও অন্যান্য	...	...	০	৪
চুড়ি বা বালা	...	...	০	৮
মাথার চূড়া বা চাঁদি	...	...	০	৮
নাপিত	...	—	০	৪
ভোজ	...	...	২	০
গান-বাজনা ও অন্যান্য খরচ পত্রাদি	...	...	৩	০
		মোট ব্যয়	১০	০

কলকাতা অপেক্ষা এখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ অনুষ্ঠান অধিক অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত হয় বলে কথিত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানকার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানাদিতে অপেক্ষাকৃত কম খরচ করা হয়। অত্যাধিক সম্পদশালী শ্রেণীর মধ্যে শেষকৃত্যমূলক অনুষ্ঠানে যে কোন পরিমাণ বিপুল অর্থ মুক্তহস্তে ব্যয় করার ঘটনা কদাচিৎ ঘটে এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর অধিবাসীদের মধ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত খরচপত্র তুলনামূলকভাবে পরিমিত।

এই উপলক্ষে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু বা মুসলমানের খরচের নিম্নতম হার নিম্নে প্রদত্ত হলো।

হিন্দু

			টাকা	আনা
শেষকৃত্য সংক্রান্ত বস্ত্রাদি	...	...	০	৮
চিতাগ্নি তৈরীর জন্য একজন ডোমকে দেয়	...	...	০	৮
অগ্নিকাষ্ঠ	...	...	০	১২
সন্দাল, ঘি ও বাঁশ ইত্যাদি	...	...	০	৪

শ্রাদ্ধপর্ব

			টাকা	আনা
ব্রাহ্মণ	...	...	১	০
বস্ত্রদান	...	...	১	০
চাল ও ডাল	...	...	২	০
ব্রাহ্মণগণের জন্য ভোজানুষ্ঠান	...	...	১	০
পিতলের পাত্র ইত্যাদি	...	...	১	০
নাপিত	...	...	০	৪
ধোপা	...	...	০	৪
বিবিধ	...	...	০	৮
		মোট	৯	০

মুসলমান

			টাকা	আনা
কবর খননকারী	...	...	০	১২
শবাধার, কাপড়, মাদুর, বাঁশ ইত্যাদি	...	...	১	০
মোল্লা	...	...	০	৪

চতুর্থ ফাতেহা পাঠকারী

মোল্লা	...	...	১	০
খাদ্য ইত্যাদি	...	...	০	৪
তাম্র থালা ও অন্যান্য	...	...	১	০
গরীবদের মধ্যে কড়ি বিতরণ	...	...	০	৪
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফাতেহা উপলক্ষে খরচ	...	...	২	৮
		মোট	৭	০

নিতান্ত গরীব পরিবারের শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পালনের পক্ষে পরিবার যদি খুব গরীব হয়, তাহলে তারা অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কয়েক সের চাল, কিছু তৈলবীজ ও কড়ি বিতরণ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে ডোমদেরকে কদাচিৎ নিয়োগ করা হয় এবং গ্রাম ও শহর উভয় স্থানে যে সকল ব্যক্তি চিতার খরচ যোগাতে অক্ষম তারা মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেয়। মুসলমানদের কয়েকটি শ্রেণী যেমন, রিফুগর ও অন্যান্য কিছু সমাজের অন্তর্ভূক্ত মৃতব্যক্তির জন্য উক্ত সমাজের সদস্যরাই কবর খনন করে এবং মৃতদেহ বহন করে। এটা তাদের এমন একটি কর্তব্য যা' পালাক্রমে তাদের সকলেই পালন করে থাকে। অত্যন্ত গরীব ধরনের লোকেরা কদাচিৎ ফাতেহা পালক করে এবং যারা কোন পরিবার বা বন্ধুবান্ধব না রেখে মারা যায়, তাদের জন্য কখনও ফাতেহা পড়ানো হয় না। ফরায়েজীগণ বিবাহ ও শেষকৃত্য সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি বর্জন করে থাকেন। সুতরাং, এসকল পর্ব উপলক্ষে তাদের ব্যয়ের পরিমাণ সামান্য। কেবল দানস্বরূপ কিছু অর্থই বিতরণ করা হয়।

হিন্দুদের মধ্যে কোন ধাত্রীর ব্যবস্থা নেই

এখানে কোন হিন্দু ধাত্রী নেই। যারা এ পেশায় কার্যরত, তারা সকলেই জাতিতে মুসলমান এবং শহরে বাস করে। সেখানে তারা মহলদারনীদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং একে অন্যের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে বিশেষ বিশেষ এলাকায় তারা তাদের পেশায় কার্যরত

থাকে। খুব কম সংখ্যক গ্রামেই ধাত্রী আছে। সেখানে ধাত্রীর কাজ সাধারণতঃ একজন অভিজ্ঞ প্রতিবেশিনীর দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের স্ত্রীলোককে তার কষ্ট স্বীকার করার দরুন একখানা কাপড় বা অনুরূপ কিছু উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

পারিশ্রমিকের পরিমাণ

নিম্নতম পারিশ্রমিক চারআনায় শহরের একজন ধাত্রীর সেবাকার্য পাওয়া যেতে পারে। পরিচর্যাকারিনীদের পান সুপারি ও তামাকের জন্য এবং মুসলমানদের মধ্যে ৪০ দিনের জ্বালানীর জন্য অন্যান্য খরচপত্র বাবদ আরো ১২ আনা সহ মোট ব্যয় হয় মাত্র এক টাকা।

হিন্দুদের মধ্যে মায়েরাই স্তন্যদান করে

হিন্দুদের মধ্যে ছেলেমেয়েদের লালন পালনের ক্ষেত্রে মায়েরাই সর্বদা নিজস্ব সন্তান সন্ততিদেরকে তাদের নিজেদের স্তন্যদান করে থাকেন, কিন্তু মুসলমান রমণীরা প্রায়শঃই একাজের জন্য নার্স বা শুশ্রুষাকারীনী নিযুক্ত করে থাকেন। মুসলমানদের মধ্যে শিশুদেরকে আফিম খাওয়ানোর রীতি অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। শিশুর অল্প কয়েকদিন মাত্র বয়স হলেই এটা শুরু হয় এবং সাধারণতঃ চার বছর বয়স পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আফিম খাওয়ানো অব্যাহত থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আফিম খাওয়ানো হয় যে, তা শিশুকে সর্দি বা ঠাণ্ডা লাগার হতে থেকে রক্ষা করে।, একারণে পীড়িত অবস্থায় রোগদমনের জন্য এটা আরো ঘন ঘন সেবন করানো হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ অভ্যাসটা মাঝে মধ্যে স্থানীয় নার্সদের দ্বারা ইউরোপীয় পরিবারে প্রবেশ করে।

আফিম সেবনই প্রায়শঃ শিশু মৃত্যুর কারণ

আমার বিশ্বাস, আফিম সেবনের মাত্রাধিক্যতা হেতু মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বিগত আট মাসের মধ্যে আমি দশ মাসের কম বয়স্ক শিশুদের দুটো ঘটনা দেখেছি। এদের মৃত্যু এরূপ আকস্মিকভাবে আফিম সেবনের জন্যই হয়েছে। আমি একটি ইউরোপীয় পরিবারের অন্য একটি ঘটনার কথা জানি, যেখানে ঐ একই কারণে পিতামাতাই তাদের শিশুর অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।

অবস্থাশালী হিন্দুদের কথাবার্তা ও জীবন যাত্রার পদ্ধতি

অবস্থাশালী হিন্দুশ্রেণী তাদের কথাবার্তা বলার ধরনধারণে, লেখায় ও জীবন যাত্রার পদ্ধতিতে কলকাতার লোকদের অনুসরণ করে থাকেন। গৌড় বা এতদঞ্চলীয় বাংলা ভাষার (এই ভাষা পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর অধিবাসীদের নিকট প্রায় সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য) স্থান এদেশের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ব্যবহৃত কলকাতার কথ্য ভাষা দখল করেছে। এরা কলকাতায় তাদের হিন্দু স্বজাতিদের মধ্যে প্রচলিত আমোদপ্রমোদ, অনুষ্ঠান ও অভ্যর্থনা ইত্যাদি জ্ঞাপনের রীতিনীতিও অনুসরণ করে থাকেন।

পর্দা

দেশের এ অংশে হিন্দুদের মধ্যে রমণীদের পর্দা পালনের ব্যাপারে খুব একটা নজর দেওয়া হয় না। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে এটা কঠোরভাবে পালন করা হয়। একমাত্র যারা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত কেবল তারাই সদাসর্বদা প্রকাশ্যে চলাফেরা করে থাকে। এটা উল্লেখ্য যে, নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের কিছু সংখ্যক পুরুষদের ন্যায়ই কঠিন পরিশ্রমের কাজ কর্ম করে থাকে। বিশেষতঃ কুটিয়াল শ্রেণীর রমণীগণ ধান ভানে, দালান নির্মাণ কাজের জন্য ইট ও অন্যান্য উপকরণ বহন করে। এছাড়া, যারা জেলে ও বেদে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তারাও নৌকা বাওয়া, মাছ ধরা ইত্যাদির মত দৈহিক শ্রম-সাপেক্ষ কাজে নিয়োজিত থাকে।

পালঙ্কের ব্যবহার

শহরের মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মুসলমান রমণীগণ বস্ত্র বোরকায় আবৃত হয়ে দুজন বাহক দ্বারা বাহিত 'দুলী অথবা পালকিতে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাকেন। পালঙ্কের ব্যবহার সচরাচর প্রচলিত নয় এবং বলদ কিংবা অশ্ব দ্বারা টানা গরু কিম্বা ঘোড়ার গাড়ী সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত। এখানে কিছু সংখ্যক স্থানীয় লোক ঘোড়ার পিঠে চড়ে। জমিদারদের বেশীর ভাগই হাতি পোষেন; কিন্তু এদেশে ভ্রমণের সাধারণ ব্যবস্থা হলো জলপথ।

পোশাক পরিচ্ছদ

এখানকার নিম্নশ্রেণীর মেয়ে ও পুরুষরা—প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে বসবাসকারী একই অবস্থার ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিক উন্নত পোশাক-

পরিচ্ছদ ব্যবহার করে। এদের কম সংখ্যক ব্যক্তিকেই দুই বা ততোধিক স্বতন্ত্র বস্ত্র বা পরিচ্ছদ ব্যতিরেকে চলতে দেখা যায়। শহরে ছাড়া, চামড়ার জুতো খুব বেশী একটা পরিধান করা হয় না। গ্রামে কাঠের জুতা বা খড়ম ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণতঃ একটি কাঠের বোতাম লাগিয়ে কিছুটা স্যাণ্ডেলের ন্যায় ব্যবহার করা হয়, অথবা পায়ের পাতা ও গোড়ালির চতুর্দিকে একটি ফিতা বাঁধা থাকে। এ কাজের জন্যে মুসলমানগণ এক টুকরা চামড়ার পাতলা ফালি এবং হিন্দুরা শণ বা সুতার দড়ি ব্যবহার করে।

হিন্দু-মুসলমান রমণীদের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান

হিন্দু ও মুসলমান রমণীরা একই ধরনের বস্ত্র পরিধান করে। একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে আচলের রঙে। হিন্দু রমণীরা পরে লাল-রঙা আঁচলের শাড়ী, আর মুসলমান মহিলারা পরিধান করে কালো আঁচলের শাড়ি। এখানকার হিন্দু রমণীগণ কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত সমগ্র হাত প্রায়ই শঙ্খ নির্মিত বালা পরিধান করে আবৃত করে ফেলে। এই সমস্ত অলঙ্কার ও রৌপ্য নির্মিত মল বা পাঁইজর প্রায়ই বেশী দামী হয় এবং বংশ পরম্পরায় এক কন্যার থেকে আর এক কন্যার হাতে গিয়ে পড়ে। হাতের বালা এবং কপালের উপর ডোরা-কাটা সিঁদুর হচ্ছে সধবার অর্থাৎ স্ত্রীর স্বামী জীবিত থাকার চিহ্ন। বিধবা ও অবিবাহিতা মেয়েদের এগুলো পরবার সুযোগ নেই। মুসলমান মেয়েরা শাঁখার পরিবর্তে লাক্ষা বা গালা, কাঁচ বা রৌপ্য নির্মিত বালা ব্যবহার করে থাকে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত অন্যান্য অলঙ্কারাদি হচ্ছে চৌকা-কাঁচ বসানো হাতের আংটি, নাক ও কানের রিং, গলার হার, চুলের জন্য পিপা-আকৃতির অলঙ্কারাদি—যাতে মাদুলী বা রক্ষা কবচ থাকে। উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ছোট ছোট মুক্তা ইত্যাদি নির্মিত অলঙ্কার এবং গরীবদের মধ্যে টিন, পিতল, সীসা ও দস্তার মিশ্রিত দ্রব্যাদি দ্বারা তৈরী অলঙ্কারপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

মেয়ে ও পুরুষ উভয়ই পান ও তামাক ব্যবহারর প্রতি পুরোমাত্রায় আসক্ত। শহরের লোকেরা সাধারণতঃ তামাক সেবন করে। কিন্তু গ্রামে স্ত্রীলোকেরা এটা পানের সঙ্গে চর্বন্ করে থাকে।

প্রচলিত কুসংস্কার

সাধারণভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের রীতিনীতিগুলো তাদের ধর্মের সঙ্গে এতই সংমিশ্রিত যে, এগুলোর যে কোন রকম বর্ণনা হবে—তাদের অসংখ্য অবাস্তব কুসংস্কার ও আচার অনুষ্ঠানাদির বিরক্তিকর বিবরণ। এ রকম একটি কুসংস্কারের কথা অবশ্য উল্লেখ করা যেতে পারে, যা বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে বহুল প্রচলিত। এটা হলো—শিলা বৃষ্টির হাত থেকে প্রজা কর্তৃক তাদের ফসল রক্ষার্থে লোক নিয়োগ। যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষমতার অধিকারী বলে ভান করে তাদেরকে 'শিলারী' নামে অভিহিত করা হয়। এই জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা ময়মনসিংহে এরকম গ্রাম খুব কমই আছে, যেখানে তাদের একজন লোক নেই। এরা প্রধানতঃ যোগী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং নির্ধারিত মাসিক বেতন লাভ করে। এই বেতন নগদ টাকায় ও শস্যে এবং গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে সাধারণ বা পাইকারী হারে চাঁদা তুলে পরিশোধ করা হয়। খোলা মাঠে বছরে একবার সমবেত প্রজা সাধারণের উপস্থিতিতে শিলারী কর্তৃক পূজা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে একটি ছাগল ছানা, একটি বিড়াল ছানা, একটি মুরগী ও একটি সিঙ্গী মাছ (সবগুলোই কালো রঙের) উৎসর্গ করা হয়। প্রথমটি জবাই করা হয়, কিন্তু বাদবাকিগুলো বিরাট একটি মাটির পাত্রের ভিতরে জীবন্ত সমাধিস্থ করা হয়। এই পাত্রের উপর ঐ একই আকার ও মাপের অন্য একটি পাত্র উল্টো করে বসিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর সম্পূর্ণ বস্তুটার উপর মাটি ফেলে ঢিপিতে পরিণত করা হয়। শিলাবৃষ্টি শুরু হলে, শিলারী তার কুঁড়েঘর থেকে উলঙ্গ অবস্থায় দ্রুতবেগে বের হয়ে আসে এবং কৃত্রিম ঢিপির উপর তার অবস্থান নেয়। এখানে সে তার বুকের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে ঝুলানো মোষের শিঙ্গা বাজায়, পালাক্রমে পুনঃ পুনঃ মন্ত্র পাঠ করে এবং ত্রিশূল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে "ঝড়ের দৈত্য"কে তার আবাস স্থলের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ভান করে। সকলের বিশ্বাস, জয়ন্তিয়া পাহাড় ঝড়ের দৈত্যের বাসস্থান। শিলাবৃষ্টি স্থান বিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে; অনেক সময় এক জমি থেকে অন্য জমি পর্যন্ত কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে শিলা পড়ে। এর ফলে মধ্যবর্তী ক্ষেত রক্ষা পেয়ে যায়। শিলারীগণ এসব অবস্থার সুযোগ নেয়, এবং শিলাকে পার্শ্ববর্তী গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়ার মত ক্ষমতা তাদের আছে বলে ভান করে থাকে। এভাবে যাদের জমি ক্ষেত পর পর তিন চার বছর শিলা বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যায়, তারা তাদের নিযুক্ত শিলারীকে

একজন অতি মূল্যবান ব্যক্তিরূপে শ্রদ্ধা করে। ফলে সে একই কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কম ভাগ্যবান শিলারী অপেক্ষা প্রায়শঃই দ্বিগুণ পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি

উভয় পক্ষ কর্তৃক কাপড়ের নীচে একে অন্যের হাত স্পর্শ করে ক্রয়-বিক্রয়ের পদ্ধতি বা "স্পর্শের অঙ্ক" বলে আখ্যায়িত রীতি—প্রায়শঃই এই স্থানে, নারায়ণগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে অনুসৃত হয়। তাঁতি ও বণিকদেরও 'তার' (Tar) নামে কথিত তাদের নিজস্ব বাণিজ্যিক ভাষা আছে। এই ভাষায় অন্যান্য ব্যক্তি-দের সম্মুখেই দর কষাকষি হয়ে থাকে। একজন হিন্দু বণিক যখন ব্যবসায়ে ফেল হয়, তখন সে মধ্যাহ্নে তার দরজায় একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে প্রকাশ্যে নিজের দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা করে। আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতে এই রীতি প্রচলিত। কিন্তু এখানকার দেউলিয়াপনার বিরল ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, এ ধরনের প্রদর্শনী কদাচিৎ দেখা যায়। বিগত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এর চারটির বেশী দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না বলে জানা যায়।

আমোদ-প্রমোদ

এ দেশীয় প্রধান প্রধান আমোদ প্রমোদ হচ্ছে ঘুড়ি উড়ান, বুলবুলির লড়াই, নাচগান, লীলা ও তাস খেলা ইত্যাদি। আগের দিনে নৌকা বিহার ছিল শহরের অত্যন্ত অবস্থাশালী শ্রেণীর লোকদের একটি প্রচলিত ও প্রিয় অবসর-বিনোদন ব্যবস্থা। সম্ভবতঃ নবাবদের দ্বারা এর সূচনা হয়েছিল যাদের অনেকেই নৌকা বিহারে প্রচুর আমোদ লাভ করতেন। তাঁদের বিরাট বিরাট রাজকীয় প্রমোদতরীগুলো জাঁকালো করে সাজানো হত, এবং এসব তরীর অগ্রভাগের আকৃতি অনুসারে যেমন, ময়ুর থেকে "ময়ুরপঙ্খী", মগর (হাঙ্গর) থেকে "মগর চেরা" ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। নবাবদের অনুকরণে বণিক, তাঁতি ও রিফুগরগণ প্রমোদতরী রক্ষণাবেক্ষণ করতো এবং নানাবিধ সাদা পোশাকে সজ্জিত নাবিকদলসহ তাদের নৌকাগুলো সৌখিনভাবে সাজিয়ে তোলা হতো। এ সময়ে চন্দ্রালোকে অনুষ্ঠিত নৌকা বাইচ ছিল লোকদের অন্যতম প্রধান আমোদ প্রমোদ। দেশের বহু অঞ্চলে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহে রায়তদের বড় বড় ধর্মীয় উৎসবগুলোতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা এখনও জনপ্রিয় আনন্দানুষ্ঠান।

ঘুড়ি উড়ানো উৎসব

ঘুড়ি উড়ানো দেশের এ অংশে অত্যাধিক প্রচলিত আমোদ প্রমোদ বলে প্রতীয়মান হয়। এই শহরে শীতের মৌসুমে এবং গ্রামে প্রধানতঃ বসন্তকালে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তরুণ বয়সের লোক ও বালকেরা এতে যোগদান করে। এবং এই খেলায় তারা হাতের এরূপ কৌশল প্রদর্শন করে থাকে, যা সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোন দেশের পক্ষেই অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ঘুড়িগুলো সাধারণতঃ ছোট্ট এবং হালকা হয়। এগুলো খুব পাতলা কাগজ এবং বাঁশের লম্বা ও সরু টুকরো দিয়ে তৈরী করা হয়। ঘুড়িটা একগাছি খুব দীর্ঘ রেশমী অথবা সাধারণ সুতা দিয়ে বাঁধা থাকে। তারা এই ঘুড়ি দিয়ে পাখিদের উড়বার অনুকরণে কিছু সংখ্যক অভিব্যক্তি বা ভঙ্গির অভিনয় করিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের একে অন্যের ঘুড়ির সুতা কাটবার অভিপ্রায়টাই হচ্ছে মুখ্য এবং এতে পরাজিত পক্ষ তাদের ঘুড়ি হারায়। চড়ক পূজার প্রথম দিনে (১১ই এপ্রিল) আবালবৃদ্ধ মিলে বহু লোক ঘুড়ি উড়াবার জন্যে দেশের প্রধান প্রধান গ্রামের সন্নিকটে সমবেত হয় এবং মাঝে মাঝে এক স্থানেই তিনশোরও অধিক লোককে এই খেলায় মত্ত থাকতে দেখা যায়। এটি বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব। এ দিনটিতে সারা দেশের হিন্দুগণ ভাতের পরিবর্তে 'ছাতু' নামে পরিচিত চূর্ণ করা যব খেয়ে থাকে।

এ দেশে আর একটি শ্রেষ্ঠ আমোদের দিন হচ্ছে মকারসংক্রান্তি বা পৌষ মাসের শেষ দিন (১৩ জানুয়ারী)। এইদিনে হিন্দু জমিদারগণ তাদের জমিদারীতে ব্রাহ্মণ ও প্রজাবৃন্দকে আতিথেয়তা প্রদান করেন। উন্মুক্ত মাঠে ভোজ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এবং অভ্যাগতদের মধ্যে চাল, গুড় ও তেলের তৈরী পিঠা ও ডাবের পানি বিতরণ করা হয়। এটি বাস্তুপূজা নামে পরিচিত, এবং এ উপলক্ষে বিক্রমপুরে কুস্তি, লম্ফদান ইত্যাদি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

প্রধান খেলা "আরুন্দা" নামে পরিচিত

এ জেলার খেলাধূলার মধ্যে প্রধান খেলা "আরুন্দা" নামে পরিচিত। এই খেলা কিছুটা 'গলফ' খেলার অনুরূপ। এটা বিশেষ দুটো দলের মধ্যে ছোট ছোট বংশদণ্ড ও কাঠের বলের সাহায্যে খেলা হয়ে থাকে। শীতের মৌসুমে এটি দেশের তরুণদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রিয় আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা।

জালের সাহায্যে হরিণ ধরা

হিন্দু-জমিদারগণ নিজেরা জালের সাহায্যে হরিণ ধরায় আনন্দ লাভ করেন এবং মুসলমানগণ সাধারণতঃ গুলি করে শিকার করতে ভালবাসেন।

মৃগয়া বা গুলি ছোঁড়া

মুসলমানগণ একাজটি শীতকালে শহরের কাছাকাছিতে ব্যাপকহারে করে থাকেন।

মাছ ধরা

বর্ষার শুরুতে বুড়িগঙ্গায় ছিপ ফেলে মাছধরা বেশ প্রচলিত। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীগণ এই কৌশলটি ভালভাবে রপ্ত করতে পারেনি। তারা যে রকম অনিপুন ও অগোছালোভাবে এ কাজটি করে থাকে, তাতে এ খেলা সম্বন্ধে ডঃ জনসনের সুপরিচিত সংজ্ঞাটি প্রায় যথার্থ মনে হয়। হিন্দুগণ ভেড়া, বুলবুল, দোয়েল ও মোনিয়া পাখির লড়াই ভালবাসে। তারা প্রধানতঃ দূর্গাপূজা উৎসবের সময় এ খেলার ব্যবস্থা করে থাকে। শেষোক্ত খেলাটির মাধ্যমে (অর্থাৎ মোনিয়া পাখির লড়াই) তারা মাঝে মাঝে প্রচুর টাকা পয়সা হারে এবং জিতে।

গৃহাভ্যন্তরীণ আমোদ প্রেমোদ

তাদের অন্যান্য গৃহাভ্যন্তরীণ আমোদ প্রমোদের মধ্যে রয়েছে পাশা খেলা, কড়ি ও তাস খেলা, ডিম ও নারকেল ভাঙ্গা ইত্যাদি। তাঁতি ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের মধ্যে নাচ ও লীলা বা মঞ্চে অভিনীত কৃষ্ণের লীলা বেশ প্রচলিত।

সঙ্গীত বিষয়ক বাদ্যযন্ত্র

হিন্দুদের ব্যবহৃত বেহালা বহুল প্রচলিত। কিন্তু এর স্থান সম্ভবতঃ 'ভায়োলিন' দখল করতে পারে, এটি সম্প্রতি দেশের এ অংশে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভায়োলিন তৈরীর জন্যে শহরে কয়েকটি কারখানা আছে। এছাড়া, প্রতি বছরে নির্মিত যন্ত্রের বিপুল সংখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল সমূহে এসব যন্ত্রের বিরাট চাহিদা রয়েছে। গোঁসাই ও বৈরাগীরা এর প্রধান বাদক বা বাজনাদার। মুসলমানদের মধ্যে সঙ্গীত-বিষয়ক প্রিয় বাদ্যযন্ত্র সেতার। তাদের নিষ্ক্রিয় আমোদ

প্রমোদের মধ্যে আছে নাচগান, আতশবাজি, মুরগীর লড়াই, পাশা ও তাস খেলা ইত্যাদি। শেষের খেলাটিতে রাণী বা বেগম নামাঙ্কিত তাস দখল করাই বেশীর ভাগ খেলার মূল লক্ষ্য।

শিক্ষা

বাঙলা ভাষা ও অংক পঠন ও লিখন বা কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাবপত্র সংরক্ষণের পদ্ধতি পঠন ইত্যাদি দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার বিভিন্ন শাখা।

হিন্দু বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে গৃহীত জনসংখ্যা গণনার প্রাক্কালে শহরে ৩০২ জন শিক্ষার্থী সহ এজাতীয় ১১টি হিন্দু বিদ্যালয় বিদ্যমান ছিল। প্রতিজন শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত ছাত্র-বেতনের পরিমাণ গড়ে দু'আনা মাত্র; কিন্তু বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই অত্যন্ত সম্পদশালী অধিবাসীগণের অর্থ সাহায্যে পরিচালিত। পার্শ্ববর্তী এলাকার দরিদ্র অধিবাসীগণ বিনা খরচে তাদের ছেলেমেয়েদেরকে এসব বিদ্যালয়ে পাঠাবার সুযোগ পেয়ে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা দুপুরে খাওয়ার জন্যে দু'ঘণ্টা বিরতি নিয়ে সকাল থেক সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। তারা মাসে ছ'দিন ছুটি পায়। নতুন চন্দ্রে চারদিন এবং পূর্ণ চন্দ্রে দু'দিন।

মুসলিম বিদ্যালয়ের সংখ্যা

১৮৩৮ সালে শহরে মুসলমানদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৯টি। এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১১৫ জন। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এগুলো সবই প্রাইভেট স্কুল। কয়েকজন ধনী ব্যক্তি কর্তৃক শিক্ষকদের বেতন প্রদান করা হয়। পার্শ্ববর্তী ছেলেমেয়েদের বিনা মূল্যে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। বিগত বিশ বছর যাবৎ শ্রীরামপুর মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড মিঃ লিওনার্দ কর্তৃক কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শহরের অধিবাসীগণ ঐ সময়ে তাদের পরিবার-বর্গের শিক্ষার জন্য প্রধানতঃ তাঁর কাছে ঋণী। এক সময়ে সেখানে এ জাতীয় ২৯টি বিদ্যালয়ের কম ছিল না। এসব বিদ্যালয়ে

বাঙলা, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষায় ১,৪০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু অর্থাভাবে ক্রমে ক্রমে এসব প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং বর্তমানে ৫২৯ জন পুরুষ শিক্ষার্থীসহ বিদ্যালয়ের সংখ্যা সাতটিতে এসে ঠেকেছে। মেয়েদের জন্য আছে চারটি বিদ্যালয়। ১৮৩৭ সালে এগুলোতে শিক্ষার্থীনীদের সংখ্যা ছিল ৯৯ জন। একই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে 'কলকাতা বেনেভলেন্ট ইনষ্টিটিউসনে'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠান 'খ্রীস্টয়ান স্কুল'-টিও বিদ্যমান আছে; সেখানে লিখন, পঠন, অংক কষা এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় অনুবাদকরণ ইত্যাদি শিক্ষা প্রদান করা হয়। ১৮৩৮ সনে এতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ছিল ৭৮ জন।

বিক্রমপুর—সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র

দেশের এ অংশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র বিক্রমপুর; খ্যাতির দিক থেকে নদীয়ার পরেই এর স্থান। ১৮৩৮ সনে সাধারণভাবে এইস্থানে, সোনারগাঁও ও সমগ্র জেলাব্যাপী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১২৫। এতে বিদ্যার্থীদের সংখ্যা ছিল ৮২৮ জন। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৪৬৭ জন ছাত্রসহ ৬৮টি বিদ্যালয়ে "কলাপ ব্যাকরণ," বা সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০৬০টি পাতা সম্বলিত মোট পুস্তকের সংখ্যা ২০ এবং শিক্ষা-লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা দশ বছর। ২২৭ জন শিক্ষার্থী সহ ৩৩টি বিদ্যালয়ে ন্যায়শাস্ত্র বা তর্কবিদ্যা হলো জ্ঞানের একটি প্রধান শাখা, এসব এখানে অনুশীলিত হয়। এতে পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা সাত, এবং যুক্তিকৌশলে পারদর্শী হওয়ার নিমিত্ত একজন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় সময় সীমা ধরা হয় বারো বছর। ১৩৪ জন ছাত্রসহ বাদবাকি ২৪টি বিদ্যালয়ে বেদ পঠিত হয়। ১২৪৩টি পাতাসহ গ্রন্থের সংখ্যা ৩০ এবং এগুলো পঠনপাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ধরা হয় আট বছর।

•

জ্যোতির্বিদ্যা

বিক্রমপুরে অনুশীলিত অন্যান্য শাস্ত্রাদি হলো জ্যোতির্বিদ্যা ও আয়ুর্বেদিক বা চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। জ্যোতির্বিদ্যার অনুশীলন বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এঁরা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের সময়

নিরূপণ করেন ও প্রতিবছর পঞ্জিকা লিখেন। আশগাঁ ব্রাহ্মণগণ ঐসব পঞ্জিকা নকল করে শহরে বিক্রয় করেন। বাকেরগঞ্জের বাক্‌লায় এধরনের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এগুলোর কোনটারই নদীয়া থেকে প্রকাশিত পঞ্জিকার মত এত ব্যাপক প্রচলন নেই। শেষোক্তটি এমন একটি পঞ্জিকা, যা প্রধান প্রধান উৎসবগুলোর তারিখ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

চিকিৎসা শাস্ত্র

সাধারণতঃ জ্যোতির্বিদ্যা অপেক্ষা চিকিৎসা-বিদ্যার অধিক অনুশীলন হয়ে থাকে। দেশের বেশীর ভাগ জনপ্রিয় ও মূল্যবান চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থরাজি বিক্রমপুরেই লিখিত হয়েছিল বলে এস্থান একটি বিশিষ্ট মর্যাদার দাবীদার। বিক্রমপুরের গুরুরা বিনামূল্যে শিষ্যদের জন্য আহার, বাসস্থান ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং নিজেরা ধর্মপ্রাণ ও দানশীল ব্যক্তিদের মঞ্জুরীকৃত দানের সাহায্যে পরিবারের ভরণ পোষণ করেন।

ইসলামী উচ্চ শিক্ষার অবস্থা

ইসলামী উচ্চ শিক্ষার জন্য এখানে কোনো সরকারী বিদ্যালয় নেই। শেষ অধ্যাপক যিনি ঢাকায় শিক্ষাদান করেন, তিনি ছিলেন মৌলভী আসাদুল্লাহ নামের জনৈক ব্যক্তি। তিনি মুঘল সরকার থেকে মাসিক ৬০ টাকা বেতন লাভ করতেন। লালবাগে অবস্থিত একটি মসজিদে তাঁর বিদ্যালয় বসতো। এখানে শহরের যুবকদেরকে আরবী ভাষা, যুক্তি শাস্ত্র, সাধারণ দর্শন শাস্ত্র ও আইন সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা হতো। তিনি ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দের দিকে মৃত্যুবরণ করেন এবং ঐ সময় থেকে এখানে উপরিউক্ত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য কোনো সরকারী শিক্ষক নিযুক্ত নেই।

সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী বিদ্যালয়

দেশের এই অংশের অধিবাসীগণ ইংরেজী ভাষায় জ্ঞানার্জন করার জন্য বিরাট আগ্রহ প্রদর্শন করছে ; এবং সে অনুসারে অধুনা সরকার কর্তৃক শহরে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এতে ছাত্রদের উপস্থিতি সন্তোষজনক এবং মোটা-মুটিভাবে বিদ্যালয়টির অবস্থা এখন উন্নয়নশীল ও আশাপ্রদ। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এবং বর্তমানে শিক্ষকদের দক্ষতাপূর্ণ শিক্ষা-

দান কার্যের অধীনে শিক্ষার্থীরা কেবল পড়া, লেখা ও অংক বিষয়েই নয়, উচ্চ পর্যায়ের ভূগোল, ইতিহাস ও জ্যামিতি ইত্যাদি সম্বন্ধেও তারা বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে।

মামলা-মোকদ্দমা, অপরাধ সংঘটন এবং এসবের বাস্তব কারণ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঢাকার অধিবাসীগণ অত্যন্ত কলহপরায়ণ এবং মামলাবাজ; এজন্যে তাদের বদনাম আছে। শহরে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অনবরত ঝগড়া-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকার কারণেই ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে কমপক্ষে ছয়টি 'কোর্ট অব্ জাষ্টিস' স্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। দ্বন্দ্ব বিরোধের প্রতি তাদের এই চরিত্রগত স্বাভাবিক প্রবণতা ও বিভিন্ন আদালতে সংরক্ষিত দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি থেকে—সেই সময় হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত—তাদের এই জাতীয় প্রবণতার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সনের মধ্যে শহরে মাত্র একজন মুন্সেফের কোর্টে রুজু করা মোকদ্দমার নিম্নলিখিত বিবরণ থেকেই দেখা যাবে—কি কি ধরনের বিবাদ-বিসম্বাদ বিদ্যমান আছে যা' সাধারণতঃ দেওয়ানী আদালতের সামনে আনীত হয়।

১৮৩৩ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুন্সেফ আদালতে রুজু করা মামলার সংখ্যা

রুজু করা মামলার সংখ্যা	বিবাদের বিষয়	আদালতে নিষ্পত্তিকৃত	আদালত কর্তৃক ডিসমিস্ করা	আপোষ নিষ্পত্তিকৃত	নথি থেকে খারিজকৃত
২০	অর্থ ঋণ সংক্রান্ত	১২	৩	২	৩
৫৩৯	অঙ্গীকার পত্রে অর্থ ঋণ ...	২৯৯	২৯	১১১	১০০
৩৫	জমা বা গচ্ছিত অর্থ আদায়	১৫	১০	৬	৪
১৯	বকেয়া সুদ ...	১১	২	৪	২
১১৯	কিস্তি বাবদ টাকা পাওনা	৬৪	৬	৩১	১৮
১৩	গৃহীত বিল বা হুণ্ডি ...	৭	২	৩	১

রুজু করা মামলার সংখ্যা	বিবাদের বিষয়	আদালত নিষ্পত্তি-কৃত	আদালত কর্তৃক ডিস্‌মিস্‌ করা	আপোষ নিষ্পত্তি-কৃত	নথি থেকে খারিজ-কৃত
১৬	বিল বা পাওনা হুণ্ডি	১১	০	৩	২
১০	বন্ধকী সম্পত্তির পাওনা টাকা ...	৪	১	২	৩
৬২	রায়তের বকেয়া খাজনা ...	২২	১০	১০	২০
৭৫	মজুরী পাওনা	৪৩	১১	৮	৯
৭	অগ্রিম প্রদত্ত টাকা	৫	১	০	১
১০	খোরপোষের দাবী	৪	১	১	৪
৬১	অলংকারের দাবী	৩২	৬	১০	১৩
২২	জমিজমা ও ঘর বাড়ির মূল্য এবং তালুকের দখলি	১৪	৩	২	৩
৪০	ঘরদোর, কুঁড়েঘর ও জমির দখল	২৮	৪	৪	৪
২	গৃহ ত্যাগের নোটিশ	১	০	১	০
৩১	বাড়িভাড়া	১৫	৫	৫	৬
৫	জমির খাজনা	১	১	১	২
৯	ইষ্টকাদি বিক্রি	৩	২	১	৩
৫	জুতা বিক্রি	৩	০	০	২
৮	শস্য বিক্রি	৩	২	১	২
১৩	গরু বিক্রি	৭	৩	০	৩
৩	সুতা ও রেশম বিক্রি ...	২	১	০	০
১০	শঙ্খ কাটার করাত বিক্রি ...	৬	০	৩	১
৯	কাষ্ঠ বিক্রি	৩	০	২	৪
৩	আমগাছ বিক্রি	১	১	০	১
১১	দুধ বিক্রি	৪	১	৪	২

রুজু করা মামলার সংখ্যা	বিবাদের বিষয়	আদালতে নিষ্পত্তি-	আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত	আপোষ নিষ্পত্তি কৃত	নথিথেকে খারিজ কৃত
৩	ঘাস বিক্রি … …	২	০	১	০
৩	বিবাহচুক্তি খেলাপের দরুন বর কর্তৃক শ্বশুরকে প্রদত্ত অর্থ আদায়	৩	০	০	০
৪	উকিলকে প্রদত্ত অর্থ আদায় …	২	১	১	০
২৯	চুক্তি নামা … …	২০	০	৩	৫
২	বেআইনী জরিমানা ধার্য …	২	০	০	০
৩	অবৈধ বিক্রি … …	০	১	০	২
৫	বিক্রির অর্থ আদায় … …	১	৩	০	১
৬	বর কর্তৃক কনেকে প্রদত্ত কাবিনের ⅓ অংশ আদায় … …	৩	০	০	৩
৫	বন্ধকী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার …	৩	২	০	০
১৭	নৌকাভাড়া … …	৭	৩	৫	২
২৯	বিবিধ … … …	১৩	৬	১	৯
২	শঙ্খ কাটার জন্য করাত ভাড়া	১	০	০	১
১১	শস্যপাতির ব্যবসা সংক্রান্ত …	৩	২	৩	৩
৬৯	বস্ত্রাদি বিক্রয় ,, …	৪২	৯	৯	৯
৭	শাল ,, ,, …	২	১	৪	০
১০	চামড়া ,, ,, …	৬	০	০	০
৬	সাবান ,, ,, …	১	১	২	২
২৫	ইউরোপীয় দ্রব্যাদি ,, …	১২	২	৩	৮
৫	নৌকা বিক্রয় ,, …	৪	০	০	০
৩	ঘড়ি ,, ,, …	৩	০	০	০
৩	চিনি ,, ,, …	২	০	১	০
৫	মাংস ,, ,, …	৩	০	১	১
৪	সুবাসিত তৈল ,, ,, …	১	১	২	০
৪০৩	হিসাবের উদ্বৃত্ত অর্থ পাওনা …	১৫৫	২২	১৫২	৭৪
১৮১৫	মোট	৯১৫	১৫৯	৪০৩	৩৩৮

বিগত দশ বছরে বিক্রয়কৃত স্ট্যাম্পের বার্ষিক গড় পড়তা সংখ্যা ছিল ১, ১১, ৭৯৫টি। এর মধ্যে—

১ আনা	মূল্যের	ছিল	১০,৯৬৭ টি
২ ,,	,,	,,	২৭,৩২৭ ,,
৪ ,,	,,	,,	৬,৮৪৭ ,,
৮ ,,	,,	,,	৪৯,০১০ ,,
১২ ,,	,,	,,	১৯৭ ,,

এক টাকার অনধিক মূল্যের স্ট্যাম্পের গড় পড়তা মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১, ০৫, ১১১।

অপরাধমূলক কাজ

সঙ্ঘবদ্ধ ডাকাতি এবং অলঙ্কারাদির জন্য ছেলেমেয়ে হত্যাজনিত অপরাধ আগের দিনের চেয়ে বর্তমানে কম সংঘটিত হচ্ছে। এক সময় পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো চোর ডাকাতে পূর্ণ ছিল। কোম্পানীর সরকার লাভের পর থেকে কিছু-কালের মধ্যে এই সকল লুণ্ঠনকারীদের মূলোৎপাটন করা হয়। জেলার পুরনো দলিল পত্রে এসব দুর্বৃত্ত কর্তৃক গ্রাম নগর লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ, রায়ত ও তাদের পরিবারবর্গের লোকজন হত্যা এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধ্বংসযজ্ঞ চালনা ইত্যাদির মাঝে মাঝেই রয়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধ ডাকাতি

তারা সঙ্ঘবদ্ধ ডাকাতদল তৈরী করতো। কোন কোন দলে ১,৫০০ জন লোকও পরিলক্ষিত হতো এবং এদের প্রধান নেতা থাকতো একজন দুঃসাহসী সর্দার। এরা সাধারণতঃ কিছু সংখ্যক শক্তিশালী জমিদারের ছত্রছায়ায় থাকতো, আর ঐ সকল জমিদার এদের লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পেত। সেই দিনে কলকাতা বা মুর্শিদাবাদে যাতায়াত ছিল বিপদজনক। এতে আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হতো। এখনকার দিনের ভ্রমণ পদ্ধতির সঙ্গে আগের দিনের বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে নানা সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তার সঙ্গে ভ্রমণ করা যায় এবং এর একমাত্র প্রশংসা তারাই করতে পারেন যারা আগের দিনে ভ্রমণের ঝুঁকি নিয়াছেন।

প্রচলিত অপরাধগুলো হচ্ছে চুরি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অভ্যাঘাত ইত্যাদি এবং এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় বিচারালয়ে মিথ্যা সাক্ষ্যদান, ঈর্ষাবশতঃ সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ ও ব্যভিচার। দুঃসাহসিক সিঁধেল চুরি এখন বিরল ঘটনা। কিন্তু খুব ভয়াবহ না হলেও শহরে এরূপ গৃহ দরজা ভাঙ্গার ঘটনা খুব বিরল নয়। সাধারণতঃ অপহৃত দ্রব্যের মধ্যে থাকে সামান্য কিছু টাকা পয়সা, অলঙ্কারাদি, কাপড় চোপড়, পিতলের বাসন-কোসন ও তাম্রপাত্র, হুক্কা ইত্যাদি। এখানে ইংল্যাণ্ডের পকেটমারদের অনুরূপ একদল সামান্য হাত ছাফাইওয়ালা ছিচকে চোর আছে; এরা সন্ধ্যাবেলায় বাজারে ও জেলায় অনুষ্ঠিত বড় বড় বার্ষিক মেলাগুলোতে ঘুরে বেড়ায় এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবাদি ও বিরাট জনসমাগমপূর্ণ স্থানগুলোতে উপস্থিত হয়। তারা ফেরিওয়ালার দোকান থেকে সামান্য জিনিসপত্র তুলে নেয় এবং ভীড়ের মধ্যে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অলঙ্কার ইত্যাদি কেড়ে নেয়। এ ছাড়া দাঁড়িয়ে-থাকা নিক্রিয় দর্শকদের কাছ থেকে টাকা পয়সা অপহরণ করে। এটা তারা কাপড়ের গিট বা কোনা কেটে সুকৌশলে করে থাকে। কেননা, সাধারণতঃ গিট বা কাপড়ের আঁচলে দেশীয় লোকেরা তাদের টাকা পয়সা বেঁধে রাখে। এই ধরনের চুরি থেকে তারা গিরেকাট্টা বা গাঁটকাটা আখ্যা পেয়েছে। এরা প্রায় সকলেই জাতিতে মুসলমান এবং মাদক দ্রব্য ও জুয়া খেলায় আসক্ত। মন্দ স্বভাব ও কুখ্যাতির জন্যে সাধারণতঃ এসকল চোরকেই সন্দেহ করা হয়ে থাকে এবং বাস্তবিক পক্ষে শহরে সংঘটিত সকল প্রকার চুরি ডাকাতিতে প্রায়শঃ এরা জড়িত থাকে।

উত্তেজক দ্রব্যাদি

উত্তেজক দ্রব্যাদির ব্যবহার এই জেলায় অপরাধ সংঘটনের প্রধান বাহ্যিক কারণ। ১৮০০ সনে এ শহরের ম্যাজিস্ট্রেট বেশীর ভাগ বর্বরোচিত অপরাধের জন্যে এটাকেই মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে বর্তমান দিনেও একই কথা বলা যায়। এদের প্রভাবাধীন ব্যক্তিদের দ্বারা বেশী সংখ্যক নরহত্যা, অভ্যাঘাত ও দাঙ্গা হাঙ্গামা সংঘটিত হয়ে থাকে।

আফিম প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে ও মুসলমানদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে চলে গাঁজা। ১৮২১ থেকে ১৮৩৮ সন পর্যন্ত কালেক্টর কর্তৃক শহরে

বিক্রি করা আফিমের গড়পড়তা বার্ষিক পরিমাণ ছিল ৮৯২ পাউণ্ড। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের জন্য বিক্রি হয় মাত্র ৬৩ পাউণ্ড। অবশ্য এর সঙ্গে আরো যুক্ত হবে সারা বছর চোরাচালানী করা প্রচুর পরিমাণ এ জাতীয় উত্তেজক দ্রব্য; বাস্তবিক পক্ষে এর পরিমাণ সরকার কর্তৃক বিক্রিত দ্রব্যের ১/৪ ভাগের কম নয়। সুতরাং শহরের ৩২,৪৬৩ জন অধিবাসীদের মধ্যে এই দ্রব্যাদি (বৈধ ও অবৈধ) ব্যবহারের মোট পরিমাণ প্রতি বছরে ১৫৬০ পাউণ্ড ধরা যেতে পারে, এটা বৃটেনে এক বছরে ব্যবহৃত পরিমাণের প্রায় ১/৮ ভাগ।

আফিম ব্যবহারের পদ্ধতি

আফিম মাঝে মাঝে সেবন করা হয়; কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উহা সাধারণতঃ পানের সঙ্গে সংমিশ্রিত করে খাওয়া হয়। এভাবে প্রস্তুত দ্রব্যকে বলা হয় 'মদ্দদ'। এ সকল দ্রব্য কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত দোকান-গুলোতেই বিক্রি করা হয়। শহরে এর জন্য অন্ততঃপক্ষে ১৪টি দোকান রয়েছে। এটা উত্তমরূপে শুকনো পান দিয়ে সংমিশ্রিত করে প্রস্তুত করা হয় এবং আফিমের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট ছোট করে কাটা হয়। তারপর কাটা পিণ্ডগুলো আল-কাতরার মত ঘনীভূত না হওয়া পর্যন্ত অল্প অল্প আগুনের উপর রাখা হয়। অতঃপর উহা থেকে ছোট ছোট বড়ি বানানো হয়। এর এক একটি বড়ির ওজন ৮০ গ্রেন বা ৮০ রতি। এই বড়ি মাত্র এক পয়সা মূল্যে ক্রয় করা যায়। গাঁজা এবং এর দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। উদ্ভিদের পুষ্প-মুকুল একটি বিশেষ মৌসুমে সংগৃহীত ও শুষ্ক করা হলে গাঁজায় পরিণত হয়; আবার যখন সবুজ বা নবীন পাতাগুলো ঘর্ষণ করে মণ্ডায় পরিণত করে উহাতে দুধ, চিনি, মৌরীগাছ, এলাচ ও পিপুল ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়, তখন সেই দ্রব্যকে বলে ভাঙ বা সব্জি গাঁজা বা ভাঙ ঘি, দুধ ও চিনি ইত্যাদি মিশিয়ে মাউজন তৈরী হয়; এই মিশ্রিত দ্রব্য আগুনে জ্বাল দিয়ে দিয়ে চেটে খাওয়ার ওষুধে পরিণত করা হয়।

অতঃপর তা' থেকে ছোট ছোট চেপ্টা ধরণের পিঠা বানানো হয়ে থাকে (প্রতিটির আকার বা পরিমাণ প্রায় রূপোর এক টাকার মত)। এক পয়সা দামে এর দুটো খণ্ড সংগ্রহ করা যায়।

চরস

গাঁজার উপকরণ সংগ্রহ করে (যা তেলের আকারে বিদ্যমান আছে বলে প্রতীয়মান হয়) তা সিদ্ধ করে নয়তো বাঁচি পাত্রে কেটে নিয়ে তা থেকে চরস প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। চরস তামাকের সঙ্গে সেবন করা যায়। কিন্তু উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করা ব্যয় বহুল বিধায় কেবল মাত্র ধনী অধিবাসীরাই এটা ব্যবহার করে থাকে। এখানে বিক্রি-করা (বিক্রিত) গাঁজার প্রায় সবটাই অন্যান্য জেলা থেকে বিশেষ করে যশোর ও মুর্শিদাবাদ থেকে আমদানী করা হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রতিবছর এই দ্রব্যের বৈধ বিক্রয়ের পরিমাণ ৩,৮'৬০ পাউণ্ড এবং শহরে ২,১১৬ পাউণ্ড নিরূপণ করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এ জেলায় বেশ কিছু পরিমাণ দ্রব্য চোরাচালানীর মাধ্যমে আসে এবং অনুমোদিত ভেণ্ডার কর্তৃক বিক্রয় হয়, সেহেতু মোট বার্ষিক ভোগ বা ব্যবহারের পরিমাণ উপরিউক্ত পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ ধরে হিসেব করা যেতে পারে। গাঁজা এবং এর অন্যবিধ প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রধানতঃ হিন্দুগণ, বিশেষ করে কালীর উপাসকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভাঁটিখানার সংখ্যা

এ জেলায় উত্তেজক দ্রব্যের প্রায় ৩১টি বৈধ মদের ভাটি বা কারখানা রয়েছে। প্রতিদিন প্রস্তুত করা আরকের মোট গড়পড়তা পরিমাণ ১,৮০০ পাঁইট (দু' পাঁইট প্রায় তিন পোয়ার সমান) ধরা যেতে পারে। এই পরিমাণ ১,৮০০ সালে ম্যাজিষ্ট্রেটের হিসেব অনুসারে প্রস্তুত দ্রব্যের প্রায় অর্ধেক।

আরক

আরক—চোলাইয়ের কাজে ভাউকার (Bhauker) নামে অভিহিত একটি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়, যা' ভাত, আফিম, ধুতরা ও কিছুসংখ্যক অন্যান্য বিষাক্ত উপাদানের সংমিশ্রণে তৈরী। এটা ত্রিপুরা থেকে আমদানী করা হয় এবং প্রতি ১০০০ গোলক বা বড়ি ২½ টাকা বা ৩ তিন টাকায় বিক্রি হয়ে থাকে। এর প্রতিটা বড়ির ওজন প্রায় দশআনা ওজনের সমান। এখানে তিন প্রকারের কড়া মদ্য পাওয়া যায়, এবং প্রতি বোতল (৩০ আউন্স) ৪ থেকে ৯ আনায় বিক্রি হয়ে থাকে। প্রধানতঃ ভাওয়ালের দেশীয় খ্রীস্টান সম্প্রদায়, চণ্ডাল, বেদে, গারুড়ী ও কোচ উপজাতি কর্তৃক আরক ব্যবহৃত হয়।

তাড়ি ও ক্বাথ

এখানে ব্যবহৃত অন্যান্য উত্তেজক মাদকদ্রব্যাদি হচ্ছে তাড়ি ও ক্বাথ। প্রথমোক্তটি এপ্রিল ও মে মাসে বিক্রয় হয়। শহরে এর বিক্রির জন্য মাত্র একটি অনুমোদিত দোকান আছে। কিন্তু পোষীরা, কিম্বা যারা তাল ও খেজুর গাছ থেকে এদ্রব্যটি সংগ্রহ করে আনে, তারা রাস্তায় রাস্তায় এসবের হকারী করে বেড়ায়। সাধারণতঃ শহরের পতিতালয়ের বাসিন্দারা এগুলো ব্যবহার করে থাকে।

ক্বাথ হচ্ছে এক প্রকার গাঁজিয়ে তোলা মস্তপ, যা মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে তৈরী করা হয় এবং গৃহে নিজেদের ব্যবহারের জন্য অনেকটা ইংলণ্ডের মদ ও যবসুরা (সলট-তৈরী সুরা) প্রস্তুত করার মত একই প্রণালীতে বানানো হয়। এই জাতীয় মস্তপ ভাত এবং কয়েক প্রকার বৃক্ষ যেমন কথবেল, গাব, লাউ ইত্যাদির ছাল ও মূল থেকে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। এসব উপকরণ পানি ভর্তি একটি বিরাট মাটির কলসীতে পুরে কিছুকালের জন্য মাটির নীচে ঢেকে রাখা হয় এবং এভাবেই উক্ত মদ তৈরী হয়ে থাকে। গাঁজিয়ে ওঠার সময়ে এই মদ্যপ পান করা হয়। কলসী থেকে দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু তুলে আনা সুরার সম পরিমাণ পানি কলসীর মূল উপকরণাদিতে ঢেলে দেয়া হয়। এভাবে প্রায় তিন মাস ব্যাপী অনবরত সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। এটা প্রধানতঃ মুসলমান কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে পাশাপাশির বসবাসরত কিছুসংখ্যক পরিবার একত্রে মিলিত হয় এবং মদের কলসী নিয়ে বসে। ভাউকার ও অনুরূপ উপকরণ ইত্যাদির সাহায্যে প্রস্তুত ক্বাথ পানের ফলে প্রায়শঃই মাৎলামি শুরু হয়। হোলি উৎসবের সময় সাধারণত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এটা পান করে থাকে।

জুয়াখেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক একটি দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও শহরে এটি খুবই প্রচলিত এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাদক দ্রব্যের পরেই এই খেলা এ জেলায় অপরাধের সবচেয়ে বড় উৎস। মদ্যপ দোকানগুলোতে ব্যাপকভাবে জুয়া খেলা চালানো হয়; কিন্তু এছাড়া শহরের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত জুয়াখেলার আড্ডাও রয়েছে। সেখানে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

না করার জন্য পুলিশদেরকে ঘুষ দেয়া হয়ে থাকে। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা এই খেলার প্রতি আসক্ত হলেও, বিশেষ করে মুসলমান-রাই এ বিষয়ে অগ্রণী। এদের অনেকে প্রায়শঃই এতে দিনরাত মেতে থাকে। তাস, পাশা ও ষোলই (কড়ি খেলা) ইত্যাদি হলো এসকল জায়-গার প্রচলিত খেলা। মাঝে মাঝে বেপরোয়া জুয়াড়ীগণ আরো সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। মেঝের উপর বৃত্তাকারে বসে তারা তাদের স্ব স্ব স্বল্প চিনি মাখানো কাঠিগুলো সামনে রেখে দেয়। অতঃপর জুয়াড়ী দলের মধ্যে, যে ব্যক্তির টাকার উপর কোন মাছি বা পোকা প্রথম উড়ে এসে পড়ে, সেই ব্যক্তিই সমস্তটার বিজয়ী বলে স্বীকৃত হয়।

পতিতালয়

শহরের প্রচুর সংখ্যক পতিতালয়ও অপরাধ সংঘটনের আর একটি উৎস এবং এখানে খুন-জখম, চৌর্যবৃত্তি ও নরহত্যার দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে। এছাড়া, ছোটখাট দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রায় সব সময়েই ঘটে থাকে। সাধারণতঃ আফিম বা গাঁজাখোর ব্যক্তিরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় এসব খারাপ কাজ করে থাকে। এ ধরনের ঝগড়া বিবাদ সাধারণতঃ, বাসাবাড়ি ও সীমানা, পায়ে-হাটা ছোটপথের মালিকানা, একে অন্যের আঙ্গিনায় অনধিকার প্রবেশ এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যকার ঝগড়া ইত্যাদি নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুচী বা চিকন কাজের কর্মীর পক্ষে কাসিদার কাজ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে সময়নিষ্ঠার অভাবহেতু এবং ওস্তাগার এবং ওস্তাগারনী বা এ জাতীয় কাজের তত্ত্বাবধানে বণিক কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তিও মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে বিরাট বাত-বিতণ্ডা ও ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। এই ধরণের সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘ একটানা তর্কযুদ্ধ চলে এবং এতে মেয়েলোকেরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এর ফলে সাধারণতঃ প্রকাশ্য মারামারির সূত্রপাত হয়ে থাকে। অবশেষে বিবদমান পুরুষগণ আফিম বা গাঁজা খেয়ে তাদের সাহস সঞ্চয়-পূর্বক সহসা দ্রুতবেগে বের হয়ে এসে একে অন্যকে লাঠি বা বংশদণ্ড নিয়ে আক্রমণ করে বসে। মারামারি কদাচিৎ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং সাধারণতঃ রক্ত দেখা মাত্র থেমে যায়। অতঃপর জখমী বা আহত পক্ষ দারোগা বা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাদের মামলা তুলে ধরার প্রস্তুতিস্বরূপ যতটা সম্ভব কাপড়চোপড়ে রক্ত মাখাতে যত্নবান হয়ে উঠে।

১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারকৃত মামলা

১৮৩৬ সালে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারকৃত মামলা সমূহের নিম্ন-লিখিত বর্ণনা থেকে সাধারণতঃ এই জেলায় সংঘটিত অপরাধগুলোর কিছুটা নমুনা বোঝা যাবে।

বাদানুবাদ থেকে উদ্ভূত ঝগড়ার মামলা

জায়গাজমি সম্পর্কিত বাদানুবাদ থেকে উদ্ভূত মারামারি বা অভ্যাঘাত জনিত	...	...	...	১৬৭
অনুরূপ ,, ,, ,, ,, ,, (এজমালী সম্পত্তি)	...	...	...	১২
টাকা পয়সা ,, ,, ,,	...	...	...	২৩
জলকর ,, ,, ,,	...	...	...	১১
বাজার ,, ,, ,,	...	...	...	৯
নৌকা ভাড়া ,, ,, ,,	...	...	...	২
জমিদার ও তালুকদারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত	...	...	...	৩৯
জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে খাজনার জন্যে	...	...	...	৬৬
প্রলোভন ও প্রণয়ীদের সঙ্গে রমণীদের পলায়নের ফলে দাঙ্গাহাঙ্গামা ইত্যাদি	...	...	...	৪৩
হিসাব নিকাশ ও নিকাহ ইত্যাদি সম্পর্কিত বাদানুবাদ থেকে উদ্ভূত দাঙ্গাহাঙ্গামা	...	...	...	১৪
গৃহভৃত্যদের বিভিন্ন বকেয়া মাস মাহিনার জন্য অভিযোগ	...	...	...	৬৪
বর্ণ-সম্পর্কিত বাদানুবাদ থেকে উদ্ভূত মারামারি বা অভ্যাঘাত জনিত	...	...	...	১৩
গ্রামের অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপনের নিমিত্ত প্রজাদের প্রলুব্ধ করার কারণে	...	...	...	৮
ব্যক্তিবিশেষকে অন্যায়ভাবে আটক রাখার কারণে	...	...	...	২৯
অনুরূপ গরু বাছুর ধরা	...	...	...	২৩
ঘর বাড়ি, দেওয়াল ও পয়ঃ প্রণালী সম্পর্কিত,	...	...	...	৩২
অনুরূপ পায়ে-হাটা পথ বন্ধকরা থেকে	...	...	...	৩৪

বেআইনী জরিমানা আদায়	...	...	...	৪
রায়ত ও অন্যান্যদেরকে স্বীকারোক্তির দলিলে জোরপূর্বক সই দিতে বাধ্য করার ফলে	...	..	...	২৯
সম্পত্তির বেআইনী দখল	...	...	...	১৭
গাছ-গাছড়া ও শস্যহানি এবং নীল গাছ নষ্ট করার ফলে	...	...	...	১০
বেআইনী মদ বিক্রি	...	...	...	৩
অভ্যাঘাত ও মারপিটের ফলে গর্ভপাতজনিত	...	...	...	৪
বাড়ীঘর নির্মাণ সংক্রান্ত	...	...	...	৯
বেআইনীভাবে অর্থ কেড়ে নেওয়া	...	—	...	১০
টাকা পয়সা নিয়ে গা-ঢাকা দেওয়া বা পলায়ন	...	...	...	৫
গহনাপত্র নিয়ে পলায়ন	...	...	...	৩
বেআইনী সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদি জনিত	...	...	...	২
ঘুষ সংক্রান্ত	...	...	...	৪
জালিয়াতি	...	...	...	২
বলাৎকার	...	...	...	৩
ঈর্ষাবশতঃ সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ	...	...	...	১
ব্যাভিচার	...	...	...	১
চৌর্যবৃত্তি ও রাহাজানি	...	...	..	৪৪
জোরপূর্বক খাজনা আদায় ও বেআইনীভাবে জমি থেকে লোকদের উৎখাত ও অন্যান্য	...	...	...	৫
ছোট খাট অভ্যাঘাত ও দাঙ্গাহাঙ্গামাসহ নানাবিধ ঘটনা ইত্যাদি	...	...	...	৫৬১
মোট :		...	...	১৩০৭

মিথ্যা সাক্ষ্যদান

আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান এখানে অতিমাত্রায় প্রচলিত এবং এসব কাজ এমন লোকেরা করে থাকে যারা সর্বদা এটর্নী ও উকিলদের ছত্র-ছায়ায় বসবাস করছে। আদালতে কি সাক্ষ্য দিতে হবে তাও উকিল

এটর্নীরা তাদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে থাকেন। দলিল পত্রাদির ক্ষেত্রে সহি, শপথ ইত্যাদি দ্বারা সমর্থনের জন্য এবং অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ আকর্ষণকারী ছোটখাট মামলামোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্যদান খুবই ঘন ঘন চলে।

ঈর্ষাবশতঃ অগ্নিসংযোগ

ঈর্ষাবশতঃ অগ্নিসংযোগের ঘটনা সাধারণতঃ খড়কুটা ও বাঁশের ব্যবসায়ীদের দ্বারা সংঘটিত হয়, এবং গিঁটকাটা ব্যক্তিরাও একাজ করে থাকে—যারা শহরে অগ্নিকাণ্ডের সুযোগে তাদের পেশা কার্য চালায়।

ব্যাভিচার

আগের দিনের অপেক্ষা বর্তমানে ব্যাভিচারের ঘটনা অনেক বেশী ঘটছে বলে স্থানীয় অধিবাসীরা জোর দিয়ে বলছে এবং উক্ত অপরাধের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে বিধিনিষিধের শিথিলতাকেই তারা এর কারণ বলে উল্লেখ করে। এই সকল ঘটনার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, গর্ভপাত ঘটানোর নিমিত্ত ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়ে থেকে এবং এ ব্যবস্থা জমিদারগণের অধীনস্থ দাসী-বাঁদীদের মধ্যে এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অনূঢ়া বা অবিবাহিতা কন্যাদের মধ্যেও প্রচলিত।

নরহত্যা

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঈর্ষা থেকে ইচ্ছাকৃত নরহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে, এবং মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টাও একই সঙ্গে করা হয়।

সতীদাহমূলক অপরাধের সংখ্যা

সরকার কর্তৃক সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ করার পর থেকে একজন সতীকেও জোরপূর্বক দাহ করার চেষ্টা করা হয়নি। ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সনের মধ্যে এ জেলাতে একশত পঁচানব্বই জন বিধবা স্বেচ্ছায় তাদের স্বামীদের চিতায় আরোহণ করে। এই সংখ্যার মধ্যে

২০ বছরের কম বয়স্ক ছিল				১০ জন	
২১ থেকে	৩০ বছর বয়স্ক ছিল			৪৩	,,
৩১ ,,	৪০	,,	,,	৪৯	,,
৪১ ,,	৫০	,,	,,	৪৬	,,
৫১ ,,	৬০	;,	,,	৩৪	
৬১ ,,	৭০			১২	
	৭০ বছরের উর্ধ্বে ,,			১	,,

এদের আবার ২৮ জনের কোন সন্তানাদি ছিল না, এবং ২৪ জনের ছিল না কোন শিশু সন্তান।

জমিদারগণের পীড়ন বা অত্যাচার

ইতিপূর্বে জমিদারদের মধ্যে রায়তদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি প্রদান ও তাদেরকে খাজনা দিতে বাধ্য করা ইত্যাদি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সম্ভবতঃ সরকারের হাতে তারা নিজেরা যে নিগ্রহ ভোগ করতো তারই প্রতিশোধ তারা নিত প্রজাগণের উপর। বিশেষতঃ মুর্শিদকুলি খানের আমলে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত রাজকর্মচারীগণ বলপূর্বক খাজনা আদায় করতে গিয়ে মাঝে মাঝে অত্যন্ত ঘৃণ্যজনক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতো। মাঝে মধ্যে সাংঘাতিক ধরনের শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে জমিদারগণ তাদের রায়তদেরকে বন্দী করা ছাড়া, অন্য কোনরূপ শাস্তির ব্যবস্থা কদাচিৎ করে থাকে। তারা বা তাদের পাটোয়ারী ও নায়েবগণ তাদের জমিদারীতে সংঘটিত বেশীর ভাগ ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ ও দ্বন্দ্বকলহ নিষ্পত্তি করে ফেলে। এ উদ্দেশ্যে তারা আনুষ্ঠানিক আদালত বসায়, অভিযোগ ইত্যাদি শ্রবণ করে, এবং অপরাধীগণের জন্য জরিমানা বা অন্যবিধ শাস্তির ব্যবস্থা করে।

জেলখানার অবস্থা

'পুরাতন দুর্গ এলাকায় অবস্থিত এই জেলার দেওয়ানী ও অপরাধ সংক্রান্ত জেলসমূহ একই দালানের অন্তর্ভুক্ত। এতে দশটি ওয়ার্ড আছে। প্রত্যেকটির সামনেই উন্মুক্ত আঙ্গিনা আছে এবং সমগ্র দালানটি বেশ কিছু পরিমাণ জমি-ঘিরে একটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত। এখানে দেওয়ানী আদালতে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীর সংখ্যা ৩০, এবং অপরাধ সম্পর্কিত জেলে আটককৃত

বন্দীদের সংখ্যা ৮০০। গড়ে এদের সংখ্যা হলো ৫২৬ জন। রাস্তায় কর্মরত একজন অপরাধ সংক্রান্ত বন্দীর জন্য দৈনিক বরাদ্দের পরিমাণ হলো দু' পয়সা মূল্যের খাদ্যদ্রব্য ; আর ১৭৯০ সনে এর পরিমাণ ছিল দৈনিক এক আনা।

অপরাধের বিবরণ ও গ্রেপ্তারকৃত, সাজাপ্রাপ্ত ও খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা

ঢাকা জেলার মধ্যে সংঘটিত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং ১৮৩০ থেকে ১৮৩৮ সন পর্যন্ত গ্রেপ্তারকৃত, সাজা প্রাপ্ত ও খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

অপরাধের বিবরণ		অপরাধের সংখ্যা	বিচারার্থে আনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা	সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা	খালাস প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা	বিচারাধীন
হত্যা	... ...	৩৯	১৫৭	৫১	৫২	৫৪
খুন-জখম ;	হত্যার সমতুল্য নয় এমন ...	১৩	৪৪	২০	১৩	১১
ডাকাতি	অত্যাচার সহ ...	১	১৫	৬	৯	০
	আহত বা ব্যক্তিগত আঘাত	১	৬	০	০	৬
	গুরুতর পরিস্থিতিতে অনুপস্থিত	৩৪	৪৭২	৯৯	২২৮	১৪৪
	ডাকাতির চেষ্টা করা ...	৩	৩	১	২	০
	গুরুতর পরিস্থিতি জনিত কারণে হাজিরায় অক্ষম	৭৫	৭৭	২১	৮	৪৮
রাহাজানি	পঞ্চাশ টাকার উর্ধ্বে ...	১৫	২২	১৪	৮	০
	দশ ,, ,, ...	৩৫	৪২	২৩	১৬	৩
	দশ ,, নিম্নে ...	৭৪	৪২	৩১	১১	০
	রাহাজানির চেষ্টা করা ...	১	১	১	০	০
গরুচুরি-সহ চৌর্যবৃত্তি	হত্যা, অলঙ্কারাদির জন্যে ছেলে মেয়ে হত্যা সহ ...	১	০	০	০	০
	গুরুতর পরিস্থিতিতে অনুপস্থিতি ...	১৯৬	২৩৫	১৬৫	৫৫	১৭
	পঞ্চাশ টাকার উর্ধ্বে ...	২৭	৫৩	২৫	২৪	৪
	দশ ,, ,, ...	৩৫	৫৬	৪০	১৪	২
	দশ ,, নিম্নে ...	৯৮	১১১	৮৮	২১	২

অপরাধের বিবরণ		অপ-রাধের সংখ্যা	বিচারার্থে আনীত ব্যক্তিদের সংখ্যা	সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তি-দের সংখ্যা	খালাস প্রাপ্ত ব্যক্তি দের সংখ্যা	বিচা-রাধীন
চুরি যাওয়া বা লুষ্ঠিত সম্পত্তি গ্রহণ ...		৪৫	১৩৪	৭১	৩৭	২৬
দাঙ্গা-হাঙ্গামা	নরহত্যা সহ ...	২	১৭	০	১১	৬
	জীবন বিনষ্ট সহ	১	৫৪	০	৩২	২২
	আহত বা সাংঘাতিক মারধোর করা	৪	৮৬	৪৯	১৭	২০
	চরমভাবে শান্তিভঙ্গ জনিত	৩১	৩১	১২	১৭	২
	সাধারণ	৬	৮৩	৪৫	২২	১৬
দেহে আঘাত বা আহত হওয়া সহ অভ্যাঘাত		৩৩৯	৩৬৪	৫০২	১৪২	৮০
অপরের সম্পত্তিতে বা বীমা করা নিজের সম্পত্তিতে অগ্নি সংযোগ ...		২	২	১	১	০
জালিয়াতি বা মুদ্রা জালকরণ ...		৫	৮	১	১	৬
আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যদান ইত্যাদি		৫	২০	৩	১১	৬
ধর্ষণ		৪	৩	১	১	১
ব্যাভিচার		১	৬	৬	০	০
বিবিধ অপরাধ সমূহ		২৯২৭	৪৭৯৪	৩৫১৬	৮৭৬	২০২
মোট : ...		৪,০২৪	৭,২৩৮	৪,৮৯০	১,৬৬৯	৬৭৮

দশম অধ্যায়

[খাদ্যদ্রব্য—প্রাচুর্য এবং অভাবের কারণ ও ফলাফল—শ্রমের মজুরী—
দরিদ্র ও দাসদাসীদের অবস্থা।]

বাংলার পূর্বাংশ প্রদেশের শস্য ভাণ্ডার

বাংলার পূর্বাংশকে সব সময়ই সমগ্র প্রদেশের শস্য ভাণ্ডার রূপে গণ্য করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের প্রায় শেষ পাদে ঢাকা পরিভ্রমণ করে হ্যামিলটন লিখেছেন যে, "এখানকার খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য আর সস্তামূল্য অবিশ্বাস্য"। প্রায় প্রত্যেক লেখক হয় তাঁর পূর্বে অথবা তাঁর সময় থেকে কিছুটা একই রকমের বিবরণ[১] দান করে গেছেন। অবশ্য সঠিকভাবে চলতে গেলে এই অবস্থা ঢাকার জন্য নয়, বরং চতুষ্পার্শ্বস্থ সিলেট, ময়মনসিংহ, বাকেরগঞ্জ ও ত্রিপুরা জেলার প্রতি প্রযোজ্য—যা' ইতিপূর্বে প্রদেশের প্রধান অংশরূপে গঠিত ছিল এবং ঢাকা নামে পরিচিত ছিল এবং এগুলো তখনকার মত এখনও দেশের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শস্য উৎপাদনকারী জেলা। ঢাকা জেলায় এর অধিবাসীদের জন্য প্রয়োজন মাফিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না এবং এ কারণে উপরোক্ত স্থানগুলো থেকে এ জেলায় প্রায় সমপরিমাণ খাদ্যসম্ভার সরবরাহ করতে হয়। ফলে, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল অপেক্ষা চাল এখানে দুর্মূল্য।

বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড়মূল্য

[কালক্টরেট অফিসে সংরক্ষিত 'সাপ্তাহিক মূল্য তালিকা'
(Weekly Price Current) থেকে উদ্ধৃত]

টাকা আনা পাই	আমন চাল মণ প্রতি
১—০—১৫৳	২৩ বছরের গড়

১ সিজার ফ্রেডারিক ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে সন্দ্বীপের খাদ্যশস্যের সস্তামূল্যের উল্লেখ করে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন যে, তিনি বারো শিলিং ৬ পেন্স দিয়ে ২টা লবণ মাখানো গরুর চামড়া. এবং ঐ একই দামে ৪টা শুকর, এক পেনিতে একটা মোটা তাজা মুরগী এবং অনুরূপ সস্তা দামে অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেন, তথাপি লোকেরা বললো—তিনি দ্বিগুণ মূল্যে এগুলো ক্রয় করেছেন।" পুরকাসের 'কলেকসনস্ অফ্ ট্রাভেলস।'

বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড়মূল্য

টাকা আনা পাই	
০—১৫—৮½	বাজেল চাল মণ প্রতি ২৩ বছরের গড়
০—১৩—১৫½	মশাকারী চাল মণ প্রতি ১৮ বছরের গড়
০—১৩—১২½	আউশ চাল মণ প্রতি ৮ বছরের গড়
২—৪—০	অড়হর ডাল মণ প্রতি ২৩ বছরের গড়
০—১৩—১৩½	খেসারির ডাল ২৩ বছরের গড়
১—১১—৪	মুগ ডাল মণ প্রতি ২৩ বছরের গড়
১—১—৪¾	কলাই এর ডাল মণ প্রতি ২৩ বছরের গড়
০—১০—১৩¾	মটর ডাল মণ প্রতি ২৩ বছরের গড়
১—৪—১৫½	মশুরীর ডাল মণ প্রতি ১৯ বছরের গড়
১—৮—১২¾	বুট মণ প্রতি গড়
১—৮—১৩	গম মণ প্রতি ২৩ বছরের গড

উপরের বিবরণ থেকে ১৮১০ এবং ১৮৩৬ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে শহরে সাধারণভাবে একই ধরনের খাদ্যশস্যের গড়মূল্য পাওয়া যাচ্ছে।

বিভিন্ন সময়ে শহরে খাদ্যশস্যের গড়মূল্য

এই বিবরণ অনুযায়ী এখানে আমন চালবিক্রি হয় মুগডাল, বুট, ও গমের প্রায় ⅓ ভাগ দামে এবং অড়হর ডাল অপেক্ষা প্রায় অর্ধেকেরও কম মূল্যে। বিভিন্ন

রকম ডাল জাতীয় শস্যের চাষাবাদের স্বল্পতাহেতু দেশের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা এখানকার দরিদ্র শ্রেণী কর্তৃক ডাল কম ব্যবহৃত হয়, এবং একমাত্র মাছের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অড়হর ও মুগডাল খেয়ে থাকে। খেশারী হলো সমস্ত রকম শুটি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা এবং হিন্দুগণ এটাকে বিশুদ্ধ বলে গণ্য করেন। ধর্মের বিধান অনুসারে যাদের মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ, তাদের নিকট ভাতের পরেই খেসারির ডাল খাদ্যের প্রধান উপাদান।

গমের ব্যবহার

এ জেলায় গমের ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় লোকজন ও অধিক সম্পদশালী মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা এখানে চাল কিছুটা দুর্মূল্য হওয়া সত্ত্বেও, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য—যেমন, মাছ, শাক সব্‌জি, লবণ ও তেল ইত্যাদির প্রাচুর্যতার দ্বারা সম্ভবতঃ এ দামের পার্থক্যের কিছুটা ক্ষতিপূরণ করা 'হয়েছে। এ সকল দ্রব্যের কোন কোনটা অনেক দূর-বর্তী জেলাগুলো অপেক্ষা এখানে অধিকতর সস্তা।

মাছ

সমস্ত নদী ও জলাভূমিগুলো মাছে পরিপূর্ণ, এবং বলা যেতে পারে ভাতের পরেই এটা অধিবাসীদের খাদ্য সামগ্রীর প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সারা বছর শহর ও গ্রাম উভয়স্থানে বাজার গুলোতে মাছের প্রচুর সরবরাহ থাকে, এবং কয়েক মাস ধরে তারা বিশ রকমের মাছের আমদানী করে থাকে; কলকাতায় সাধারণতঃ যে দাম থাকে, তার অন্ততঃ অর্ধেক দামেই এখানে তা' ক্রয় করা যায়। মাছ কখনও আস্ত, কখনোও টুকরো করে, আবার কখনও বা ভাগা হিসাবে বিক্রি হয়। পুঁটি হলো সব চেয়ে সস্তা দামের মাছ। এক পাউণ্ডের ¼ ভাগ পুঁটি মাছ ৪০ কড়িতে বা এক পয়সার এক চতুর্থাংশ মূল্যে বিক্রয় হয়ে থাকে। এই মূল্য এক ফার্দিং এর ⅙ অংশ অপেক্ষা কিছু বেশী।

শাক-সবজির প্রাচুর্য

আবাদকৃত ও অনাবাদী উভয় রকম শাক সবজিই—মূল ও অপরিপক্ক ফল এবং এর পাতা ও ডাটা ইত্যাদির দুটো বিরাট শ্রেণী নিয়ে গঠিত; এসব

দ্রব্যের প্রাচুর্য মাছের চেয়ে কম নয় এবং দামের দিক থেকেও সস্তা। বাজারে ৮৩ প্রকারেরও বেশী শাক-সব্জি বিক্রি হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে সারা বছর ১৯ প্রকার, ৬ মাস ধরে ১৫ প্রকার, ৪ মাসের জন্য ২০ প্রকার, ৩ মাসের জন্য ২২ প্রকার এবং ২ মাসের জন্য ৬ প্রকার শাক-সব্জি সংগ্রহ করা যায়। দু'বেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মরিচ, বেগুন, কচু বা মিঠা কুমড়া এক পয়সার ½ ভাগ বা এক ফার্দিং এর এক পঞ্চমাংশ মূল্যে পাওয়া যায়।

মশলা ইত্যাদি

মশলা হিসেবে ব্যবহৃত বিবিধ উপকরণ—যেমন, তেল, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ ও আদা ইত্যাদি সব কিছুই প্রচুর এবং দামে সস্তা। তুলনামূলকভাবে লবণ খুব সস্তা এবং গোটা পরিবারে এর নিমিত্ত খরচও সামান্য। এই জেলায় আমদানীকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন সরিষার তেলের দামে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং মাঝে মাঝে দুর্মূল্য হয়ে পড়ে। কিন্তু রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত নানাবিধ স্বাদযুক্ত অম্ল ও তেঁতুলসহ অন্যান্য সকল দ্রব্য মাত্রাতিরিক্ত সস্তা।

লবণ ও তেলের দশ বছরের গড়মূল্য

নিম্নলিখিত বিবরণে লবণ ও তেলের দশ বছরের গড়পড়তা মূল্য পাওয়া যায়ঃ

	ঢাকা	সিলেট	চট্টগ্রাম
মণ প্রতি	টাকা আনা পয়সা	টাকা আনা পয়সা	টাকা আনা পয়সা
লবণ	৪—১৫— ৮	৫— ১— ৫	২— ২— ২
সরিষার তেল	৭—১৩— ৫	৮— ৭—১১	৮— ১— ৯

জ্বালানী প্রচুর এবং সস্তা

পার্শ্ববর্তী জঙ্গল থেকে নলখাগড়া ও ঝোঁপ জঙ্গল ইত্যাদি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলো ছোট ছোট আঁটিতে বিক্রি হয়ে থাকে এবং মাসে এক ব্যক্তির ব্যবহারের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ জ্বালানী তিন আনায় ক্রয় করা যায়। শহরাঞ্চলে বেশীর ভাগ শ্রমিক শ্রেণীর লোকেরা ও অধিবাসীগণ জ্বালানী কাঠ স্তূপাকার করে রাখে—যাতে তাদের এক বছর কেটে যায়। লোকেরা বর্ষার সময়ে এসব কাঠ শহরে নিয়ে আসে এবং নৌকা ভরা কাঠ

ঠিকা দরে বিক্রি করে দেয়। এই মৌসুমে বিশেষ করে জ্বালানী কাঠ খুব সস্তা থাকে।

মাটির তৈরী রান্নাবান্নার বাসনকোসন

এখানকার মাটির তৈরী রান্নাবান্নার বাসনকোসনগুলো নিম্নমানের এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহ অপেক্ষা কিছুটা দুর্মূল্য। হিন্দুদের নিম্নশ্রেণীগুলোর মধ্যে পাথরের থালাবাটি ও দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে কাঠের বারকোশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রস্তুত করা খাদ্যসামগ্রী বিক্রি

প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রী যা' প্রস্তুত অবস্থায় বিক্রি করা হয়, তা'হলো খৈ, চিড়া, চিতাই পিঠা, ফুলরি ও বড়া ইত্যাদি। খৈ তো শুধু ধান[১] (তুষযুক্ত চাল) যা গরম বালুর উপর ঝলসানো হয়, এবং অতঃপর পাতলা চালুনিতে হাত দিয়ে চালা হয়, এর ফলে শস্যদানা[২] থেকে তুষটা আলাদা হয়ে হয়ে যায়। গুড়ের সঙ্গে মিশ্রিত খৈ 'মুড়কি' নামে পরিচিত। ধান থেকে চিড়া তৈরী হয়ে থাকে এবং এটা তৈরীর জন্যে ধান অনেকক্ষণ পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর সেই ভিজা ধান একটি মাটির পাত্রে করে ভাজা হয়; অতপর, উহা চেপ্টা না হওয়া পর্যন্ত, ঢেঁকিতে কোটা হয়ে থাকে। চালে লবণ মিশ্রিত অল্পস্বল্প পানি ছিটিয়ে দিয়ে এবং খৈ-এর মত একই ভাবে গরম বালুতে ঝাল্‌সে নিয়ে যা' তৈরী হয়, তাই 'মুড়ি' নামে পরিচিত। হিন্দুদের যখন রান্নাবান্না করার কোন সুযোগ থাকে না, বিশেষতঃ মাঝে মাঝে তারা যখন মুসলমান বা বিভিন্ন বর্ণের লোকদের সঙ্গে একত্রে জলপথে ভ্রমণ করে তখন তারা এ সকল খাদ্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। অন্যান্য দ্রব্য যেমন চিতাই পিঠা, ফুলরি ও বড়া ইত্যাদি মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত হয়। ফুলরি হচ্ছে পিপুল, রসুন, সরিষার তৈল ও লবণ ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত গুড়া করা বুট বা মটর ডাল। বড়া হচ্ছে একই রকম জিনিসের সংমিশ্রিত দ্রব্য; অবশ্য এর সঙ্গে কিছু শাক্ সব্‌জি,

১ তুষযুক্ত চাল বা ধানের সুমাত্রীর নাম।

২ এরূপ ভাবে গরম বালিতে ঝলসানো শস্যকণা ইহুদীদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্য ছিল যারা ভ্রমণ উপলক্ষে বা সহসা জরুরী অবস্থায় পথে হিন্দুদের ন্যায় খৈ ইত্যাদি ব্যবহার করতো। (Leviticus XXVIII-14) (Samuel XVII. 17 and XXV, 18)।

যেমন মরিচ, বেগুন ইত্যাদিও মেশানো হয়। এজাতীয় কয়েকটি খাওয়ার দ্রব্য মুদি বা শস্যপাতির ব্যবসায়ীদের দোকানে পাওয়া যায়; এবং অপ্রস্তুত অবস্থায় যে দাম থাকে, তা' অপেক্ষা সামান্য কিছু বেশী দামে ক্রয় করা যায়। উপরিউক্ত দ্রব্যগুলো ছাড়া, অধিক ব্যয়সাধ্য আরও কয়েক প্রকার খাদ্যদ্রব্য যেমন খিরসা বা নতুন পনীর ইত্যাদি শহরের রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করে বিক্রি করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে এটি একটি প্রিয় খাদ্য। ছাগলের মাংসের কাবাব, রুটি, পনীর ও বিভিন্ন রকমের মিষ্টান্নদ্রব্য মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য তৈরী করা হয়ে থাকে। শেষোক্তটির মধ্যে সবচেয়ে সুশ্রীমণ্ডিত দ্রব্য ফলদা কেক বা পিঠা, যা' চাল, চিনি, মাড় ও গোলাপ জল ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হয় এবং কিছুটা পাটলবর্ণ বা হলদে রঙের দ্রব্যের সঙ্গে সংমিশ্রণে উহা রঞ্জিত করা হয়ে থাকে। উপরোল্লিখিত অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে একত্রে ফলদা, শরবত ও তৈরী-পান ইত্যাদি প্রতিদিন অপরাহ্নে চকবাজারে বিক্রি হয়; সেখানে প্রস্তুত করা হুকাও কিনতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষিত ফলমূল যেমন আনারস, লেবু, আম, আদা, ও সাতুর মল্লিও (asparagus racemosus) শহরে বিক্রি হয়ে থাকে।

খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়ার প্রধান কারণ পরিবহণের সুযোগ সুবিধা

জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্যের পরে, বাজারজাতকরণের সুযোগ সুবিধাই হলো এসব দ্রব্যের সস্তামূল্যের আর একটি কারণ। এ জেলার অধিবাসীগণ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিষপত্র বহন করার ব্যাপক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে এবং নৌবহণযোগ্য নদ-নদী বিদ্যমান থাকায় প্রজারা অত্যন্ত সামান্য খরচে ও অল্প পরিশ্রমে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজারে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

হাট বাজারের সংখ্যা

শহরের বাজারগুলো বাদে, হাট বা সাপ্তাহিক বাজারের সংখ্যা হচ্ছে ৮১। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অত্র জেলায় আবাদী অংশের ১ থেকে ১২ বর্গ মাইল পরিমিত এলাকা। এসব হাট বা বাজার সপ্তাহে দু'বার কি তিনবার বসে; এবং বিক্রির জন্য নিয়ে-আসা দ্রব্যাদির মধ্যে মাছ ও অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, নানাবিধ কৃষিজ উৎপন্নদ্রব্য, দেশীয় প্রস্তুত জিনিসপত্র যেমন চাল, বিভিন্ন

রকম শস্যপাতি, গুড়, ঘি, লবণ, তেল, তামাক, হলুদ, মরিচ, আদা, পান, সুপারি, মাদুর, তুলা, লোহা, তামা ও পিতলের বাসনকোসন ইত্যাদি থাকে।

একজন মজুরের দৈনিক খোরাকীর ন্যূনতম ব্যয়

একজন শ্রমিকের দৈনিক খোরাকির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন আড়াই পয়সা, কিন্তু একটি পরিবারে বা যেখানে দু' বা ততোধিক লোক একত্রে বসবাস করে, সেখানে দু' পয়সার কিছু কম খরচ পড়ে। শহরে বহু হিন্দু তাঁতি আখড়ায় বসবাস করে এবং তাদের থাকা খাওয়ার জন্য দৈনিক বা মাসিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তারা বৈরাগীদেরকে দিয়ে থাকে; এর সাধারণ হার হলো দৈনিক একআনা, যার জন্য তারা দু'বেলা ডাল ভাত খেতে পায়। এ সকল আখড়া বা সন্ন্যাসাশ্রমগুলো সরাইখানার অভাব পূরণ করে থাকে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য কৃষ্ণ-পূজারীগণ শহরে এলে তারা এখানে মাঝে মাঝে আশ্রয় পেয়ে যায়। এ জেলায় কোন সরাইখানা নেই। সুতরাং যে অল্প কয়েকজন লোক স্থলপথে ভ্রমণ করে, তারা এসব আখড়া বা মুদিখানা কিম্বা শস্য ব্যবসায়ীদের দোকানপাটে থাকা খাওয়ার সুযোগ পায়।

প্রাচুর্য ও অভাবের কারণ এবং ফলাফল

এই জেলায় প্রচুর ফসল উৎপাদনে যা প্রধান ভাবে কাজে লাগে তা' হচ্ছে পূর্ববর্তী বছরের ব্যাপক জলমগ্নতা ও শীত মৌসুমের পরিমিত বৃষ্টিপাত। এর ফলে কৃষক সহজেই তার জমি চাষ করতে সক্ষম হয়। এরপর বসন্তের মাসগুলোতে ভারী বৃষ্টিপাত এবং পরবর্তী সময়ে নদ-নদীতে ক্রমান্বয়ে পানি বৃদ্ধি ইত্যাদি ধান্য উৎপাদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। এই জেলার অসাধারণ প্রাচুর্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত রেকর্ডে পাওয়া যায় এবং এসব ক্ষেত্রে চালের সর্বনিম্ন মূল্য এক টাকায় ৮ মণ বা ৬৪০ পাউণ্ড ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে উক্ত দরে চাল বিক্রয় হয়েছিল; এ সময়ে নবাব শায়েস্তা খান এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে শহরের পশ্চিম দরজা নির্মাণ করেন এবং সেখানে এই মর্মে একটি নিষেধাজ্ঞা থাকে যে, চালের দর পুনরায় অনুরূপ সস্তা না হওয়া পর্যন্ত উক্ত দরজা কারো খোলা উচিত হবে না। কথিত আছে যে, ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে সরফরাজ খানের সহকারী যশবন্ত রায়ের সময়ে অনুরূপ প্রাচুর্যমণ্ডিত ফসল পুনরায় না-ফলা পর্যন্ত উক্ত দ্বার বন্ধ থাকে। বিপুল প্রাচুর্যের মৌসুম হিসেবে

১৭৭২, ১৭৯৫, ১৭৯৬ এবং ১৭৯৭ ইত্যাদি বছরগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। পরবর্তী বছরে ফসল এত প্রচুর ফলেছিল যে, এ জেলায় কৃষি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য বাজারের অভাবে সরকারী রাজস্ব ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই সময়ে এক টাকায় আট মণ চাল বিক্রয় হয়। কালেক্টর কর্তৃক উল্লেখিত হয় যে, মরিচ প্রতিমণ ২½ থেকে ৩ টাকায় বিক্রি হতো, এখন তা' বাজারে নেয়ার মত খরচে কদাচিৎ বিক্রি হয়। প্রতিমণ গুড়ের দাম ৪ টাকা থেকে ১২ আনায় নেমে আসে এবং সাধারণ ব্যবহারযোগ্য অন্যান্য দ্রব্যের প্রায় প্রত্যেকটি সমান সস্তামূল্যে বিক্রয় হয়ে থাকে। ফসল উৎপাদনের এই প্রাচুর্য থেকে যারা সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হয়, তারা হচ্ছে বণিক সম্প্রদায়। এরা রপ্তানীর জন্যে শস্য ক্রয় করে। তাদের হাতে পুঁজির কর্তৃত্ব থাকায়, তারা বাজারে শস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। কেননা, প্রজারা সাধারণতঃ চড়া সুদে তাদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ফলে, তারা তাদের ঋণ পরিশোধনার্থে ও জমিদারের খাজনা প্রদানের প্রয়োজনে সাধারণতঃ ফসল কাটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মাঠের উৎপন্ন ফসল বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়; তাদেরকে এমন এক দরে বিক্রি করে দিতে হয়—যাতে খুব সামান্যই লাভ হয়ে থাকে। শহরের অধিবাসীরাও ফসলের প্রাচুর্য থেকে বেশ লাভবান হয়ে থাকে; কিন্তু খাদ্য-শস্যের মূল্য হ্রাস পেলেও, জেলার অন্যান্য কৃষিজ পণ্যদ্রব্য কিম্বা যেকোন সাধারণ শিল্প দ্রব্যের দাম কখনও কমেনি। প্রজারা যারা ঋণের জালে আবদ্ধ নয়, তারা এক বছর ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য রেখে দিয়ে, সাধারণতঃ বাদবাকী মজুদ-চাল তাদের প্রতিবেশীদেরকে ধার দিয়ে থাকে। আমার বিশ্বাস, সমগ্র ভারতবর্ষে এটা একটা সাধারণ রীতি এবং নক্স (Knox) কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছে যে, তাঁর সময়ে এই পদ্ধতিতে সিংহলে শতকরা পঞ্চাশভাগ লাভ নেয়া হতো। প্রতিমণ খাদ্যশস্যের জন্যে বছর শেষে দেড়মণ খাদ্য ঋণদাতাকে ফেরৎ দিতে হয়। মাঝে মাঝে ছ'মাস অন্তে ঋণ পরিশোধ করা হয়ে থাকে। শস্যের মান ও প্রকার অনুসারে সুদের হারের তারতম্য ঘটে, কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রে পরিশোধের পদ্ধতি ও তারিখ লেনদেনের সময়ে লিখিতভাবে উল্লেখ করা থাকে।

প্লাবন ও প্রবল বৃষ্টিপাত থেকে অভাবের সূত্রপাত হয়

অপ্রাচুর্য বা অভাব প্রায়ঃশই ব্যাপক প্লাবন থেকে কিম্বা মৌসুমের প্রথমেই অত্যাধিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত থেকে দেখা দেয়। অতিবৃষ্টি মাঝে মাঝে আউশ ধানের বীজের বর্ধনক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং আউশ ফসলের ছোট ছোট চারা গাছগুলোর ব্যাপক ক্ষতিসাধনও করে থাকে। কয়েকটি কারণে আংশিক বা স্থানীয় অভাবের সৃষ্টি হয়। জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষতঃ বাকেরগঞ্জে কাঁকড়া মাঝে মাঝে ধান গাছের বোটা বা ডগা কেটে দিয়ে আউশ ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে থাকে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বুজের্গ উমেদপুর পরগণা ও এর পার্শ্ববর্তী আরও সাতটি জমিদারী এলাকা এই কারণে এত বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল যে, এজন্য সরকার কর্তৃক ৪২,২৬৮ টাকার রাজস্ব আদায় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে দেশের ঐ একই অঞ্চলে একই রকমভাবে অর্ধেক পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়ে যায়।

আগাছাজনিত ক্ষয়-ক্ষতি

জলাভূমির উপরিভাগ থেকে ভেসে আসা স্বতন্ত্র আগাছা ও জলজ উদ্ভিদ যেমন, পানা এবং হিংস্বা মাঝে মাঝে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এগুলো অনেক সময় একত্রে ব্যাপক আকারে মাঠে ভাসতে থাকে এবং মরে না যাওয়া পর্যন্ত ফসলের গাছগুলোকে পানির নীচে ডুবিয়ে রাখে।

শুঁয়া পোকার আক্রমণ

মাজরা ও বিছা পোকা নামে পরিচিত শুঁয়া পোকার দুটো প্রজাতি ধান্য ফসলের জন্য খুবই ক্ষতিকারক বলে জানা যায়। পূর্বোক্ত পোকা শস্যের সারাংশ খেয়ে ফেলে, আর পরবর্তী পোকাটি গাছের পাতা খেয়ে থাকে। এক প্রকার ক্ষুদ্র কালো রঙের গোব্‌রে পোকাও ফসলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এই পোকা সাধারণতঃ আচমকা এবং ব্যাপক আকারে দেখা দেয় ও এর শুঁড়ের সাহায্যে দুধালো রস (ক্ষীর) নিংড়ে নিয়ে শস্যদানা ধ্বংস করে ফেলে; অতঃপর ধানের খোসা বা তুষটা শুধু শূন্য ও চেপ্টা অবস্থায় পড়ে থাকে। পঙ্গপাল বিরল এবং ফসলের ব্যাপক ধ্বংসসাধনকারী উপসর্গ হিসেবে এর নাম প্রজাদের নিকট প্রায় অজ্ঞাত।

শিলাবৃষ্টি

শিলাবৃষ্টি গ্রীষ্মকালীন আউশ ও বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে ; এবং এখানে শিলাবৃষ্টির এত ভয় যে, এর ক্ষয়ক্ষতি থেকে রায়তদের ফসলের ক্ষেতগুলো রক্ষা করবার ভাণ করে, একশ্রেণীর লোক চাষীদের মধ্যে জীবিকার সন্ধান পেয়ে থাকে। শুকর, ইঁদুর এবং পাখি ইত্যাদিও ফসলের ক্ষতিসাধন করে থাকে এবং এ কারণে বছরের এ মৌসুমে ফসলের ক্ষেত পাহারা দেওয়াও রায়ত পরিবারের জন্য কম পরিশ্রমের ব্যাপার নয়।

অনাবৃষ্টি

অনাবৃষ্টি (মাত্রাতিরিক্ত না হলে) এখানে সাধারণভাবে অত্যাধিক বৃষ্টিপাত অপেক্ষা কম ক্ষতিকারক। ১৭৬৯-৭০ সনের দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত এই কারণ থেকেই দেখা দিয়েছিল। ঢাকা জেলার বুকে পরবর্তী পর্যায়ে আসে আকস্মিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন, যার ফলে বেশীর ভাগ ফসলই অকালে ধ্বংস হয়ে যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে দেখা দেয় ভীষণ গরম ও প্রবল বাতাস। এ সময়ে বৃষ্টি হয় নি। খাল-বিল, পুকুর-নালা সব শুকিয়ে গেল, বাঁশ ও অন্যান্য গাছপালার ঘর্ষণ থেকে অনবরত বন জঙ্গলে ও গ্রামের ধারে কাছে অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে লাগলো।

দুর্ভিক্ষের ফলে গরীবদের শোচনীয় দুঃখকষ্ট ও দুর্গতি .

বর্ষার মৌসুমে দুর্ভিক্ষের দিনগুলিতে গরীব লোকেরা প্রধানতঃ শাপলা বা জলপদ্মের বোঁটা ও জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করলো। অসংখ্য মানুষ মৃত্যুবরণ করলো ; অথচ যারা বেঁচেছিল তাদেরও বীজ ও বলদ থাকেনি ; ফলে জীবিকার জন্য বাধ্য হয়ে তাদেরও সাধারণ জঙ্গলা উদ্ভিদরাজির চাষ করতে হলো। পরবর্তী বছর মিঃ মিডল্টন ঢাকা পরিদর্শন করেন ; তার রিপোর্ট থেকে অবশ্য প্রতীয়মান হয় যে, বাংলার উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহ অপেক্ষা এ অঞ্চল কিছুটা কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। দেশের এ অংশে অভাব সৃষ্টির কারণসমূহের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় নদ-নদীগুলোতে আকস্মিক পানি বৃদ্ধি হলো বরাবরের ঘটনা। এ জেলার নিকট থেকে মেঘনার উৎস পর্যন্ত এ পথে নদী সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা অনেক বেশী ধ্বংসাত্মক।

১৭৮৪ সালের খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং ১৭৮৭—১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি এ সকল নদীর আকস্মিক পানি বৃদ্ধিজনিত কারণে সংঘটিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী বছরে মৌসুমের প্রথমেই মেঘনার পানি বৃদ্ধি ঘটে এবং আউশ ধান কাটার মুখে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এটা এমন এক সময়ে ঘটে যখন রফতানির কারণে জেলার খাদ্যশস্যের ঘাটতি বিরাজ করছিল।

১৭৮৪ সালে চালের মূল্য

পূর্ববর্তী বছর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে দুর্ভিক্ষের ফলে খাদ্যশস্যের উচ্চ মূল্য দর্শনে প্রলুব্ধ হয়ে রায়তগণ তাদের ভাণ্ডারজাত ধান বিক্রি করে দেয় এবং নিজেদের ব্যবহারের জন্য তারা গ্রীষ্মকালীন ফসলের উপর নির্ভর করে থাকে। কিন্তু তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত ফসল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুন, তারা সকলেই সহসা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়লো। আকস্মিকভাবে চালের দাম বেড়ে গেল এবং এমনকি এক টাকায় ষোল সের চাল সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। এই উচ্চমূল্য অনেকটা বোরো বা শীতকালীন ফসলের বিপজ্জনক অবস্থার ফলেই দেখা দিল। বোরো ফসল পানির নীচে চলে যাওয়ায় এবং এই ফসলের ভাগ্য অনিশ্চিত থাকায় চাল ব্যবসায়ীগণ একমাত্র রাতের বেলায় তাদের দোকান খুলতো এবং একবারে এক ব্যক্তির নিকট এক সেরের অধিক চাল বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানালো। শীতকালীন ফসলের বিপর্যয় সম্বন্ধে যখন আর কোন সন্দেহ থাকলো না, তখন অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষ চরম আকার ধারণ করলো। এই সময়ে গরীব অধিবাসীরা উচ্ছৃংখল হয়ে উঠলো ও তাদের নিজেদের আরোপিত শর্তে বাজারে খাদ্যশস্য লাভের দাবী জানালো। অবশেষে দোকান পাট লুঠ করার জন্য তারা অগ্রসর হলো। এ সকল প্রকাশ্য বলপ্রয়োগ দমন করার জন্য কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডে বাজার গুলো রক্ষার্থে কোম্পানীর সিপাই নিয়োগ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শহরে এই নির্দেশ জারী করেন যে, যেহেতু চালপাতি বিক্রি করার জন্য কোন নির্ধারিত মূল্য ঠিক করা নেই, সেহেতু চাল ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব শর্তে তা বিক্রি করতে পারবে এবং যে ব্যক্তি এর অন্যথা করবে সে শাস্তি পাবে। এই সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপনায় আকস্মিক ফল পাওয়া গেল। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বাজারে চালের আমদানী হলো এবং দুর্ভিক্ষের শুরুতে যে দাম ছিল সেই দরে অর্থাৎ টাকায় ১৭ সের চাল বিক্রি হতে লাগলো।

প্লাবনে সিলেট ও ত্রিপুরা জেলার অবস্থা

এই প্লাবনের ধাক্কা সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভাবে অনুভূত হয় সিলেট ও ত্রিপুরা জেলায়। মানুষ ও গরুসহ গ্রামগুলো ভেসে গেল এবং দুর্ভিক্ষ এত ব্যাপক আকারে দেখা দিল যে, চাউল সাধারণ মৌসুমে সেখানে টাকায় ৪ মন বা ৩২০ পাউণ্ড সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল, এখন তা শহরের মত একই দামে টাকায় ১৭ সের বিক্রয় হতে লাগলো। এই প্লাবনের ফলে একশো বিশটি পরগণা ও তালুক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। মিঃ ডে উল্লেখ করেন, "অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশা অবর্ণনীয়। ক্ষয়-ক্ষতি যদি শুধুমাত্র তাদের ফসলের ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো, তা হ'লে তা অল্প সময়ের মধ্যে পূরণ করা সম্ভব হতো।' কিন্তু তাদের গরু-বাছুর ও সহায়-সম্পত্তি ভেসে গেছে, প্রজারা বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় লাভের আশায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; ফলে গ্রামগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কদাচিৎ কর্ষিত জমির সন্ধান মিলছে।"

১৭৮৭-৮৮ সালের প্লাবন

১৭৮৭-৮৮ সালে এই জেলা আবার একই রকম দুর্যোগের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়, যা পূর্ববর্তী প্লাবনের প্রতিক্রিয়া অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী মারাত্মক পরিণতি বহন করে আনে। মার্চ মাসের প্রথমেই বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং এ সময় থেকে জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত তা' একটানা অব্যাহত থাকে। অতঃপর এ সময়ে নদ-নদীগুলোর পানির অদ্ভূত উচ্চতা পরিলক্ষিত হয় এবং সমগ্র দেশ এত ব্যাপক পরিমাণে প্লাবিত করে ফেলে যে, প্রবীণতম অধিবাসী-দের কেউ কোন দিন তা চোখে দেখেনি। ঢাকার রাস্তাগুলো, সাধারণ মৌসুমের প্লাবনের সময় পার্শ্ববর্তী নদী সমূহের উচ্চতম লেবেল থেকে কয়েক ফুট উপরে থাকে; এখন তা এমন ভাবে প্লাবিত হলো যে, সেখানে স্বচ্ছন্দে নৌকা চালানো সম্ভব হয়ে উঠলো। অন্যদিকে, সমগ্র গ্রাম-বাঙলার অধিবাসীগণ তাদের ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলো ও কলাগাছের ভেলায় বা বাঁশের তৈরী উচ্চমঞ্চে আশ্রয় গ্রহণ করলো। জেলার দক্ষিণ বিভাগে, এই প্লাবনের ফল সর্বাপেক্ষা মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। অধিকাংশ জায়গার প্রথম দিককার ফলন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল। মৌসুমের শুরুতে প্রবল বারিপাতের ফলে আউশ ধানের ছোট ছোট চারা গাছগুলো বিনষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তী সময়ে আমন ফসলও এর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গেল।

জেলার পরগণা সমূহের মধ্যে রাজনগর, কার্তিকপুর ও রছুলপুর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। মিঃ ডে নভেম্বর মাসে দেশের এই অঞ্চল পরিদর্শন করে লিখেছেন, "এ স্থানে দুঃখ দুর্দশার এরূপ দৃশ্য চোখে পড়েছে, যা' তিনি সারা জীবনে কোথাও কখনো দেখেন নি। সমগ্র ভূভাগ সম্পূর্ণরূপে প্লাবিত হয়েছে; গ্রামাঞ্চলের কোথাও চাষাবাদের সামান্য চিহ্নও পরিলক্ষিত হচ্ছে না এবং অধিবাসীগণ পানির উপরে উচ্চমঞ্চে বসবাস করছে।" এখানে এবং পার্শ্ববর্তী পরগণাসমূহে প্রজাগণ নিদারুণ দুঃখ দারিদ্রে পতিত হয়।

দুর্ভিক্ষ

প্রচণ্ডভাবে দুর্ভিক্ষ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং অধিকাংশ মানুষ তাদের ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করে অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তখন শত শত লোক প্রতিদিন খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করছিল।

১৭৮৭ সালের জুলাই মাসে শহরে খাদ্যশস্যের সরবরাহ হ্রাস পেয়েছিল এবং তখন প্রাথমিক ফসলের নিশ্চিত ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা ও শীতকালীন ফসলের অশুভ সম্ভবনার করাল ছায়া চারিদিকে বিরাজ করতে শুরু করলো। খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণ মৌসুম অপেক্ষা শতকরা ৩০০ থেকে ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পেল। শহরের ধনী অধিবাসীগণ যতটা সম্ভব শস্য সংগ্রহ ও জমা করার চেষ্টা করলো এবং যে কোন দামে তা ক্রয় করে নিলো; অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা সাধারণ আতঙ্কগ্রস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে একত্রে একবারে মাত্র সামান্য পরিমাণ খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য প্রকাশ্যে বের করতো। গরীবদের দুর্দশা মোচনের উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের নিমিত্ত মিঃ ডে সরকারের নিকট প্রস্তাব করেন যে, বিহারের কালেক্টরদেরকে ঢাকায় খাদ্যশস্য রপ্তানী করার নির্দেশ প্রদান করা হোক; এবং এই খাদ্যশস্য ক্রয়ের আসল খরচ ও পরিবহণের ব্যয়ভার পূরণ করার মত মূল্যে বাজারে বিক্রি করা হোক। এই ধরনের একটি সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ ও খাদ্যশস্যের উপর শুল্ক মওকুফের দ্বারা ব্যবসায়ীদের নিকট সাধারণ আমদানীর প্রতি উৎসাহ বর্ধনের উপর তিনি জোর দেন ও এর দ্বারা জেলার অভাব পূরণ করতে যথেষ্ঠ পরিমাণ সরবরাহ লাভের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বেঁধে দিলে কোন ফল হবেনা; বরং এ জাতীয় যে কোন রকম হস্তক্ষেপের দরুন সাধারণ দুঃখ দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যবসায়ীদের হাতে যা' কিছু গুদামজাত করা

রয়েছে, তাও তারা গোপন করতে প্রলুব্ধ হবে। বিগত বছরের আমদানী করা খাদ্য দ্রব্যাদি অতীতে যে কোন সময় অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, তথাপি জনসাধারণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এটা অপর্যাপ্ত ছিল। এতে ফল হলো এই যে, ১৭৮৮ সাল আরম্ভ হবার পূর্বেই কয়েক হাজার লোক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মৃত্যু বরণ করলো। এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত কোন সরবরাহ ঢাকাতে পাওয়া যায়নি; ঐ সময়ে ৭,২৫০ মন চাল ঢাকায় এসে পড়ে; কিন্তু তখন শহরে এক বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় এবং তাতে ৭,০০০ ঘরদোর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। এর ফলে খুচরো বিক্রেতাদের বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয়ে যায়। কালেক্টর তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, ১০০ জন লোক এ অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ হারায়। দুর্ভিক্ষ এই মাসে সর্বাপেক্ষা চরম আকার ধারণ করে বলে প্রতীয়মান হয়। জেলার বহুঅংশে একটাকায় এমন কি ৪ সের চাল সংগ্রহ করাও কদাচিৎ সম্ভব হতো। এর পরিণতি হলো এই যে, গ্রামগুলো উজাড় হয়ে গেল এবং গরীব বুভুক্ষু হাজার হাজার মানুষ খাদ্যের সন্ধানে শহরে এসে ভীড় জমালো, এবং ধনী অধিবাসীদের দান ও অর্থ সম্পদের সাহায্যে যতদূর সম্ভব তাদের অভাব মিটানোর চেষ্টা করা হলো। জনসাধারণের সাহায্যে প্রত্যহ ন' থেকে দশ হাজার লোককে খাওয়ানো হতে লাগলো; কিন্তু সকলের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবৃত্ত অসম্ভব হওয়ায়, বিপুল সংখ্যক নিরন্ন মানুষ রাস্তা ঘাটে, শহরে ও তার আশপাশ এলাকায় মৃত্যুবরণ করলো। এ সম্পর্কে মিঃ ডে দুঃখ করে বলেন: "এ দৃশ্য অবলোকন করা বেদনাদায়ক।"

প্রাণহানির সংখ্যা

এই বিষম বিপর্যয়ের ফলে মৃত্যুর সংখ্যা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই ভদ্রলোক কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্য থেকে জানা যায় যে, প্লাবনে ও পরবর্তী পর্যায়ে, দুর্ভিক্ষের সময়ে ৬০,০০০ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। ইনি লিখেছেন, "রাজনগর ও কার্তিকপুরের মত আর কোন পরগণাই এত ভয়ানকরূপে এবং ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। অধিবাসীগণ যে নিদারুন দুঃখকষ্ট ও দুর্দশার মধ্যে পতিত হয়েছিল—সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে তা বর্ণনা করা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দুর্ভিক্ষের দাবানল এরূপ প্রবলভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, কয়েক হাজার বুভুক্ষু শোচনীয়ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যদিকে সকল পরিবার মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে

চলে যায়। কিন্তু অনেকে ক্ষুধা ও অসুস্থতাজনিত কারণে এত বেশী দুর্বল ও কৃশ ছিল যে, খাদ্যের সন্ধানে বেরুতেই তাদের জীবন প্রদীপ নিভে যায়।

সন্তান বিক্রি

অন্যরা তাদের দুঃখ দুর্দশা কিছুটা লাঘবের আশায় বুকবেঁধে ঢাকা শহরে গমন করে, এবং সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের করালগ্রাসের মুখে মায়েরা এতদূর দুঃখকষ্ট ও হতাশাবস্থায় পতিত হয় যে, সমস্ত রকম মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে তারা একমুষ্টি চালের জন্যে তাদের আপন সন্তান-সন্ততিদের বিলিয়ে দেয়। সব রকম সাহায্য প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু যে হারে শহরে ক্ষুধার্ত ও নিরন্ন মানুষের মিছিল ছুটে এসেছিল তাতে সকলকে সাহায্য করার সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়।

ফলে হাজার হাজার দুঃখী হতভাগ্য লোক শহরে ও তার আশে-পাশের এলাকায় শোচনীয়ভাবে মরে পড়ে থাকে।" এই দুর্ভিক্ষের ফলে সহায় সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ছিল ব্যাপক। জমিদারগণ তাদের রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হন এবং অসংখ্য প্রজা ও তাদের গরু বাছুর বিনষ্ট হওয়ায় বেশ কিছুকাল তাদের জমিজমা অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকে। কয়েকটি পরগণা থেকে প্রায় ¼ ভাগ পরিশ্রমী অধিবাসী অদৃশ্য হয়ে যায়। এরা হয় মৃত্যুবরণ করে, অথবা অন্যত্র চলে যায়, এবং এর পরিণতিস্বরূপ জমি-ক্ষেত, মাঠ-ঘাট শীঘ্রই বনে-জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে ওঠে ও বন্যশূকর, বাঘ ইত্যাদির আবাসভূমিতে পরিণত হয়ে যায়।

শ্রমের মজুরী
(১৭৮৮ সালের দুর্ভিক্ষের ফলে কৃষিসংক্রান্ত কার্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি)

জেলার কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের পারস্পারিক অবস্থার ক্ষেত্রে, ১৭৮৮ কে—সেই সকল পরিবর্তনের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেগুলো কার্যতঃ পরবর্তী পর্যায়ে সকল শ্রেণীর অধিবাসীদেরকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৭৮৮ সালের পূর্বের অধিক লাভজনক পেশা তন্তুবায় ও সুতা কাটা কাজের তুলনায় জায়গাজমির চাষাবাদের কাজ অবহেলিত ছিল। কিন্তু শোচনীয় অবস্থার দরুন এ জেলা এখন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হওয়ায় কায়িকশ্রমের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং এ ভাবে কৃষির প্রতি উৎসাহ বেড়ে যায়, যা বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের উপর শুল্ক ভারী

বোঝাস্বরূপ থাকায় খাদ্যশস্যের রফতানীর উপর শুল্ক রহিতকরণ, আর্কট মুদ্রা বাতিল করণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ বহুপূর্বেই জরুরী ছিল। জমিদারগণের সঙ্গে সরকারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, শিল্প-দ্রব্যের দ্রুতহ্রাস এবং বিদেশী বাজারের জন্য উৎপন্নদ্রব্য হিসেবে নীল ও কুমকুম বা জাফরান চাষের প্রবর্তন—এ সব কিছুই চাষাবাদের সম্প্রসারণ ঘটায় এবং কৃষি ও সাধারণ শ্রমের মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়তা করে।

শ্রমের মজুরী বৃদ্ধি

পরপৃষ্ঠার প্রদত্ত তালিকায় ১৮০৩ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলার একটি পরগণায়, শ্রমের মজুরী বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের বেতনের অনুরূপ বৃদ্ধি

একই সময়ে রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণের বেতনের ক্ষেত্রে অনুরূপ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নলিখিত বিবরণটি এ জেলার ১৭টি এষ্টেটের হিসেব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

গড়পড়তা বার্ষিক মজুরী

	১৮০৪			১৮৩৭		
ইতিমামদারগণ	৩১	৩	০	৪১	১০	০
মণ্ডলগণ	১৮	১৪	০	২৬	২	০
নায়েবগণ	৬৪	০	০	৭৬	০	০
পিয়ন	২৪	০	০	৩৬	০	০
মোহরারগণ	৩১	০	০	৩৪	৮	০

শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস

অন্যদিকে শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাসের বিষয়টা একই সময়ের ঘটনা বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৭৮১ সালে বৃটেনে মসলিন বোনা শুরু হয়; আর্করাইটের কৃতস্বত্ব বা আবিষ্কৃত দ্রব্য তৈরীর বা বিক্রির অধিকার শেষ হওয়ায় এবং ১৭৮৫ সালে সুতাকাটা যন্ত্রে সুতা তৈরীর কাজ শুরু হলে

১৮০৩ এবং ১৮৩৭ সালে শ্রমমূল্যের পার্থক্য

কৃষিক্ষেত্রে কার্যরত শ্রমিক বা ঘরামী	বার্ষিক মজুরী		মাঝিমাল্লা	বার্ষিক মজুরী		ভাণ্ডারী বা গৃহ-ভৃত্য	বার্ষিক মজুরী	
	১৮০৩	১৮৩৭		১৮০৩	১৮৩৭		১৮০৩	১৮৩৭
	টাকা	টাকা		টাকা	টাকা		টাকা	টাকা
১ম শ্রেণী	১৮	৪৮	১ম শ্রেণী	২৪	৪৪	১ম শ্রেণী	১২	২৪
২য় শ্রেণী	১৫	৩৬	২য় শ্রেণী	২১	৩৬	২য় শ্রেণী	৯	১৮
৩য় শ্রেণী	১২	২৭	৩য় শ্রেণী	১৮	৩৩	৩য় শ্রেণী	৬	১৫
			৪র্থ শ্রেণী	১৫	২৪	৪র্থ শ্রেণী	৩	১২
কুলি			সাধারণ মাঝি					
১ম শ্রেণী	১২	২৭	১ম শ্রেণী	১৫	২৭	কুলি ও ভাণ্ডারীরা তাদের পারিশ্রমিকের সঙ্গে খাদ্য পেয়ে থাকে।		
২য় শ্রেণী	১০	২১	২য় শ্রেণী	১২	২১			
৩য় শ্রেণী	৯	১৬	৩য় শ্রেণী	১০	১৮			
৪র্থ শ্রেণী	৬	১২	৪র্থ শ্রেণী	৬	১২			

সেখানে শিল্পের এই শাখা শীঘ্রই বিরাট উৎকর্ষ লাভ করে। ১৭৮১ থেকে ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশদের সুতী-নির্মিত শিল্পদ্রব্যের মূল্য ২০,০০,০০০ পাউণ্ড—থেকে ৭৫,০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; এবং ১৭৮৫ সালে ৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় যা' ভারতীয় মসলিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে প্রতীয়মান হয়। এ সময় থেকে ঢাকার বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে এখানকার সুতা বা কাঁচামালের উপর শতকরা ৭৫ ভাগের মত অত্যাধিক পরিমাণ শুল্ক আরোপ করার সময় থেকে, বৃটেনে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার অনুপাতে এটা হ্রাস পেতে থাকে; এবং অবশেষে ১৮১৭ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত বৃটিশ রাজপ্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয়।

যন্ত্রে তৈরী সুতা দেশীয় সুতার স্থান দখল করে নেয়

পরবর্তীকালে বৃটেনের তৈরী সুতা ও বস্ত্র আমদানীর ফলে এস্থানের সাধারণ উন্নতি আরো বেশী করে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। বৃটেনে তৈরী করা সুতার প্রথম বড় চালান ভারতে আসে ১৮২১ সালে; কিন্তু ১৮২৮ সাল থেকেই এর প্রভাব তীব্রভাবে অত্র জেলায় অনুভূত হতে শুরু করে। ঐ সময় থেকে এটা প্রায় সম্পূর্ণরূপে দেশী সুতার স্থান দখল করে নেয় এবং এভাবে সকল শ্রেণীর অধিবাসীরা কাজ থেকে বঞ্চিত হয়; অথচ এটাই তাদেরকে একদিন ব্যাপক পরিমাণে জীবিকা অর্জনের পথের সন্ধান করে দিত।

সুন্দর সুচীকর্ম করা বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস

কাসিদা (Kusseda) নামে পরিচিত তাদের সুন্দর সুচীকর্ম করা বস্ত্রের জন্য বার্ষিক হ্রাসকৃত চাহিদার ক্ষেত্রে, আরো পরবর্তীকালে ঢাকার অধিবাসীগণ আর একটি ক্ষতির বিষয় পরিজ্ঞাত হয়। ১৮৩৫ সালে ৪ লক্ষ টাকা মূল্যের 'কাসিদা' বস্ত্র কলকাতায় বিক্রয় করা হয়। ১৮৩৬ সালে বিক্রির পরিমাণ ছিল আড়াই লক্ষ টাকা, ১৮৩৭ সালে দেড় লক্ষ টাকা এবং ১৮৩৮ সালে মাত্র ১ লক্ষ টাকা। পোশাকের পরিবর্তনের ফলে এই হ্রাস পরিলক্ষিত হয়েছে। কন্‌স্টান্টিনোপলের সুলতান ও মিশরের পাশা কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে তাদের সেনাবাহিনীতে নতুন পোশাকের প্রবর্তন করেন। এই সকল বস্ত্র যা' এখন বস্‌রা ও জেদ্দায় রপ্তানী করা হচ্ছে, তা'ই এতকাল পর্যন্ত মিশর ও তুরস্কে পাঠানো

হতো। এসব বস্ত্রাদি সেসব দেশের সৈন্যগণ কর্তৃক পাগড়ী হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে প্রতীয়মান হয়। ইউরোপীয়গণ কর্তৃক এই জেলায় প্রবর্তিত একমাত্র বাণিজ্য দ্রব্য এবং যা' এখানকার শিল্প দ্রব্যের ক্ষতি কিছুটা পূরণ করে তুলেছে বলে ধরে নেয়া যায়—তা' হলো নীল ও জাফরান। ১৮০০ সাল থেকে বৈদেশিক বাজারের জন্য এ দু'টো রঙের চাষ করা হচ্ছিল ; কিন্তু এ দুটো উৎপন্ন দ্রব্যের সমষ্টিগত মূল্য (এ জেলার সীমানার মধ্য থেকে লব্ধ) বছরে ৪ লাখ টাকার অনুর্ধ বা ১৭৮৭ সালে বৃটেনের বাজারের জন্য বস্ত্রাদি ক্রয়ে নিয়োগকৃত পুঁজির এক-অষ্টমাংশ মাত্র।

কৃষিভৃত্য, দিন-মজুর ও তাদের পারিশ্রমিকের হার

কৃষিকাজে নিয়োজিত ভৃত্য ও দৈনিক মজুররা হয় নগদ টাকায় বা নগদ টাকা ও খাদ্য উভয় আকারে পারিশ্রমিক লাভ করে থাকে। চাষাবাদ করা, কাঠ ও ঘাস কাটা এবং কৃষিখেতের আশেপাশে সাধারণ কাজ করা ইত্যাদিতে নিয়োজিত প্রজার গৃহভৃত্য, মাসিক ১ টাকা থেকে এক টাকা আট আনা পর্যন্ত পারিশ্রমিক ও খাদ্য পেয়ে থাকে। অন্যদিকে যারা বালক এবং গরু চরানোর কাজে নিযুক্ত থাকে, তাদেরকে তাদের বয়স অনুসারে ৪, ৮ বা ১০ আনা হারে বেতন দেয়া হয়। দাওয়ালরা সাধারণতঃ তাদের কর্তিত ধানের এক পঞ্চমাংশ পেয়ে থাকে। এই হার ফসলের অবস্থা ও শ্রমের চাহিদা অনুসারে কম বেশী হয়ে থাকে এবং এই হার সর্বনিম্ন এক সপ্তমাংশ এবং সর্বোচ্চ এক চতুর্থাংশ হয়ে থাকে। ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরায় যেখানে শ্রম এই জেলা শহর অপেক্ষা সস্তা, সেখানে এক দশমাংশ অনুপাত অনুমোদিত। ফসল কাটার মৌসুমে নিয়োজিত লোকদের একটা বিরাট সংখ্যা হচ্ছে মেয়েদের এবং এরা সাধারণতঃ পুরুষের সমান উপার্জন করে থাকে। কাস্তে ব্যবহারে দক্ষ একজন কর্মক্ষম মজুর এক দিনে ১০০ অাঁটি (পাঁজা) ধান কাটতে পারে। ময়মনসিংহের সর্বনিম্ন হার অনুসারে এতে তার অংশে আসবে ১৫ সের ধান বা দু'আনা। দাওয়াল বা ধান কাটার মজুরেরা প্রতিদিনের কাজের শেষে তাদের কর্তিত ফসলের ভাগ পেয়ে থাকে, এবং অতঃপর তারা তাদের স্ব স্ব গৃহে ফিরে যায়। ধান কাটা ছাড়াও জমির আগাছা সাফ করা, কুমকুম বা জাফরান ফুল তোলা এবং গাছ থেকে সুপারী পাড়া ইত্যাদি কাজে গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক নিয়োজিত হয়। এর পূর্ববর্তী কাজ দুটো

বিশেষভাবে স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েরা করে থাকে। শহরে প্রায় ৩০০০ মুসলমান পরিবার আছে, যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে এবং খাদ্যশস্য পরিষ্কার করে। ১৭৮৭ সালের পূর্বে খাদ্যশস্যের দৈনিক সরবরাহ পাওয়ার ক্ষেত্রে ঢাকা শহর সম্পূর্ণরূপে পার্শ্ববর্তী হাট বাজারগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু ঐ বছরের দুর্ভিক্ষের পর দরিদ্র অবস্থায় পতিত কিছু সংখ্যক পরিবার শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই থেকে তারা বাজারগুলোতে খাদ্য শস্য সরবরাহ করে আসছে। এই শ্রেণী বা কুট্টিদের মধ্যে অধিক সম্পদশালী ব্যক্তিরা চালের ব্যবসা করে এবং একাজে মহাজনী নৌকা রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে। এসব নৌকা তারা খাদ্যশস্য ও ভারী জিনিসপত্র পরিবহনের কাজে ভাড়া খাটায়। কেউ কেউ খেত্‌মজুর, মসালচি, পিয়ন ও ভিস্তিরূপে কাজ করে, কিন্তু অধিক সংখ্যক লোক রাজমিস্ত্রী, জোগালী ও দিন মজুর হিসাবে নিয়োজিত। সাধারণতঃ মজুরগণ কুপ খনন ও কুঁড়ে ঘরের মাটির দেওয়াল তৈরী ইত্যাদি কাজ করে থাকে। খাদ্যশস্য পরিষ্কারকরণ বা তুঁষ ঝাড়ানোর কাজও কেবলমাত্র ঐ সকল পরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকেরাই করে থাকে। দু'জন স্ত্রীলোক ঢেঁকি চালায় এবং একজন তুষ ঝাড়ার কাজে নিয়োজিত থেকে একদিনে প্রায় দু'মণ ধান পরিষ্কার করতে পারে; এতে দেড়মণ চাল হয়ে থাকে।

সরিষার তেল উৎপাদনের কারখানা

শহরে কয়েক বছর পূর্বে বাষ্প চালিত বৃহৎ যন্ত্রপাতি সরিষার তেলের উৎপাদন করার জন্য ও খাদ্যশস্য তুষমুক্ত করার কাজে বসানো হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে পরিকল্পকগণ দেখলেন যে, তারা দেশীয় প্রস্তুতকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারছে না; ফলে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়।

দাঁড়ি-মাঝি

দেশের এই অংশে দাঁড়ি মাঝিদের সংখ্যা প্রচুর। হিন্দু মাঝিরা কদাচিৎ জেলার বাইরে যায়, কিন্তু ঢাকার মুসলমান দাঁড়িরা বাইরেও গমন করে থাকে। এদের অনেকে দেশের আভ্যন্তরীণ নৌচালনায় নিয়োজিত আছে এবং এদের কেউই জাহাজে কলকাতা, মোরীতানিয়া ও পেনাঙ্গের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য চালায় না।

নৌকা ভাড়া

বছরের মৌসুম অনুসারে, এ জেলার পারিশ্রমিকের হারের তারতম্য ঘটে; ফসলের মৌসুমে ও নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় মেলা চলাকালীন সময়ে এই হার সবচেয়ে বৃদ্ধি পায়। এখানকার নৌকা ভাড়া অবশ্য পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহ অপেক্ষা বেশ সস্তা।

সড়ক-কুলি

শহরে প্রায় ৩০০ শত সড়ক-কুলি আছে; এরা পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের অধিবাসী। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রায় ১৫০ বছর ধরে এখানে বসতি শুরু করেছে। তারা দলবদ্ধভাবে বসবাস করে এবং একজন সরদারের নিয়ম-নির্দেশের অধীনে প্রায় বিশ জনের এক একটি দল থাকে। এই সরদার তাদের কাজ কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাস-শেষে তাদের মধ্যে তাদের আয়-উপার্জন বণ্টন করে দেয়।

কারিগর

কারিগর শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক সারাদিন কাজ করে। পূর্বে তাঁতীরা তাদের নিজস্ব পুঁজি দিয়েই মস্‌লিন তৈরী করতো। মিঃ বোল্টস্ উল্লেখ করেছেন যে আলীবর্দী খানের আমলে একজন তাঁতির পক্ষে কোন বণিকের নিকট একই সময়ে ৮০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র বিক্রয়ার্থে আনয়ন করা অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। বর্তমানে তারা শর্তাধীনে কাজ করে থাকে। ব্যবসায়ী বা তাদের প্রতিনিধি পাইকারদের নিকট থেকে তারা সুতা ও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যারা দৈনিক বা মাসিক হিসেবে কাজ করে, তাদের গড়-পড়তা পারিশ্রমিক হলো, (নিয়মিত কার্যকালের বাইরে শর্তাধীন কাজ ব্যতিরেকে) মাসে ২ টাকা ৮ আনা। কেননা নাটাইয়ে বা কাঠিমে সুতা গুটানো এবং তাঁতের টানা পোড়েন ইত্যাদি কাজে অতিরিক্ত দশ আনা উপার্জন হতে পারে। একজন তাঁতির শিক্ষাধীন ১০ বা ১২ বছর বয়সের বালক শিক্ষা-নবীশীকার্যে দু'বছর কাটানোর পর মাসে ৪ আনা পারিশ্রমিক লাভ করে।

সাধারণতঃ প্রতি বছরই এই হার বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে তার শিক্ষা গ্রহণের শেষ বছরে সে ১২ আনা পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে। বর্তমান সময়ে সুতা কাটার কাজে সামান্যই লাভ হয়ে থাকে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, সবচেয়ে

অক্লান্ত অধ্যাবসায়ী সুতাকাটারুগণ প্রতিদিন তাদের কাজ করে চলছে তথাপি তারা বছরে সূক্ষ্মতম সুতার ২ সিক্কার (৩৬০ গ্রেন ওজনের বা ১৪,৪০০ গজের) অধিক সুতা তৈরী করতে পারে না; এতে সিক্কা প্রতি ৮ টাকা হারে মাত্র ১৬ টাকা বা ৩২ শিলিং উপার্জন করা যায়। এতে এক দিনে মাত্র এক পেনির মত সামান্য অর্থ হাতে আসে, যা কাঁচামালের মূল্যের বারোশত গুণ অপেক্ষাও বেশী।

সূচী শিল্পীর পারিশ্রমিক

সূচীকর্ম বা চিকনের কাজকে শুধুমাত্র একটি সাময়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরা হয়। এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের উপার্জনের পরিমাণ সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ব্যবসায়ী কর্তৃক এটা নিরূপিত হয়েছে যে, উপকরণাদি ব্যতিরেকে 'কাসিদা' বস্ত্রের সমগ্র ভাণ্ডারজাত দ্রব্যের মূল্যের এক-পঞ্চমাংশ, তাদের সূচীকর্মের উপর ব্যয়িত হয়। উক্ত হিসেব অনুসারে এই খাতে বিগত চার বছরে বার্ষিক ব্যয় হয়েছে ৪৭,৫০০ টাকা। এই অর্থের সবটাই শহরে ব্যয় করা হয় এবং সুতার কাজে নিয়োজিত (অনুমিত) প্রতিটি মুসলমান রমণী কর্তৃক উপার্জিত অর্থের পরিমাণ বছরে ৬ টাকার অধিক নয়। ওস্তাগর ও ওস্তানী নামে পরিচিত পুরুষ ও মেয়ে-প্রতিনিধির মাধ্যমে এ সকল কার্য পরিচালিত হয়ে থাকে। এরা সীলমোহরকৃত বা ছাপমারা বস্ত্রাদি, রেশমী সুতা এবং অর্থ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গ্রহণ করে; এবং কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য দায়ী থাকে। এ সকল বস্ত্রের সীলমোহরকারীরা তাদের প্রস্তুত করা কাপড় চোপড়ের সংখ্যানুসারে পারিশ্রমিক লাভ করে। রিফুগর, চিকনদাজ ও জরিদারগণ কর্তৃক উৎকৃষ্ট ধরনের সূচীকর্ম সম্পাদিত হয় এবং এটা শর্তাধীনে করা হয়ে থাকে। নারদিয়া ও অন্যান্য শ্রমিকেরা বস্ত্রে ছাপমারা, ভাঁজ করা ও গাঁটরি বাঁধার কাজে নিয়োজিত। এরা দৈনিক গড় পড়তা দু'আনা হারে মজুরী পায়।

শুভ্র-করণের খরচ

ধোপারা তাদের ধৌত করা বস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও গুণাগুণ অনুসারে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে; এবং প্রতি ১০০ খণ্ড বস্ত্রে ৪ থেকে ১৪ টাকা পর্যন্ত এই হারের তারতম্য ঘটে। গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক ধোপা রয়েছে। আরঙ্গ (Aurong) তৈরী করা ব্যতিরেকে, এরা নগদ অর্থে ও খাদ্যশস্যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে।

শাঁখা প্রস্তুতকারী শাঁখারু

শঙ্খ-দ্বারা শাঁখা তৈরীর কাজে তিন ধরনের লোক নিয়োজিত আছে। যারা শঙ্খকে বিভিন্ন অংশে ভেঙ্গে পৃথক ও পরিষ্কার করার কাজে নিয়োজিত তাদেরকে ৪২০টি শঙ্খের জন্য এক টাকা হারে মজুরী প্রদান করা হয়। এরা মাসে তিন থেকে চার টাকা উপার্জন করতে পারে। শাঁখের করাতিরা প্রতি ১০০ শঙ্খের জন্য দু'থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত আয় করে। ঘর্ষণ দ্বারা মসৃণ ও চিকন করা এবং খোদাই করা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত কর্মীদেরকে চুক্তি ভিত্তিক পারিশ্রমিক দেয়া হয়ে থাকে।

গৃহ-ভৃত্যদের মজুরী

বিগত চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহ-ভৃত্যদের বেতন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৮০৮ সালে বাণিজ্যিক কারখানাতে বাহক বা শ্রমিকদেরকে মাসে ২ টাকা ৪ আনা প্রদান করা হতো। সে সময়ে এই হার উচ্চহার হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে তারা ৩ টাকা ৮ আনা পর্যন্ত পেয়ে থাকে। চাটা (Chattah) বহনের কাজে স্থানীয় অধিবাসীগণ কর্তৃক নিয়োজিত হলে তারা ২ টাকা ৮ আনা হারে পারিশ্রমিক পায়। হিন্দু পরিবারে কার্যরত একজন ভাণ্ডারী ভৃত্য—যে হাট-বাজার করে, বাসন কোসন পরিষ্কার করে, পান ও হুক্কা সাজায় এবং নদী থেকে পানি তোলে, সে ভৃত্যও বছরে একখানা বা দু'খানা কাপড় এবং আহার্য ছাড়াও মাসিক এক থেকে দু'টাকা পর্যন্ত মাহিনা পেয়ে থাকে। মুসলমান পরিবারে রান্না-বান্নার কাজে সাধারণতঃ স্ত্রী লোকদেরকে নিয়োগ করা হয়। এরা আহার্য, পান, তামাক, বস্ত্রাদি ছাড়াও মাসিক দশ আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত বেতন পায়। দেশীয় পরিবারে নিযুক্ত খেদমতগাররা মাসিক এক টাকা থেকে দু'টাকা পর্যন্ত মজুরী পায়। গ্রামাঞ্চলে নাপিতদেরকে খাদ্যশস্য এবং শহরে নগদ অর্থে বছরে চার টাকা হারে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয়ে থাকে।

দরিদ্রশ্রেণী ও দাসদাসীদের অবস্থা

দরিদ্র সম্প্রদায়কে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম, বেকার ও রুগ্ন অবস্থার কারণে কাজ করতে অক্ষম ব্যক্তি; দ্বিতীয়, আশ্রয়হীনা বিধবা ও অনাথ ছেলেমেয়ে; তৃতীয়, যারা দৈহিক ভাবে অক্ষম বা রোগ-ব্যধিগ্রস্থ—যেমন, খঞ্জ,

অন্ধ ও কুষ্ঠ ইত্যাদি হওয়ার দরুন জীবিকা অর্জনে অসমর্থ। প্রথমোক্ত শ্রেণী প্রধানতঃ ভৃত্য, দাঁড়ি মাঝি এবং শহরের নানা ধরণের কারিগরদের নিয়ে গঠিত। রুগ্ন ও কাজ করতে অসমর্থ হলে এরা সাধারণতঃ রৌপ্য অলঙ্কারাদি, কাপড়-চোপড় বা তাম্র ও পিতলের ঘটি-বাটি ইত্যাদি বন্ধক রেখে অর্থ ঋণ করে। শহরাঞ্চলে ব্যবসায়ে লিপ্ত প্রায় প্রত্যেকটি লোক বন্ধকী কারবারী। মাসিক সুদের হারে শতকরা আড়াই থেকে ৬ ভাগ পর্যন্ত তারতম্য ঘটে থাকে। ১৭৭০ সালে মাসপ্রতি সুদের প্রচলিত হার ছিল শতকরা ৬ টাকা ২ আনা কিন্তু পরবর্তী সময়ে ৩ টাকা ৮ আনায় হ্রাস পায়। বর্তমানে যে সকল ক্ষেত্রে মোটা পরিমাণ অর্থ ঋণ করা হয়, সেসব ব্যাপারে সরকারী বিধি-নিষেধ দ্বারা সুদের হার নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশেষতঃ দলিলে নিয়ন্ত্রিত হারে সুদের পরিমাণ প্রদর্শিত হয়ে থাকে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা নিঃসন্দেহে ঋণ-করা অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করে থাকে। ঋণ-চুক্তি ও সম্মতি জ্ঞাপন সাক্ষীদের সামনে সম্পূর্ণ হয় এবং ঋণ-গ্রহীতাকে সঠিকভাবে অর্থপ্রদান করা হয়ে থাকে। দলিল যথাসময়ে ফেরৎ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষীরা অব্যাহতি পায় এবং ঋণ-গ্রহীতা তখন ব্যক্তিগতভাবে স্বীকৃত অর্থ ঋণদাতাকে ফিরিয়ে দেয়।

সংঘ বা সমিতির অভাব

অসুখ বিসুখ ও দুঃখ দুর্দশার কালে পারস্পারিক সাহায্যের নিমিত্ত শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ সংঘ বা সমিতির অস্তিত্ব নেই। ঝগড়া বিবাদ মীমাংসা করা, পারিশ্রমিকের হার স্থির করা ও পূজার জন্য চাঁদা প্রদান ইত্যাদি কাজের উদ্দেশ্যে তারা সমবেত হয়ে থাকে। কিন্তু বেকার অবস্থায় পরিবারবর্গ বা নিজেদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করার নিমিত্ত তহবিল গঠন তাদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাদের অনেকেই মাঝে মাঝে নিদারুণ দুঃখ কষ্টে পতিত হয় এবং খাদ্যদ্রব্য সস্তা হওয়া সত্ত্বেও তারা এবং তাদের পরিবার পরিজনরা সময় সময় দিন একবেলার আহার জোটাতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। শহরে মাঝে মাঝে অগ্নিকাণ্ডের ফলেও অনেক দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য অবস্থা দেখা দেয়। সাধারণতঃ শীতকালেই এসব অগ্নিকাণ্ড ঘটে এবং প্রতি বছর গড়পড়তা তিন থেকে বারশত ঘরবাড়ি (বিশেষতঃ কুঁড়ে ঘর) ভস্মীভূত হয়ে যায়। অধিকাংশ অধিবাসিরাই এসব ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে; তারা তাদের অর্থকড়ি ও অধিমূক ল্যবান জিনিসপত্র হয় তাদের কুঁড়ে ঘরের মেঝেতে মাটির

নীচে লুকিয়ে রাখে কিম্বা সিন্দুকে জমা রাখে এবং অগ্নিকাণ্ডের সংকেত প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে তা' তুলে আনার জন্য প্রস্তুত থাকে। কিন্তু সকল রকম সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও এসব ঘটনার সময়ে বেশ কিছু পরিমাণ সহায় সম্পত্তি চুরি হয়ে যায়। এ সকল ক্ষয়ক্ষতির বোঝা বহন ও ঘরদোর পুনর্নির্মাণের খরচপত্র করা, ইত্যাদি অবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের উপর বিরাট দুঃখ দুর্দশা নেমে আসে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর দরিদ্র

দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আশ্রয়হীনা বিধবা ও অনাথরা গ্রামাঞ্চলে থেকে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। পূর্বোক্তরা সুতা কেটে, আগাছা পরিষ্কার করে ও মাঠ থেকে শস্য কেটে, এবং পরবর্তীরা মাঠে গরু বাছুর চরিয়ে ও জাফরাণ ইত্যাদি ফুল আহরণের কাজ করে কোনমতে জীবিকার সংস্থান করে নেয়। শহরে বিধবরা সাধারণতঃ তাদের স্বামীদের বা গোত্রীয় কোন ঘরে কাজ পেয়ে যায়। তাঁতিরা এদেরকে "কাসিদা" বস্ত্রের আঁচলের সুতা ও গামছা বা কোমরে বাঁধবার মোটাবস্ত্র তৈরীর কাজে নিয়োগ করে থাকে। শাঁখারিরা এদেরকে শঙ্খ পরিষ্কার করানো ও সিপাইদের হারের জন্য পুঁতিতে চিহ্ন বসানো ইত্যাদি কাজে এবং লোহার কামাররা টিনের থালা বাসন রঙ করানো ও পুতুল সজ্জিতকরণ ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিধবাদের কাজে লাগায়। এদের অনেককে হিন্দু পরিবারে পাচিকা হিসেবে নিয়োগ করে। আবার অন্যান্যরা বনজঙ্গল ও বিলঝিল থেকে সংগ্রহ করে আনা শাক্‌সবজি ও ফলমূল ইত্যাদি বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জনের পথ বেছে নেয়।

মুসলমানদের মধ্যে বিধবাদেরকে ধানভাঙ্গা ও গমভাঙ্গার কাজে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। এদের অনেকে বিভিন্ন পরিবারে কলসী দিয়ে নদী থেকে পানি সরবরাহ করে থাকে। অন্যান্যরা কাসিদা বস্ত্রে সূচীকাজ করে, ছেলে মেয়েদের জন্য টুপি ও পোশাক পরিচ্ছদ বানায় কিংবা চক ও অন্যান্য বাজারে ছোট ছোট দোকান সাজিয়ে পেঁয়াজ, রসুন, আদা ও তেলের ভাজা পিঠা ইত্যাদি বিক্রয়ের কাজের মাধ্যমে দিন গুজরান করে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর দরিদ্র

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলো খঞ্জ, অন্ধ ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে আবার কুষ্ঠ রোগীদের সংখ্যাই বেশী। এরা সবাই রাস্তায় ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে

জীবিকার সন্ধান করে। বাস্তবিক এরা সকলের করুণার পাত্র এবং দান খয়রাত পাওয়ার যোগ্য। মুঘল সরকারের আমলে খালসা বা সম্রাটের নিজস্ব মালিকানাধীন ভূসম্পত্তির আয় থেকে এই শ্রেণীর লোকদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কিছু কাল আগেও 'লঙ্গরখানা' নামে এগুলো অব্যাহত ছিল। ১৭৬৯ সালে মিঃ সিকস্ এবং মুর্শিদাবাদের দেশীয় মন্ত্রিবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত ঢাকা জেলার বার্ষিক খরচপত্রের দ্রব্যগুলোর মধ্যে আমরা দাতব্য বিষয়ের আওতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সন্ধান পাই ঃ

		টাকা আনা
১।	গরীব লোকদের জন্য ভাতা	২,৮২৩—১৪
২।	দেশীয় চিকিৎসক ও হাসপাতালের ব্যয়ভার, পীড়াগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের সেবা শুশ্রুষা করার জন্য ওষুধপত্র সহ	১,৫১৮—১০
৩।	অন্ধ ও খঞ্জ ব্যক্তিদেরকে দেয় ভাতা	৩,৬০০—০
৪।	কয়েকশত রকমারি লোকদের জন্য ভাতা ; এসব তারা তাদের সম্রাট বা নবাবদের আদেশ বলে পেয়ে আসছিল	৪৪৮—০
	সর্বমোট	৮,৩৯০—৮

মুঘল আমলে দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতাল

টেনাণ্ট, মিল ও অন্যান্য লেখকগণ দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন যে, কোম্পানী কর্তৃক এদেশ দখল না হওয়া পর্যন্ত দরিদ্র সম্প্রদায়ের জন্য এখানে হাসপাতাল জাতীয় কোনরূপ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত ধারণা। পঞ্চদশ শতকের প্রায় শেষদিকে, সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বের প্রথম ভাগে দরিদ্র, অসহায় ও রুগ্নব্যক্তিদের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রম বা আশ্রয়স্থান স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, "সমগ্র সাম্রাজ্যে সকল বড় বড় শহরে হাসপাতাল স্থাপন করা হোক এবং এর সেবা শুশ্রূষা ও ঔষধপত্রের ব্যয়ভার

খালসা[১] থেকে নির্বাহ করা হোক।" এ ছাড়াও "খালসা ভূ-সম্পত্তির মতই জায়গীরের প্রত্যেক শহরে সে স্থানের আয়তন অনুসারে ভোজনালয় স্থাপনের নির্দেশ দান করা হয়েছিল ; এসব স্থানে দরিদ্র অধিবাসীদের প্রতিপালনের জন্য এবং পরিব্রাজকদেরকে[২] আহার্য পানীয় যোগানোর নিমিত্ত প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য তৈরী করা হতো।" নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত আদেশের বশবর্তী হয়েই ঢাকা হাসপাতাল ও অনাথ আশ্রম স্থাপন করা হয়েছিল। মুঘল সরকারের প্রতি সুবিচারার্থে এটা অবশ্যই উল্লেখ্য যে, এরূপে তারা দাতব্যকার্যে যে, ৮,৩৯০ টাকা ৮ আনা ব্যয় করেছিলেন, তা' বর্তমান সময়ে শহরের কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা (মুঘলযুগে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত সস্তা দামের কথা বিবেচনায় রেখে) অনেক বেশী।

এই সরকারী ভাতা ছাড়াও মহররমের সময় হুসাইনী দালানে এবং ঈদ উপলক্ষে জুমা মসজিদে গরীবদের সাহায্যের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হতো। কিন্তু অনুরূপ চাঁদা এখনও আদায় করা হলেও, ফরায়েজী নীতি প্রচলিত হওয়ার সময় থেকে তা ব্যাপক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে একে বদান্যতার উৎস হিসেবে খুব সামান্যই বিবেচনা করা চলে। শহরের মুসলমান অধিবাসীগণ বৃহস্পতিবার দিন দরিদ্রদের মধ্যে দান খয়রাত ও পাকানো নাস্তা বিলিয়ে দেয়, অন্যদিকে হিন্দুরা রোববার দিনে ও চন্দ্রমাসের দ্বাদশ তারিখে ভিক্ষা প্রদান করে।

দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য বিতরণ

আখড়াগুলোতে এবং অনেক সম্পদশালী অধিবাসীদের গৃহে প্রত্যহ দরিদ্র লোকদের খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। রেভারেণ্ড মিঃ শেফার্ডের হিতৈষী উদ্যোগের মাধ্যমে শহরে একটা দাতব্য ফাণ্ডের ব্যবস্থা হয়েছে এবং চার বছরেরও অধিক কাল ধরে উহা চালু রয়েছে। এটা কেবল এখানে অবস্থানকারী ইউরোপীয় অধিবাসীদের দানে পরিচালিত এবং এই তহবিল থেকে গরীব লোকদের মধ্যে মাসে ৮০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা হয়ে থাকে।

১. 'টেনথ্ রেগুলেশন অব্ জাহাঙ্গীর' গ্লাডউইনকৃত "হিস্ট্রি অব হিন্দুস্থান" দ্রষ্টব্য

২. গ্লাডউইন কৃত "লাইফ অব জাহাঙ্গীর"।

দাসত্ব প্রথা বাংলার পশ্চিমাঞ্চল থেকে এখানে অধিক প্রচলিত

বাংলার পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো অপেক্ষা এখানে ব্যাপক পরিমাণে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে। ঘনঘন দুঃখ দুর্দশা ও দারিদ্রের জন্য সম্ভবতঃ একটি ঘটনাই বিশেষভাবে দায়ী এবং তাহলো অকস্মাৎ প্লাবনের দ্বারা সৃষ্ট দুরবস্থা। দেশের এ অঞ্চল সাধারণতঃ উপরিউক্ত অবস্থার অধীন। পুরুষ কৃতদাসরা হিন্দুদের মধ্যে ভাণ্ডারী ও মুসলমানদের মধ্যে গোলাম নামে পরিচিত। মেয়ে-ক্রীতদাসরা প্রথমোক্তদের মধ্যে দাসীরূপে এবং পরবর্তীদের মধ্যে বাদীরূপে অভিহিত হয়ে থাকে। হিন্দু ও মুসলমান পরিবারে প্রায় সকল মেয়ে-ভৃত্যই ক্রীতদাসী। মুসলমানদের গৃহে এরা পাচিকা হিসেবে কাজ করে, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এ পদে তাদেরকে কখনো নিয়োগ করা হয় না। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র চিড়া, খই ও মুড়ি ইত্যাদি তৈরীর কাজে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়ে থাকে। পুরুষ ক্রীতদাসদের কৃষি শ্রমিক-রূপে নিয়োজিত করা হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে তারা আগাছা সাফ করা, শস্য কাটা, মাছ ধরা, ঘাস কাটা ইত্যাদি নানা জাতীয় কাজ করে থাকে। হিন্দু পরিবারে তারা গৃহ-ভৃত্য হিসেবে কাজ কর্মে নিযুক্ত থাকে; যেমন নদী থেকে জল তুলে আনে, হুক্কা ও পান সাজায় এবং বাসন-কোসন থালাবাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করে। একজন ভাণ্ডারী বা গোলাম প্রায়শঃই প্রতিবেশী পাড়ার ছয় বা আটজন ক্রীতদাসীর স্বামী হয়ে থাকে। অবশ্য তার অধিকাংশ বিয়েই মিথ্যা বা ভাওতাবাজী; মেয়ে-দাসীদের মালিকরাই নিজেদের সঙ্গে তাদের যৌন সম্পর্ক ঢাকা দেবার জন্য এসব বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা করে। একজন দাসের বিবাহ সাধারণতঃ একজন গরীব রায়তের ন্যায় একই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভূমি-দাসের মালিক কর্তৃক এসব ব্যয়ভার বহন করা হয়। কিন্তু মিথ্যা বিয়েগুলোতে মেয়ে-দাসীদের মালিকগণ বিবাহ অনুষ্ঠানের খরচপত্রের জোগান দেয় এবং বরকে সামান্য কিছু অর্থও প্রদান করে থাকে। বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, দাসদাসীদের প্রতি তাদের প্রভুরা দয়া ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করে। এদের থেকে আদায়কৃত কাজ কর্ম কদাচিৎ পীড়াদায়ক। সাধারণতঃ মজুরীতে নিযুক্ত ভৃত্যকে যতটা কাজ করতে হয়, একাজ তার চেয়েও কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত খাদ্যসামগ্রীই তারা গ্রহণ করে থাকে এবং পান, সুপারী ও তামাক ইত্যাদি সাধারণ বিলাস দ্রব্যও তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হয়। অধিকতর সম্পদশালী লোকের

গৃহে যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী অবস্থায় জন্ম নিয়েছে, তাদের অনেককে পরিবারের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে লিখতে পড়তে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। দাসত্ব প্রথার অধীনে আগের দিনে যেমন ছিল, ঠিক তেমনিভাবে দাস ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসা বর্তমানে ততটা প্রচলিত নয় ; তথাপি এটা স্বীকার্য যে, এ ব্যবসা এখনও বেশ চলে। পূর্বে ভূ-সম্পত্তির সঙ্গে দাসদাসীদের বিক্রয় করা হতো এবং হস্তান্তর বিষয়টি সাধারণত একটি স্বতন্ত্র বিক্রয় দলিলের সাহায্যে অনুমোদন করা হতো।

এক একজন দাসদাসীর মূল্য

বর্তমানকালে একজন পুরুষ দাসের উর্ধ্বতম মূল্য ১৫০ টাকা এবং মেয়ে-দাসীদের মূল্য ১০০ টাকা। পরবর্তীদেরকে সর্বদা অল্প বয়সে বিক্রয় করে দেয়া হয় এবং স্পষ্টতঃ ক্রেতারা তাদের কন্যা সন্তানদের সেবা-যত্ন করার জন্যে এদেরকে ক্রয় করে। 'এদের অনেককে ঘৃণ্যভাবে শহরের পতিতালয়েও বিক্রয় করে দেয়া হয়। দেশের এই অঞ্চলে অধিকাংশ দাসদাসীরা সরকার কর্তৃক তাদের রক্ষার অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন এবং মাঝে মাঝে ব্যক্তিবিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে এটা দাবী করে থাকে। তাদের অনেকে এভাবে মুক্তিলাভ করছে এবং দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি গ্রামে এদের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যারা স্বাধীনতা লাভ করেছে কিম্বা যারা মনিবদের পরিত্যাগ করার পথ বেছে নিয়েছে তাদের সকলের জন্য এই সম্প্রদায়গুলো একত্রে সমাবেশ হওয়ার ও আশ্রয় পাওয়ার স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সাধারণভাবে ক্রীতদাসরা 'সিং' পদবী দ্বারা পরিচিত, কিন্তু যারা লিখতে পড়তে জানে তারা তাদের মুক্তিলাভের পর কায়স্থ পদবী ধারণ করে। এ জেলায় বহু ক্রীতদাস বছরে মাত্র কয়েক মাস কিম্বা কয়েক দিন কাজ করে, তথাপি বাদবাকি সময়ের জন্য তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়ে থাকে। এই জেলার ১৭৭৭ সালের দলিল দস্তাবেজে' উল্লেখিত আছে যে, ময়মনসিংহে অবস্থিত তরফের জমিদারের ক্রীতদাসেরা একত্রে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং গোটা পরিবারকেই হত্যা করে ফেলে।

একাদশ অধ্যায়

[চিকিৎসা বিষয়ক বিবরণ—রোগব্যাধি—দুর্ঘটনা—হাসপাতাল—
মানবেতর জীবজন্তুর রোগ।]

রোগব্যাধি ও প্রতিকার, ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি

প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত এ জেলার প্রাকৃতিক ও জলবায়ু সম্পর্কিত বিবরণ থেকে দেখা যাবে যে, দেশের এ অংশের মাটিতে উদ্ভিদরাজির বর্ধনক্রিয়া, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা প্রভৃতির এরূপ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যা' ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের পক্ষে খুবই অনুকূল। ফলে আমরা দেখতে পাই যে, ম্যালেরিয়ার এ বিষ সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে এখানে সৃষ্টি হয়, এবং রোগের সমস্ত রকম জীবাণুর মধ্যে এটি এমন একটি, যা' সবচেয়ে ব্যাপক হারে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ছড়ায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সমগ্র দেশেই ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব অত্যধিক, কিন্তু কোন কোন স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা ম্যালেরিয়া বিস্তারের পক্ষে বেশী সহায়ক। সুতরাং, এই সমস্ত স্থানের একটি সঠিক ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এ বিষের উৎপত্তি হয়, সে সম্বন্ধে অবগত করানোর জন্য জেলার মাটির বিভিন্নতা, এবং প্রাকৃতিক গঠনের বিবরণ দান বা সংক্ষেপে নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে।

দেশের আকৃতি-প্রকৃতি চারভাগে বিভক্ত

১। নিম্ন পলল-ভূমি অঞ্চল—যার সমগ্র এলাকা জল-প্লাবিত হয়ে থাকে।

২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল-নালা ও জলাশয় দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, কৃত্রিম ভাবে উঁচু-করা পলল স্থানসমূহ এবং আংশিক প্লাবিত স্থান।

৩। খাল, নালা ও জলাভূমি দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত জল-প্লাবনিক বা কাঁকরমিশ্রিত ভূ-ভাগ এবং আংশিকভাবে প্লাবিত অঞ্চল।

৪। শহরাঞ্চল।

প্রথম ভাগ

বিভিন্ন চর বা বড় বড় নদীগর্ভে অবস্থিত দ্বীপগুলোসহ প্রথম ধরনের ভূভাগ অন্য সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ। জেলার উভয় ভাগে অবস্থিত ভূমির একটা বিরাট অংশ নিয়ে এটা গঠিত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় অংশটি বুড়িগঙ্গার পশ্চিমে অবস্থিত দক্ষিণাংশের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে, যেখানে এর গতিপথ ডাঙ্গা পর্যন্ত ৪০ মাইল বিস্তৃত। এ দিকটি বিভিন্ন নদ-নদীর তীরভূমি থেকে এর কেন্দ্রাঞ্চল পর্যন্ত কিছুটা ঢালু। এটি দেশের নিম্নতম সমতল ভূমি এবং নদী দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। বর্ষাকালে এখানকার বহুজায়গা ৮ থেকে ১৪ ফুট গভীরে এবং বছরের অধিকাংশ সময় এর সমগ্র এলাকা আংশিক পরিমাণে জলমগ্ন থাকে। বিক্রমপুর পরগণার চড়ান বা আড়িয়াল জলা এধরনের একটি। জেলার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এ ঝিলটির পরিধি প্রায় ১৫ মাইল। এমন কি, সবচেয়ে শুকনোর মৌসুমেও এখানে পানির বেশ গভীরতা পরিলক্ষিত হয়। এটি নানাবিধ ঘাস ও নল-খাগড়ার জঙ্গলে পরিপূর্ণ এবং একপ্রকার পাখি, কুমীর, মাছ ও নানা কীট পতঙ্গে ভরা। এ এলাকার আমন ধান অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কাটা হয় এবং প্রধান ফসলটি সাধারণতঃ এই জলাভূমির চতুষ্পার্শ্বে এবং সাধারণভাবে এ ভূ-ভাগের সব জায়গায় চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। কৃত্রিমভাবে উঁচু করা মাটির টিপির উপর গ্রামগুলো গড়ে তোলা হয়েছে এবং এ ভূভাগের উপরিভাগে এ সব গ্রাম বিক্ষিপ্তভাবে বিরাজমান। জলমগ্নতার সময় গ্রামগুলোকে বেশ গভীর জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত অসংখ্য দ্বীপমালার ন্যায় প্রতীয়মান হয়

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগের আকৃতি বা গঠন প্রণালীতে কৃত্রিমভাবে উঁচু করা মাটির স্তূপ পরিদৃষ্ট হয়, যা এ জেলার ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে বহু গ্রাম ও শহরের অবস্থান-স্থল ছিল। এ ধরনের স্থান বিক্রমপুরে অবস্থিত রামপাল এবং সোনার গাঁয়ের পাইনাম প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পলিমাটি দ্বারা গঠিত; এবং প্রথমোক্ত ভূভাগের ন্যায়, এগুলো প্রথমে বহু স্বতন্ত্র টিপি নিয়ে গঠিত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে, এসবের পরিমাণ এত বেড়েছে যে, সেগুলো এখন কৃত্রিমরূপে উঁচু করা দেশের বিস্তৃত অংশে পরিণত

হয়েছে। বিভিন্ন আকারের ১০ থেকে ২০ ফুট গভীর অসংখ্য খাল-নালা ও জলাশয় দ্বারা এ সকল স্থান বিভক্ত এবং এসব খাল-নালা ও জলাশয়গুলো কোথাও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, আবার অন্যান্য জায়গায় প্রশস্ত মাটির বাঁধের আকারে বিস্তৃত হয়েছে। বছরে কয়েক মাস এগুলো পানিতে পূর্ণ থাকে এবং জোয়ার ভাঁটায় পরিবর্তন সাধিত হয়। এ সময়ে খাল-নালাগুলোতে পালাক্রমে ছোট ছোট নৌকা চলাচল করে এবং এর কর্দমাক্ত এঁটেল মাটি সদৃশ তটভূমি সহ বহু স্বল্প গভীর খাদ দৃষ্ট হয়। উঁচু স্থানের উপরিভাগ কুঁড়ে ঘর ও উদ্যানরাজিতে আচ্ছাদিত এবং এর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাঁশবন, আম, সুপারি, নারকেল ও হরেক-রকম গাছের ঘন বন-জঙ্গল দেখা যায়। এসব বন জঙ্গল এত নিবিড় ও ঘন যে, সতেজ ও অতিবর্ধনশীল শ্যাম-স্নিগ্ধ পল্লব রাজির অভ্যন্তরে একদিকে যেমন সূর্যালোক প্রবেশাধিকার পায় না, তেমনই অন্যদিকে উহা নিম্নস্থ খাল-নালা ও ডোবা ইত্যাদি থেকে উঠে-আসা বাষ্প ও নির্গত পুঁতিগন্ধ আবদ্ধ করে রাখে। এভাবে উক্ত বনজঙ্গল ঠাণ্ডা, অথচ স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর ছায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি করে থাকে।

তৃতীয় বা জল প্লাবনিক ভূভাগ

তৃতীয় বা জল-প্লাবনিক ভূ-ভাগটি কিছুটা লৌহময় ও চুনের গুন বিশিষ্ট কাঁকর মাটির সমন্বয়ে গঠিত এবং এর উপরের স্তরটি ছোট ছোট উদ্ভিদ ও তৃণগুল্ম ইত্যাদির আস্তরণে আবৃত। এ অঞ্চলটি বিভিন্ন খাল-নালায় বিভক্ত হয়ে এর কেন্দ্রস্থলে এসে প্রশস্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। এসব নিম্ন সমতল ভূমির গর্ভভাগ প্রধানতঃ প্লাবন-মুখী নদীসমূহের নৈকট্য অনুসারে কম-বেশী নদীবাহিত পলিজ-মিশ্রিত শক্ত কাদা দ্বারা গঠিত এবং বেশীর ভাগ এলাকা প্রচুর বর্ধনশীল ঘাস ও ঝোঁপ-জঙ্গল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ। উঁচু কাঁকর মাটি অঞ্চল ও ঝোঁপ-ঝাড়ে আচ্ছন্ন এবং অভ্যন্তর ভাগের বনাঞ্চল বিরাট বিরাট বৃক্ষরাজি সমাকীর্ণ। কুম্ভকারের মৃত্তিকা-সদৃশ শোষক পদার্থ বিদ্যমান থাকায়, এ ভূভাগের মাটি পললভূমি অপেক্ষা দীর্ঘ সময়ের জন্য আর্দ্রতা ধরে রাখতে সক্ষম। এখানে বর্ষার সমাপ্তিতে ও শীতকালে ভারী কুয়াশা দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ ভাগ বা শহরাঞ্চল

শহর ও শহরতলীর প্রাকৃতিক গঠন প্রণালী অনেকটা পূর্বস্থিত অঞ্চলের ন্যায় একই রকম উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত বলা যেতে পারে। পূর্বদিকে বিস্তৃত

পলিজ সমতল ভূমি এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ঘন বৃক্ষরাজি ও ঝোপ-ঝাড় বিশিষ্ট জঙ্গল অঞ্চল অবস্থিত এবং খাল-নালা ও জলাভূমির দ্বারা নানা অংশে বিভক্ত, যা' বর্ষা সমাগমে জলমগ্ন থাকে এবং বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যা নদীর মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এর ফলে, বর্ষাকালে শহরটি সম্পূর্ণরূপে জলবেষ্টিত হয়ে পড়ে। লাল কাঁকর মৃত্তিকার উপর শহরটি নির্মিত এবং এর নদীর দিকটি নদী প্রবাহিত তলানি বা পলিমাটিতে আবৃত। কিন্তু উত্তরে ক্যান্টনমেণ্ট বরাবর ধরাপৃষ্ঠ অনাবৃত। ধোলাই খালের একটি শাখা শহরটিকে বিভক্ত করেছে এবং তা থেকে প্রচুর শাখা প্রশাখা বের হয়ে বিভিন্ন দিকে প্রবেশপূর্বক অবশেষে চতুষ্পার্শ্বস্থ খালনালার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্ষার মৌসুমে এগুলো বেশ কিছুটা গভীর ও প্রশস্ত হয় এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট জলপূর্ণ গর্ত বা দীঘির রূপ ধারণ করে। অবশ্য শুকনোর দিনে, উক্ত নালা প্রস্থে অনূর্ধ ১৫ ফুটের একটি খালে পরিণত হয় এবং একমাত্র ভরা জোয়ারের সময় ছোট ছোট নৌকা চলাচলের উপযোগী হয়। শহরের অভ্যন্তর ভাগ অসংখ্য কুপে পরিপূর্ণ; এগুলো থেকে পার্শ্ববর্তী বাড়িঘরের ভিটি ও দেওয়াল নির্মাণ করতে মাটি খনন করা হয়েছিল। অধিকাংশ গর্তের গভীরতা ১৫ থেকে ৩০ ফুট এবং এক একটি ৫০ থেকে ৫০০ ফুট পর্যন্ত এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ ধরনের অনেকগুলো কুপ বিভিন্ন খালে রূপান্তরিত হয়ে ধোলাই খালের কেন্দ্রীয় শাখার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশী কুপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এবং এগুলো পার্শ্ববর্তী এলাকার ময়লা আবর্জনা, শাক-সব্জির খোসা এবং মরা জীব-জন্তু ইত্যাদি স্তুপাকৃত করার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কিছু সংখ্যকে সারা বছর পানি থাকে, কিন্তু অধিকাংশই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আংশিকভাবে পানি পূর্ণ থাকে এবং ঐ সময়ে এ সকল কুপ ম্যালেরিয়া রোগের প্রধান উৎপত্তি স্থলে পরিণত হয়।

সমাধি

মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই শহরের অভ্যন্তরে, তাদের বাসগৃহের সন্নিকটে বা সংলগ্ন স্থানে মৃতদেহ কবরস্থ করে থাকে। কবরগুলো কদাচিৎ সাড়ে চার ফুট অপেক্ষা অধিক গভীর হয়। ফরায়েজীগণ সমাধির স্থান স্মরণীয় বা চিহ্নিত করে রাখার জন্য, কখনও মাটির উঁচু মঞ্চ তৈরী করে না এবং মৃতকে কবরস্থ করার কিছুকালের মধ্যেই তারা সাধারণতঃ এসব

কবরের উপর বাড়ি ঘরও তুলে থাকে। এখানকার কিছু সংখ্যক মুসলমান গোরস্থান শহরের পশ্চিম দিকে জঙ্গলে অবস্থিত। এ স্থানের কবরগুলো প্রায় ৬ ফুট গভীর করে খনন করা হয়ে থাকে; দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে যারা কফিন বা শবাধারের খরচপাতি বহন করতে অক্ষম, তারা বাঁশের তৈরী কাঠামো শবের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দেয়; কিন্তু এই সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও, শৃগাল ইত্যাদি মাঝে মাঝে শবদেহ কবর খুঁড়ে বের করে ফেলে।

চিতা

হিন্দুগণ শহরের সন্নিকটে শবদেহ পুড়িয়ে ফেলে। কিন্তু অধিকতর দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে কোনরূপ চিতা তৈরী করা হয় না; তারা শবদেহ নদীতে ফেলে দেয়।

ম্যালেরিয়া রোগের কারণসমূহ

যে সমস্ত নদনদী সব ক'টি অঞ্চলের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত করে, সেগুলো হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গার নদীর শাখাপ্রশাখা। মে মাসে এসব নদীতে সর্বনিম্ন উচ্চতায় পানি প্রবাহিত হতে শুরু করে, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় যে, ঐ সময়ের পূর্বে কয়েক সপ্তাহব্যাপী, আংশিক পরিমাণে জলপূর্ণ হয়ে পড়ে। প্রকৃত পক্ষে, বছরের অধিকাংশ সময় বহু স্থান শুষ্ক অবস্থা থেকে স্যাঁতস্যেঁতে অবস্থার দিকে পরিবর্তনের মুখে সন্ধিক্ষণের পর্যায়ে থাকে। এটা বেশী করে ঘটে, যখন মৌসুমের প্রথম দিকেই প্রবল বৃষ্টিপাত হয়, কিংবা যখন নদীর স্রোতে বাধা সৃষ্টি করে প্রবলভাবে বাতাস বইতে থাকে। এভাবে পশ্চাদ-দিকে প্রবাহ ঘটায়, অথবা সেখানেই ইতিমধ্যে জমে থাকা পানির বহির্গমন পথে বাঁধার সৃষ্টি করে। কিন্তু এ মৌসুমে ইতিপূর্বের যে বারিপাতই হয়ে থাক না কেন, প্রথমোক্ত বিভাগের কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ জুনের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে পানিতে ভরে যায় এবং সাধারণতঃ জুলাইয়ের দশ তারিখের মধ্যে, দেশের বিপুল বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবনের (জেলার আয়তনের প্রায় ৫/৬ ভাগ পরিমিত জায়গা) মুখে পড়ে, এবং ২ থেকে ১৪ ফুট গভীর পানিতে ডুবে যায়। এই সময়ে জলেস্থলে অতিবর্ধনশীল উদ্ভিদরাজির চূড়ান্ত প্রাচুর্য চোখে পড়ে এবং সমগ্র দেশ একটা সুবৃহৎ বিস্তৃত সতেজ-শ্যামল মাঠের রূপ পরিগ্রহ করে। পানির

মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধানের চারাগুলো আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বর্ধিত হয়ে পানির উপরে উঠে আসে ; অন্যদিকে অনুরূপ বর্ধনশীল, হালকা ও কমনীয় কমল, কমুজ ও শিঙ্গরের প্রশস্ত পাতা ও সুশোভিত রঙ্গীন পুষ্পরাজি পানির ওপরে ভাসতে থাকে। জলাভূমির উপরিভাগে প্রচুর পানি ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদরাজির সমন্বয়ে একটি নিবিড়-ঘন উদ্ভিজ্জ-গালিচার মত সৃষ্টি হয় এবং তা শত-সহস্র কীট পতঙ্গের আশ্রায় স্থল ও সুন্দর ইকানা (Iacana) এবং হরেক রকম পালক শোভিত পাখির নিবাসে পরিণত হয়। সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি সময় না-আসা পর্যন্ত পানির উচ্চতায় কোনরূপ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ব্যতি-রেকে দেশের এরূপ প্লাবিত অবস্থা অব্যাহত থাকে। অতঃপর বন্যায় পানি হ্রাস পেতে শুরু করে এবং নদ-নদীর উচ্চতা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে দেশের কেন্দ্রাঞ্চল থেকে পানি নিষ্কাষিত হয়ে যেতে থাকে। ধান ক্ষেতের পানি সাধারণতঃ পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হয়ে উঠে। অন্যদিকে জলাভূমির পানিতে দেখা দেয় কালো রঙ। এটা বিশেষ করে জেলার উত্তর ভাগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেখানে বিশেষতঃ শহরের কাছাকাছি অবস্থিত খালনালা ইত্যাদির নির্গত পানি রঙের দিক থেকে দেখতে চায়ের তরল ক্বাথের বা তলানির অনুরূপ। সম্ভবতঃ এর কারণ হচ্ছে বিলঝিলে উদ্ভিদ-ধারক পদার্থসমূহের উপর মাটির লৌহজাতীয় দ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া। এর ফলে, বিশেষতঃ পাকস্থলিতে অসুস্থতার আকারে পীড়া দেখা দিতে শুরু করে, এবং শহরের স্থানীয় অধি-বাসীরা এর জন্য একান্তভাবে বুড়িগঙ্গার পানির সংমিশ্রণকেই দায়ী করে থাকে। অতপর বিভিন্ন জায়গায় পানি বের হতে শুরু করে এবং স্রোত যত ক্ষীণ হয়ে আসে, পানির রঙ ততই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করতে থাকে। অবশেষে ধানগাছ ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদ আগাছা ইত্যাদি মাটিতে পড়ে গিয়ে সংযুক্ত-জড়ো স্তুপে পরিণত হয় এবং শেষোক্ত বস্তু থেকে উৎকট দুর্গন্ধ নির্গত হয়, যা' ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরের জন্ম দেয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের শেষ অবধি ম্যালেরিয়া রোগ ব্যাপক আকারে বিরাজ করতে থাকে। এ সময়ে পচা-গলা নানা বস্তু, বা দুর্গন্ধ-যুক্ত কাঁদা-পানি ও মরা উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপমাত্রা ইত্যাদি—এ রোগের উৎপত্তির পক্ষে অতিরিক্ত অভিসম্পাতরূপে দেখা দেয়। অতঃপর, আদ্রতার সঙ্গে মাটির সম্পৃক্তির ফলে এবং উহা পচনশীল ও ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিজ্জ পদার্থের ঘনস্তর দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ায়, এ সময়ে একটি নিস্তব্ধ আবহাওয়া বা গুমোট পরিবেশের

সৃষ্টি হয়ে থাকে, যা' জলাভূমি, বিল-ঝিল ইত্যাদির গলিত পদার্থ থেকে নির্গত দূষিত বাষ্পাদি ছড়ানোর কাজে ব্যাপক পরিমাণে সাহায্য করে। সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময়, মাঝামাঝি ধরনের ঝড় বা ঝড়ো আবহাওয়ার কিছু সময় পূর্ব থেকে, বাতাস হাল্‌কা ও পরিবর্তনশীল হয় এবং বছরের অন্য যে কোন সময় অপেক্ষা অধিক শান্ত থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। দিনের বেলা আকাশ সাধারণতঃ মেঘমুক্ত থাকে, উত্তাপ প্রচণ্ড হয় এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাটিস্থ পানির বাষ্পীভবন শুরু হয়। অন্যদিকে, ঘনীভূত বাষ্প থেকে সৃষ্ট প্রচুর শিশিরকণা রাতের বেলায় ঝরতে থাকে; ফলে রাত্রিকাল কুয়াশাচ্ছন্ন ও অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা হয়। এসব কিছুর ফলে, অন্যান্য সময় অপেক্ষা তখন এমন একটি মুহূর্তের সৃষ্টি হয় যখন ম্যালেরিয়া তার প্রচণ্ডতম শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে ক্রিয়া করতে থাকে।

সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল অস্বাস্থ্যকর স্থান

চারটি ভূ-ভাগ বা অঞ্চলে বিভক্ত করা জেলার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভূ-ভাগদ্বয় সর্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। বিশেষ করে সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল এ জায়গা দু'টোতে ম্যালেরিয়া থেকে উদ্ভূত রোগব্যাধি চরম আকারে দেখা দেয়। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এসব স্থানের অধিবাসীরা অনবরত জ্বরের কবলে জীবন যাপন করে চলেছে। এখানে সর্বপ্রকার পালাজ্বর বা কম্পজ্বর সারা বছর বিরাজ করে; এবং এর ফলে এখানে প্লীহার নানাবিধ সম্প্রসারণের পরিণাম ও পাকস্থলীস্থ নাড়ি-ভুঁড়ির দীর্ঘস্থায়ী পীড়ার প্রাদুর্ভাব জেলার যে কোন স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী। মেঘনার পূর্বতীরে অবস্থিত ত্রিপুরা জেলার গুবাক কুঞ্জ ইত্যাদিতে এই একই রকম ঘটনা পরিদৃষ্ট হয়, যা' সোনারগঞ্জ ও ভাওয়াল অপেক্ষা আরো অধিক অস্বাস্থ্যকর। এখানে গুবাক তরুর সারি একত্রে এত বেশী ঘন-সন্নিবিষ্ট করে রোপন করা হয় যে, তাদের উপরিস্থিত ঘন-পল্লব রাজির সৃষ্ট আচ্ছাদনভেদ করে সূর্যালোক কখনও মাটি স্পর্শ করতে পারেনা। এ বৃহৎ বিস্তৃত অঞ্চলের সর্বত্র ভূমিভাগ আংশিকভাবে অর্ধ-বর্ষব্যাপী জোয়ারের সময় প্লাবিত হয়ে থাকে এবং তা' ম্যালেরিয়া রোগের একটি উর্বর উৎসরূপে পরিগণিত হয়। ম্যালেরিয়া এখানে চরম আকারে কেন্দ্রীভূত হয়ে আত্ম প্রকাশ করে। স্থানীয় অধিবাসীরা এই অন্ধকারাচ্ছন্ন এলাকার জলবায়ুতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে; তাদের পিঙ্গল-বর্ণ বিশিষ্ট চোখের

মৃতবৎ বিবর্ণ দৃষ্টি, শরীরের অংশ বিশেষে স্ফীতি ও কোঁচকানো দুর্বল হাঁটাচলা, বিষাক্ত আবহাওয়ায় তাদের শ্বাস নিঃশ্বাস ফেলা ইত্যাদি থেকে অনুমান করা চলে যে, কত শীঘ্র তারা ম্যালেরিয়ার সার্বগ্রাসী বিষবৎ ছোবলের নিকট পরাজয় বরণ করে।

ধান্যক্ষেত্র বিশেষভাবে অস্বাস্থ্যকর

ধান্যভূমিগুলোকে কয়েকটি দেশে যেমন, রাশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে অস্বাস্থ্যকর বিবেচনা করা হয়; ফলতঃ সেখানে এজাতীয় খাদ্য শস্যের ফলন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ জাতীয় উৎসগুলো থেকে উদ্ভূত রোগব্যাধি প্রধানতঃ আড়িয়াল বা চড়ান জলা ভূমির নিকস্থ জায়গায় পরিলক্ষিত হয় যেখানে ভূভাগটি নীচু, এবং সাধারণ প্লাবনের সময় নিমজ্জিত হওয়ায় আমন ধানের ফসল সিক্ত অবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে থাকে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে যখন মাঠ থেকে উত্তপ্ত বাষ্প উত্থিত হয় তখন এখানে ব্যাপক রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং অধিবাসীদের ভাষায়—জ্বর ও চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ ওঠা রোগের উৎপত্তি ঘটায়। সম্ভবতঃ ধানের চাষাবাদ অপেক্ষা, পতিত ও জঙ্গলা ভূমি আবাদ করার বা ভাঙ্গার সময় রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী ঘটে। মিঃ কাসান ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারণভূমি পরিষ্কার করার দরুন সৃষ্ট কয়েকটি সাংঘাতিক ধরনের পীড়ার কথা উল্লেখ করেন। অধুনা একটি ঘটনা মিঃ ল্যাম্বের গোচরীভূত হয়েছে, যাতে কিছুটা একই রকমের কাজে অনুরূপ বিপদ ঘটতে দেখা গেছে। বেশ কিছুকাল যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় এখন তা' জঙ্গলে ভরে উঠেছে। এরূপ একটি গ্রাম পরিষ্কার করাতে, ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি পার্শ্ববর্তী এলাকায় তার ভূ-সম্পত্তির একটিতে ৩০টি রায়ত পরিবারের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এপ্রিল মাস শেষ হওয়ার আগেই জ্বরে ও কলেরায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়; ফলে তিনি উক্তস্থান পরিত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হন।

সন্নিকটস্থ পাট ও শন পচানো পুকুর অনেক সময় জ্বরের কারণ

গ্রামের সন্নিকটে পুকুরের পানিতে শন ও পাট ডুবিয়ে পচানোটাও সম্ভবতঃ জ্বরের অন্যতম কারণ হওয়া বিচিত্র ঘটনা নয়। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোককে আমার ব্যক্তিগতভাবে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি এ ধরণের একটি কূপের নিকটেই তাঁবু ফেলে বাস করছিলেন

এবং তার যকৃতে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চারসহ ভয়ানক ক্ষতিকারক অবিরাম জ্বরের একটি ঘটনা ঘটে—যা' নিঃসন্দেহে ঐ কারণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। শন বা দড়ির সাহায্যে পদমর্যাদা সূচক-দণ্ড প্রস্তুতের সময়, এর অস্বাস্থ্যকর বিষয় অনুমান করে উক্তকার্য পরিত্যক্ত হয়, এবং নেপেলিয়ান সরকার নেপল্সের সন্নিকটস্থ এই দ্রব্যের সকল উৎপাদককে, শহর থেকে কিছুটা দূরে নির্দিষ্ট করা একটা ছোট্ট দীঘিতে উক্ত শন বা পাট গাছ পচাতে বাধ্য করেন।

নীল গাছ পচানো

শনের মতই প্রায় সমান ক্ষতিকারক মনে করা হলেও, আমি যতটা জানি তাতে নীল গাছ পানিতে পচানো ততটা অস্বাস্থ্যকর নয় কিংবা একাজে যারা নিয়োজিত, তাদের জন্যও বিশেষ ক্ষতিকারক নয়। জেলার সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান হচ্ছে বিভিন্ন চর ও নদীতীরগুলো। ম্যালেরিয়া থেকে এসব স্থানের তুলনামূলক অব্যাহতি লাভ থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা হয় যে, অনবরত বায়ু চলাচলের দরুনই এরূপ ব্যতিক্রম ঘটে; নদ নদীর খাতগুলো স্পর্শ বা পরিশুদ্ধ করে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং এরূপ পার্শ্ববর্তী স্থানে বিষ জাতীয় কোন কিছু জমে বা আটকে থাকলে তা' বাতাসে সরিয়ে ফেলে। ফলে, ম্যালেরিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।

বদ্ধপানি ব্যবহার ও পান করা রোগব্যাধির বড় উৎস

ম্যালেরিয়ার পরেই বদ্ধ পানির ব্যবহার ও পান করা সম্ভবতঃ এ জেলার রোগ-ব্যাধির সবচেয়ে বড় উৎস। যে সমস্ত অধিবাসী স্রোতস্বিনী নদী থেকে কিছুটা দূরে বসবাস করে, তারা নিঃসন্দেহে রান্নাবান্না ও খাওয়ার জন্য বিল বা জলার পানি ব্যবহার করে থাকে। শহর ব্যতিরেকে কূপের সন্ধান কদাচিৎ মেলে। এর উত্তরাংশে ও শহরতলীতে যেখানে কাঁকরমাটি পলিজ মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত নয়, সে স্থানে ১৮ থেকে ২২ ফুট গভীরে বেশ ভাল পানির সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত খালটির দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত কূপসমূহের পানি সাধারণতঃ নিকৃষ্ট ও অরুচিকর। কারণ এতে নিকটবর্তী অসংখ্য বেসিন বা গর্ত, নর্দমা ইত্যাদি থেকে তরল আকারের পলিজ মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে চুয়ানো-পচনশীল ও দুর্গন্ধযুক্ত পশু-পাখি, নানাবিধ শাকসবজির পরিত্যক্ত অংশ ও পচা-গলা উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি মিশ্রিত চরম দূষিত

পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে বলে প্রতীয়মান হয়। বর্ষাকাল ব্যতিরেকে শহরের এ অংশে কেউই কুপের পানি ব্যবহার করেনা। ঐ সময় এসব কুপের পাড় প্লাবিত করে নদীর পানি ঢুকে পড়ে, ফলে খাল-নালার মধ্য দিয়ে অবাধে প্রবাহিত স্রোত ধারার সঙ্গে শহরের অভ্যন্তরের বহু দুষিত পদার্থ, ময়লা আবর্জনা ভেসে যায়। অধিকাংশ ইউরোপীয় ও স্থানীয় সম্পদশালী অধিবাসী অতীতে বহু বছর যাবৎ শীতলক্ষ্যা নদীর পানি ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা উদরাময়, প্লীহা ও শ্লীপদ বা গোদের সম্প্রসারণ ইত্যাদি জনিত রোগব্যাধির জন্য বদ্ধ জলাভূমির পানির ব্যবহারকেই দায়ী করে থাকে। মনে হয়, যে সমস্ত জায়গায় পানীয় হিসাবে এরূপ পানির ব্যবহার হয়, সে সমস্ত এলাকায় ঐ সব রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। কিন্তু ব্যাধির কারণ ও এর ফলাফলের ক্ষেত্রে একই প্রকার ঘটনা ঘটে কিনা, তা অবশ্য নির্ণয় করা সহজ নয়।

রোগব্যাধির কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ

রোগ ব্যাধির অন্যান্য কয়েকটি সাধারণ উপসর্গ হলো নতুন চাল ও অপরিপক্ক শাক, সব্‌জি গ্রহন এবং শীতকালের উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় চোপড় ও বিছানা পত্রের অভাব ইত্যাদি। বৃষ্টির মৌসুম শুরু হওয়ার প্রাক্কালে আউশ বা গ্রীষ্মকালীন ফসল কাটা হয় এবং নিয়মমাফিক না শুকিয়েই অনেক সময় গরীব শ্রেণীর লোকেরা উক্ত খাদ্যশস্য ব্যবহার করে থাকে। এ অবস্থায় খাদ্য গ্রহন খুবই অপাচ্য এবং পাকস্থলী সংক্রান্ত নানাবিধ রোগব্যাধির পক্ষে উত্তেজক ও পূর্ব লক্ষণ। নানা ধরনের অপরিপক্ক শাক্-সবজি যেমন অরণ্য, জঙ্গল ও ঝিলস্থিত কয়েকটি প্রজাতি যা' এ সময়ে বাজারে বিক্রয় হয় এবং কয়েক প্রকার মৎস্য যেমন, বোয়াল ইত্যাদি নাড়ীভুড়িতে পীড়ার সৃষ্টি করে ও অন্ত্রকীটের জন্ম দেয় বলে প্রতীয়মান হয়। এই জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব এখানে সাধারণ ঘটনা। অত্যাধিক দরিদ্র শ্রেণীর খুব কম লোকই শীতের মাসগুলোতে স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা আবহাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কাপড় চোপড় বা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। কেবলমাত্র ধনী অধিবাসীগণ কম্বল ও তুলার তৈরী লেপ ব্যবহার করে। দরিদ্র ব্যক্তির একমাত্র আচ্ছাদন পুরাতন বস্ত্র ও তালিদেওয়া শতচ্ছিন্ন কাপড় চোপড়ের তৈরী কাঁথা বা কম্বল এবং এর সঙ্গে থাকে শিমুল তুলাভরা একটি

তৈলাক্ত বালিশ ও একটি মাদুর বা বিছানোর জন্য কিছু খড়কুটা ইত্যাদি। মোটামুটি এই হলো তার সম্পূর্ণ বিছানাপত্র।

১৭৮১ সালের মহামারী

দেশের এ অংশে মহামারীর প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে জেলার দলিলপত্রে আমি দুটো ঘটনার সন্ধান পেয়েছি। কোন রোগের বর্ণনা ব্যাতিরেকেই, ১৭৮১ সালে, একটি সাংঘাতিক ধরনের পীড়ায় প্রাদুর্ভাবের উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কলকাতার বেশ কিছু পরিমাণ লোক প্রাণ হারায়; এবং সেপ্টেম্বর মাসে সিলেটের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিণ্ডসে লেখেন, "বর্তমানে সিলেটে মহামারী চরম আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। জমিদার ও নায়েবদের অনেকে এ মহামারীর কবলে প্রাণ হারিয়েছেন এবং বাদবাকিরা একত্রে শহর ছেড়ে চলে গেছেন।"

১৭৯৭ সাল

১৭৯৭ সালে কালেক্টর তাঁর একটি রিপোর্টে বর্ণনা প্রসঙ্গে বাকেরগঞ্জের একটি পরগণায় রোগব্যাধি ও মৃত্যু সংখ্যার উল্লেখ করে বলেন, "জনৈক চাল ব্যবসায়ীর এক বাড়িতেই এগারো দিনে ১৭ জন লোক প্রাণ হারিয়েছে। আমি যে হিসাব পেয়েছি তা' থেকে অনুমিত হয় যে, এ মহামারী ইতিমধ্যে চার থেকে পাঁচ শত লোকের জীবন কেড়ে নিয়েছে, যা' এখনও অবদমিত হয়নি।"

১৮১৭ সালের কলেরা মহামারী

১৮১৭ সালে সম্ভবতঃ কলেরা মহামারী একই সময়ে এ জেলা, যশোর ও নাটোরে দেখা দেয়। এখানে এর প্রথম প্রাদুর্ভাব ঘটে সোনারগঞ্জ পরগণায়। কিন্তু এ সময়ে কিংবা পরবর্তী সময়েও, আমি এর ধ্বংসের ব্যপকতা সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হইনি। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও এই ব্যাপকতা একটা অনির্দিষ্ট বিরতিতে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে চলেছে; সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অবশ্য এর নিগ্রহ কিছুটা হ্রাস পেয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা এখন এসব ব্যধির প্রকোপ কিছুটা কম। দেশীয় পদাতিক রেজিমেণ্টের সামরিক হাসপাতালে প্রায় ৩০ জন গোলন্দাজ সৈনিকের একটি ক্ষুদ্রদল সহ ১৮২৮ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ রকম ভর্তি হওয়া রোগীর

সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮ জন। ১৮২৫ সালে কলেরা মহামারীতে শহরে ৪২৭ জন লোকের প্রাণহানি ঘটে।

সবিরাম জ্বর

দেশের এ অংশে সবিরাম জ্বরের (Intermittent fever) প্রাদুর্ভাব একটি সাধারণ ঘটনা। বিশেষতঃ বর্ষা ঋতুর শুরুতে ও সমাপ্তিতে এ রোগ দেখা দেয় এবং একবার এ ব্যধি প্রশ্রয় পেলে তা' চন্দ্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় ফিরে ফিরে আসে। অবিরাম জ্বরও (Remittent fever) সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আবির্ভূত হয় এবং সমগ্র শীতকালে অব্যাহত থাকে। তখন প্রায়শঃই শরীরের স্থান বিশেষে অস্বাভাবিক রক্ত-সঞ্চয়ের আকার ধারণ করে ও মাঝে মাঝে মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়।

গোদ ও গলগণ্ড

সবিরাম ও অবিরাম জ্বরের পরেই ব্যাপক আঞ্চলিক রোগ হলো গোদ ও গলগণ্ড। পূর্বোক্তটি এখানে বিশেষভাবে শহরের উপকণ্ঠে ও বিক্রমপুরের আড়িয়াল জলাভূমির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দেখা যায়। ব্যাধিটি শরীরের বিভিন্ন অংশে যেমন নিম্নাংশে অণ্ডকোষে ও মাঝে মাঝে বাহুদ্বয়েও পরিলক্ষিত হয়। এর সঙ্গে যে জ্বর দেখা দেয়, তার নাম ছাউজ্বর (Sawjhar)। এ জ্বরের শুরুতে শরীরে ভীষণ কাঁপুনি দিয়ে হঠাৎ শীত অনুভূত হতে থাকে এবং পরে তা' ঘন ঘন খিঁচুনিতে পরিণত হয় এবং কয়েক দিন অব্যাহত থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সঙ্গে পিত্তাধিক্য জনিত বমন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চন্দ্রের পরিবর্তনের সময়ে এ রোগের তৎপরতা বৃদ্ধি পায় এবং সাধারণতঃ জ্বরের তীব্রতা ও সময়ের পরিধি যতটা হ্রাস পেতে থাকে ততই প্রতিটি রোগাক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ফোলাও বেড়ে যায়।

গলগণ্ড

জেলার উত্তর বিভাগে বিশেষতঃ শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার তীরভূমি অঞ্চলে এবং ময়মনসিংহের যমুনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। কিন্তু দক্ষিণ বিভাগের বিক্রমপুর ও রাজনগর এলাকায়ও এ রোগের অস্তিত্ব কম নয়। দেশের এ অংশে অবস্থিত দুটো থানাধীন ১০৬টি গ্রামের মধ্যে উত্তর ভাগের অন্তর্গত ৭২টি গ্রামে এবং ধলেশ্বরী ও মেঘনার দক্ষিণে

২৭টিতে গোদ ও গলগণ্ড উভয় ব্যধির সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বানার ও লক্ষ্মার নদীগর্ভের ন্যায়, চুনের গুণ বিশিষ্ট ও কাঁকর মিশ্রিত খাতের উপর দিয়ে প্রবহমান ব্রহ্মপুত্রের পানি থেকে গোদের উদ্ভব হয়ে থাকে। তথাপি যে স্থানগুলোতে রোগটি প্রায়ই দেখা দেয় তার প্রকৃতি বিচার করে এই কারণ অপেক্ষা, বরং এটাকে ম্যালেরিয়া জাতীয় রোগের কারণ বলেই মনে হয়। বেশীর ভাগ দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, গ্রামগুলোতেই এর প্রাদুর্ভাব ঘটে; এ সব স্থান স্রোতস্বিনী নদী থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত, এখানকার অধিবাসীরা বদ্ধ পানি ব্যবহার করে থাকে এবং উক্ত স্থান-সমূহ ম্যালেরিয়ার উর্বর-উৎস। গলগণ্ড পুঁতিগণ্ডময় পরিবেশের সৃষ্টি এ অভিমত এখন ইউরোপে বেশ ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে পারি, যা' অধুনা আমার পর্যবেক্ষণের আওতায় এসেছে এবং তাতে বহুল পরিমাণে উক্ত অভিমত সমর্থিত হয়। ঘটনাটি ছিল তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের। এদের একজনের ছিল গলগণ্ড এবং আর এক জনের ছিল গোদ বা শ্লীপদ। যে বাড়ীটিতে তারা বসবাস করতো, তা' ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। মাত্র কয়েক গজ দূরেই ছিল ময়লা-আবর্জনাযুক্ত একটি অন্ধকার পুকুর। এরই সঙ্গে সংযুক্ত একটি নালা শূন্য অবস্থায় ছিল; আর তার নিকটেই আগাছা ও ময়লা-পচায় রুদ্ধ হয়ে যাওয়া গভীর ও উন্মুক্ত একটি নর্দমা বিরাজ করছিল। উক্ত পরিবার রান্নাবান্নার কাজে ও পানীয় জল হিসাবে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করতো এবং বহু বছর যাবৎ তাদের এ অভ্যাস চলে আসছিল। আটজনের অন্য একটি পরিবার যাঁরা এই গৃহে আশ্রয় নিয়েছিল এবং উপরিউক্ত পরিবারের লোকজনের সঙ্গে বসবাস করছিল, তাদের চারজনই সেপ্টেম্বর ও জানুয়ারী মাসের মধ্যে গলগণ্ড রোগে আক্রান্ত হয়। ব্যধিগ্রস্থরা সবাই ছিল ছ'থেকে পঁচিশ বছরের বালিকা ও মহিলা এবং এর পূর্বে তারা এ রোগের সামান্যতম আভাস কিম্বা কোনরূপ লক্ষণও দেখেনি। স্ফীতি অবস্থাটা মাংস গ্রন্থির সবটাই আক্রমণ করে বসে। কেবল একটিমাত্র ঘটনায় উক্ত ব্যাধি একটিমাত্র কর্ণের নিম্নভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। হাইড্রিয়ো পটাশ বা ক্ষারের সাহায্যে তাদের সকলের ব্যাধিই নিরাময় করা হয়, কিন্তু তাদের গৃহ ত্যাগের পর কিছু সময় অতিবাহিত না-হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। স্থানীয় লোকেরা এখানে অত্যধিক পরিমাণে লেবুর আরকের ব্যবহারকেই গলগণ্ড রোগের

প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী করে থাকে। এটিত এমন একটি দ্রব্য যা' বিক্রমপুর ও সোনারগঞ্জ এলাকার অধিবাসীরা তাদের রান্নাবান্নায় অধিক পরিমাণে ব্যবহারের পক্ষপাতী।

প্লীহা

এ জেলায় প্লীহা-বর্ধনজনিত অন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যাধি খুবই ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী ; এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ পানীয় হিসেবে ব্যবহৃত বদ্ধ জলাভূমির পানিকেই উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের জন্য দায়ী করে থাকে। এ রোগ সাধারণতঃ সবিরাম জ্বরের মাধ্যমে আরম্ভ হয় এবং এতে ঠাণ্ডা লাগানো খুবই মারাত্মক ; বহুক্ষেত্রে যদিও জ্বরের পরিমাণ সামান্য থাকে, তথাপি আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে অজীর্ণতার সাধারণ লক্ষণগুলো ছাড়াই রোগীর অজান্তে অথবা কোনরূপ শারীরিক বিশৃঙ্খলা না ঘটিয়ে এই রোগ মন্থর অথচ কপট গতিতে আক্রমণ করে থাকে। বয়স্ক লোকজন অপেক্ষা অল্প বয়স্ক বালক-বালিকারাই অত্যধিক পরিমাণে এ রোগের শিকার হয়। এদের অনেকের বেলায় ব্যাধির সঙ্গে অন্ত্রকীটের সন্ধান মিলে এবং বেশ কিছুসংখ্যক ক্ষেত্রে রক্ত আমাশয় পরিলক্ষিত হয়। অল্প বয়স্ক তরুণদের রোগের বেলায় চিবুক ও ঠোঁটের ক্ষতাদি থেকে শুষ্ক খোলস খসে পড়তে দেখা যায় এবং সামান্য জ্বরও থাকে, যাতে সে অল্প দিনের মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে মৃত ও জীবন্ত অংশের মধ্যে একটি সীমারেখার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতাদির শুষ্ক অংশ খসে পড়াতে ছোট ছোট দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে যেখানে আমি এ জাতীয় বলবর্ধক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি, সেসব ক্ষেত্রে একটি ঘটনাও দেখিনি, যাতে ক্ষত সারানোর পরে ক্ষতের দাগ সম্পূর্ণ মুছে গেছে কিংবা রোগী নিরাময় হয়েছে। শারীরিক লক্ষণাদি ও অবস্থা-দৃষ্টে তার উপযোগী অনুপাত অনুসারে বিশোধক ও উদ্ভিদ জাতীয় বলকারক ঔষধপত্রের সংঙ্গে সংমিশ্রিত হিরাকষ হচ্ছে প্রতিষেধক, যা' থেকে সবচেয়ে বেশী উপকার লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহুক্ষেত্রে অন্ত্রাদির শ্লেমারশ্যায়, ত্বক বা ঝিল্লীর যুগপৎ অবস্থানরত প্রদাহ থাকার ফলে, এর দর্শনীয় বস্তুর আপাতঃ বিরুদ্ধ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে।

রক্ত আমাশয় ও উদারাময়

রক্ত আমাশয় ও উদারাময় উভয় রোগেরই প্রাদুর্ভাব বর্ষা ও শীতকালেই হয়ে থাকে। রক্ত আমাশয় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জলে ভেজা ও ঠাণ্ডা লাগা

ইত্যাদির ফলে দেখা দেয়; অন্যদিকে উদরাময় ব্যাধিটা প্রধানতঃ নতুন চাল, অপরিপক্ক শাক্‌সব্‌জি, জলার পানি ও তৈলাক্ত মাছের কয়েকটি প্রজাতি ইত্যাদি ব্যবহারের ফলেই দেখা দেয়। উদরাময় সবচেয়ে অদম্য ও অনারোগ্য একটি ব্যাধি এবং এতে প্রতি বছর বেশ কিছু সংখ্যক স্থানীয় অধিবাসী প্রাণ হারায়।

বাতরোগ

পুরোনো ও অল্প-পুরোনো বাত রোগের প্রাদুর্ভাব বর্ষা ও শীত ঋতুতেই অতিমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। শীতকালে নদীতে স্নান করার ফলে এবং দেশীয় লোকদের মধ্যে সর্বাঙ্গে ভিজে কাপড়-চোপড় জড়ানো, কিংবা ভিজে কোমরবন্ধ বা গামছা পরার অতি প্রচলিত অভ্যাস থেকে—এ রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ব্যাধিটা অত্যধিক হলে পারদ ঘটিত ঔষধপত্র ও আফিম ছাড়া, দেহে ক্রিয়া করার জন্যে অল্প শক্তিসম্পন্ন প্রতিষেধক খুব কমই ক্রিয়া করে থাকে। পারদের অপব্যবহার কিংবা যৌনব্যাধির ক্ষেত্রে দেশীয় হাতুড়ে চিকিৎসক কর্তৃক পারদের ব্যবহার ইত্যাদি প্রায়ই এ রোগের একটি পূর্ব লক্ষণ। এখানে হিঙ্গুল বা সিন্দুরের ধূম ফুস্‌ফুসের মধ্যে শুঁকে শুঁকে গ্রহণ করানোর দ্বারা সাধারণতঃ এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এ ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বনের ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে রোগীর মুখ থেকে সাংঘাতিক ভাবে লালা নিঃসৃত হতে থাকে। এভাবে পারদ জাতীয় ঔষধপত্র গ্রহণের দরুন সচরাচর দেশীয় লোকদের মধ্যে দুরারোগ্য বাতরোগের প্রাদুর্ভাব হয়; ফলে অস্থি-গ্রন্থিদ্বয়ের চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়ে এবং অস্থি-সমূহে পচন ধরতে দেখা যায়; অনেক ক্ষেত্রে চোয়ালটা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়; এতে তার মুখ খোলার আর উপায় থাকেনা এবং প্লেনয়েড গহ্বরের চতুর্দিকে প্রদাহের সৃষ্টি করে।

গুটি বসন্ত ও অন্যান্য রোগ চর্মরোগ

গুটি বসন্তের আবির্ভাব ঘটে সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিল মাসে এবং সেই সমস্ত ঋতুতে যখন বাতাস প্রবল হয় এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকে। এ সময়ে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে চরম আকারের যকৃৎ ও অন্ত্রের প্রদাহ জনিত ব্যাধির আবির্ভাব একেবারে অজ্ঞাত নয়। বর্ষাকালে সর্দি, হুপিং কফ

ও শ্বাসনালীর প্রদাহ ইত্যাদি ব্যাধিগুলো নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। শেষোক্তটি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মারাত্মক রূপ ধারণ করে থাকে। এতে ত্বরিত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তুলনামূলকভাবে কাশ রোগ ও স্বরযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর প্রদাহ বিরল। কিন্তু হাঁপানি (Asthma) ও পুরাতন শ্বাসনালীর প্রদাহ শীতঋতুতে বৃদ্ধলোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

চোখ ওঠা রোগ

চোখ ওঠা রোগ, বিশেষতঃ পলি-অধ্যুষিত নিম্ন এলাকায় এবং প্রথমোক্ত ভূ-ভাগের আড়িয়াল জলার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ব্যাপক আকারে দেখা দিয়ে থাকে। বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যধিটা এখানে বহুল পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনদের মতে, ভিজে ফসলের গন্ধ থেকে উক্ত রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে; অবহেলা ও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এতে চোখে ছানি পড়তে দেখা যায় এবং চোখের ভিতরকার পর্দা পুরু হয়ে ওঠে ও পাতাগুলো অন্তর্মুখীন হয়ে পড়ে; উপরিউক্ত প্রতিটি রোগের অস্তিত্বই এখানে লক্ষ্য করা যায়।

নাকরা

স্থানীয় হাসপাতালে যারা চিকিৎসার্থে আগমন করে, তাদের প্রায়শঃই নাক, গলা ও কানে রোগাক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। নাকরা নামে অভিহিত অতি পরিচিত ব্যাধি যা' কপালস্থিত গহ্বর ও পিটুয়াটরী (Pituatory membrane) ঝিল্লীর শিরা উপশিরায় রক্ত-সঞ্চারিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে, এবং এখানে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। দেশের এ অংশের অন্যান্য কয়েকটি ব্যাধির ন্যায়, এ বোগ থেকে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমাযোগে দেখা দেয়। এতে সাধারণতঃ মাত্রাধিক জ্বর ও মাংঘাতিক মাথা-ব্যথা হয়ে থাকে। দেশীয় লোকদের প্রবর্তিত সাধারণ চিকিৎসা-পদ্ধতি হলো—সুতীক্ষ্ণ নল-খাগড়া দিয়ে রোগাক্রান্ত নাসিকার পর্দা কেটে রক্ত বের করে দেয়া। এর ফলে, সাধারণতঃ রোগের অনেকটা উপশম হয়ে থাকে। নাসারন্ধ্রের পর্দা পুরু হয়ে যাওয়া এবং পেকে ঘা' হয়ে যাওয়া—অত্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সম্ভবতঃ উপরি-উক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই এরূপ হয়ে থাকে।

জিহ্বা ও টন্‌সিলে ঘা' এর আকারে মুখের রোগ দেখা দেয়, এবং কানের রোগে এর পর্দা পুরু হয়ে ওঠে ও পেকে যায়। এ সব ব্যাধি নাসারন্ধ্রের রোগের মতই সমপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

চর্মরোগ

সর্বাপেক্ষা প্রচলিত চর্মব্যাধি গুলোর মধ্যে কুষ্ঠরোগ, দাদ, চুলকানি, জরঠোসা ও খোসপাঁচড়া ইত্যাদি ব্যাপক আকারে দেখা যায়। সর্বস্তরের কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব শহরেই পরিলক্ষিত হয়। এতে চর্মে দাগ পড়া থেকে আরম্ভ করে শরীরের আক্রান্ত অংশের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

গর্মিরোগ বা সিফিলিস

গর্মিরোগ বা সিফিলিসের প্রাদুর্ভাব কুষ্ঠরোগের চাইতে কম নয়। প্রায়ই এ ব্যাধি শোচনীয় পর্যায়ে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। পারদের অপব্যবহারের দ্বারা দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষত সচরাচর দৃষ্ট হয়, এবং বিশেষতঃ নাসিকা ও তালু যখন কুষ্ঠরোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন এদের সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন হয়ে থাকে। কতকগুলো পচন এবং এনথ্রাক্স জাতীয় রোগ—উভয়ের প্রাদুর্ভাব সাধারণতঃ শহরের বাইরেই বেশী। ফ্যাসিল্যাটিং ক্ষত বিশেষ করে সেই সমস্ত লোকদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যারা প্লীহারোগে ভোগে।

বদহজ্‌মী রোগ

বদ-হজ্‌মীরোগ বিভিন্ন আকারে সকল স্তরের লোকদের মধ্যে দেখা যায় এর মধ্যে একটির নাম পিত্তশূল। এ ব্যাধি গাঁজাখোরদের মধ্যে খুব বেশী লক্ষ্য করা যায়।

পাকস্থলী থেকে ক্ষুদ্রতন্ত্রের গমনপথটি গাঁজাখোরদের ক্ষেত্রে অতীব স্পর্শকাতর। যত নরম খাদ্যই এদের পরিবেশন করানো হোক না কেন, খাওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই তা' প্রবল বমনের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। ফলে পেটের পেশীগুলো বেশ শক্ত হয়ে যায় এবং ব্যাথাটা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, রোগী নিদারুণ যন্ত্রণায় মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে থাকে। ব্যথা উপশমকারী ঔষধপত্র (এ্যানোডাইন) সাময়িকভাবে কাজ করে। এতে রোগী অস্থিসার সম্পন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়ে; এবং এভাবে কিছুকাল রোগভোগের পর তার মৃত্যু ঘটে।

অন্ত্রকীট

অন্ত্রকীটজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব এখানে খুব বেশী। এতে দেশীয় লোকেরা খুব ভোগে। বড় কৃমি, সুতা কৃমি ও ফিতা কৃমি ইত্যাদি জনিত রোগ এখানে সচরাচর দেখা যায়। এছাড়া, চ্যাওটা (চ্যাপ্টা) কৃমি জনিত আরও একটা ব্যাধি মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয় এবং কতকগুলো গুরুতর ব্যাধির সৃষ্টি করে থাকে, যেমন মৃগীবাঈ, ব্যথা ও শরীরে পানি নামা ইত্যাদি। বাংলায় একে বলা হয় "চ্যাওটা" এবং সংস্কৃতে "বৃদ্ধনিবা"। দেশীয় চিকিৎসকদের মতে, চ্যাওটা কৃমির প্রাদুর্ভাব ফিতা কৃমির চাইতে বেশী এবং এর একটি প্রজাতি নমুনা হিসেবে আমি অধুনা "মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটিতে" পাঠিয়েছি, এবং 'ডিস্টোমা হিপাটিকাম' থেকে পৃথকীকৃত করার জন্য আমি এর নাম দিয়েছি 'ডিস্টোমা ইন্‌টেস্টাইনেট'। 'ডিস্টোমা হিপাটিকাম' নামের এই চ্যাওটা—যকৃৎ ও তার শিরা উপশিরায় পরিলক্ষিত হয়। আর 'ডিস্টোমা ইনটেস্টাইনেট' নামক চ্যাওটা দেখতে চ্যাপ্টা, প্রায় গোলাকার এবং টিপলে হাতে শক্ত মনে হয় এবং এর চতুষ্পার্শ্ব পরিষ্কার-ভাবে চিহ্নিত। কীটের মাথাটা ত্রিকোনাকৃতি ও কিছুটা বাঁকা; এর অগ্রভাগে অতি ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র দেখা যায়, যা ম্যাগনিফাইং আয়না ব্যতিরেকে খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। পশ্চাদভাগের ছিদ্রটি সম্মুখস্থ ছিদ্র হতে মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত। শেষোক্ত ছিদ্রটি কচকচে হাড্ডি দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং ঠিক্‌রানো চোখের মত ভেসে থাকে। এটা ব্যাসার্ধে অর্ধলাইন। এর সম্মুখ ভাগে একটি ছোট্ট সাদা গুট্‌লি রয়েছে। কীটটির রঙ গাঢ়লাল; দৈর্ঘ ১ ইঞ্চি থেকে সোয়া ইঞ্চি, প্রস্থে আধ ইঞ্চি; এরা ক্ষুদ্র তন্ত্রে বাস করে থাকে। 'ডিস্টোমা ইনটেস্টাইনেট' ও 'ডিস্টোমা হিপাটিকাম' নামক চ্যাওটাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রধানতঃ এদের ছিদ্রের অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। পূর্বোক্তটির ছিদ্রদ্বয় পাশা-পাশি এবং অন্যদিকে, পরবর্তী 'চ্যাওটা'র পশ্চাদভাগের ছিদ্রটি বুকের মাঝামাঝি স্থানে সন্নিবিষ্ট। ডি. ইনটেস্টাইনেটটি দেখতে বেশ বড়, এবং সরু অথচ শক্ত। এর অগ্রভাগ 'ডি. হিপাটিকাম' নামক চ্যাওটা অপেক্ষা স্থূল। দেশীয় হাতুড়ে ডাক্তারগণ তন্ত্র থেকে এই কীটসমূহ বহিষ্করণের নিমিত্ত নিম্নলিখিত ওষুধপত্র প্রয়োগ করে থাকে, যেমন পারদ জাতীয় কৃষ্ণবর্ণা সাল-ফরেট, নাগ্নভমিকা, বাটিয়া ফোন-ডোসা ও ইরাইসিব প্যানিকুলেট ইত্যাদি।

উন্মাদ

১৮২৭ থেকে ১৮৩৭ সালের মধ্যে, মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত ৭৫৭ জন রোগীকে অত্র স্থানের পাগলা গারদে ভর্তি করা হয়েছিল। উক্ত সংখ্যার মধ্যে ৬৫৮ জন ছিল পুরুষ এবং ৯৯ জন মহিলা। এদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে।

মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাদের পেশা ও জীবন যাপনের অবস্থা সম্পর্কিত একটি বর্ণনা নিম্নে দেয়া গেল।

গৃহস্থ বা কৃষি সংক্রান্ত				রিফুগর	... ...	১
শ্রমিকগণ	... ...	৬৭২		ব্যবসায়ী	... ...	২
ফকির	... ...	১৪		বরকন্দাজ	... ...	১
ব্রাহ্মণ	... ...	১৩		পাচক	... ...	১
সিপাই	... ...	৮		ঔষধ বিক্রেতা	... ...	১
পতিতা	... ...	৭		গায়ক	... ...	১
ভৃত্য	... ...	৫		চাল ব্যবসায়ী	... ...	১
নাপিত	... ...	৩		আর্দালী	... ...	১
দর্জি	... ...	৩		স্বর্ণকার	... ...	১
বৈরাগী	... ...	২		রাজমিস্ত্রী	... ...	১
তাঁতি	... ...	২		ঝাড়ুদার	... ...	১
ধোপা	... ...	২		ধাঙ্গড়	... ...	১
গোয়ালা	... ...	২		আর্মেনীয় অধিবাসী	...	১

মোট ৭৫৭ জন

দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাবের পূর্ণ চিত্র উল্লেখিত বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরা প্রায় অসম্ভব। কারণ, এখানে কেবল সেই সমস্ত উন্মাদগ্রস্ত লোকদেরই ভর্তি করা হয়েছিল যাদের মাত্রাধিক্য পাগলামীর বিষয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করা হয়েছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে যাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। ১৮৩১ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এ জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের ভর্তি-হওয়া রোগীদের সংখ্যার বিরাট পার্থক্য থেকে এটা আরো স্পষ্ট ধরা পড়ে।

ঢাকা	...	...	২৩৫
ত্রিপুরা	...	...	৩৫
বাকেরগঞ্জ	...	...	২৮
ফরিদপুর	...	...	২৪
ময়মনসিংহ	...	...	১৯
চট্টগ্রাম	...	...	১৮
নোয়াখালী	...	...	১৪
আসাম	...	...	৪

জলাতঙ্ক

শহরে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা গড়ে বছরে প্রায় ৪ জন। যে সমস্ত লোকদেরকে শহরাঞ্চলে কুকুর ইত্যাদিতে কাম্‌ড়ায় তাদেরকে প্রায়শঃই ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করাবার জন্য হাসপাতালের শরণাপন্ন হতে হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা স্বেচ্ছায় তাদের ক্ষতস্থান কেটে ফেলে। এহেন অস্ত্রোপচারের পরে ক্ষত স্থান দীর্ঘ সময় কেট্‌লির পানিতে কিম্বা ভিস্তিওয়ালার পানি দ্বারা ধৌত করা হয় এবং পরে সিলভার নাইট্রেট দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়। এখানে কুকুরে কামড়ানো রোগীর জন্য এটাই প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতি। এহেন চিকিৎসা-পদ্ধতি অবলম্বনের পর কোন রোগীর পুনরায় জলাতঙ্ক হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। যে সমস্ত লোকের জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার সম্পূর্ণ অবহেলার জন্যই এরূপ ঘটেছে; আর যারা হাসপাতাল থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করতো, কেবল তাদের বেলায় এরূপ জলাতঙ্ক রোগ দেখা দিতো। বিভিন্ন জলাতঙ্কগ্রস্থ রোগী যারা আমার পর্যবেক্ষণের আওতায় এসেছে তাদের সবাই কুকুরে কামড়ানোর প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে এবং রোগের সব লক্ষণ দেখা দেয়ার গড়পড়তা তিনদিন পরে আমার শরণাপন্ন হয়েছে। এ অবস্থা ছিল জলাতঙ্ক রোগের দ্বিতীয় পর্যায়। ব্যথা ও ফোলা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্ষতস্থান শুকিয়ে উঠেছে—এরূপ জায়গায় মাঝে মাঝে সামান্য আঘাতের দরুন—দেহে জলাতঙ্ক ব্যাধির সম্পূর্ণ লক্ষণ পুনরায় দেখা দিয়েছে। পরলোকগত ডঃ আদাম কর্তৃক এ ধরনের একটি ঘটনা 'মেডিক্যাল এণ্ড ফিজিক্যাল সোসাইটি'তে উপস্থাপিত হয়েছিল। এ জাতীয় দুটো রোগীর দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। এর একটি ঘটনায়, রোগীকে পায়ের বৃদ্ধ-আঙ্গুলে কামড়ে দেয়; কিন্তু ক্ষতটা ছিল খুব

সামান্য এবং তা' শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে; রোগীর কোনরূপ অসুবিধাই ছিল না। কিন্তু উক্ত ঘটনার সাত সপ্তাহ পরে, যখন সেই লোক নিলাম-ডাকের স্থলে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়েছিল, তখন একজন পথচারীর পায়ের সামান্যতম আঘাতে পুনরায় তার জলাতঙ্ক রোগ দেখা দেয়, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে প্রদাহ শুরু হয়। পরের দিন যখন আমাকে ডেকে পাঠানো হয়, তখন রোগীর সব রকম বিকার পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আরব্য সমাজে এরূপ একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, জলাতঙ্ক রোগে রোগীর মূত্রনালীতে ছোট ছোট কুকুর ছানার জন্ম হয়ে থাকে এবং সেখান থেকে কুকুরের ছানাগুলো বের করে দেয়ার উপরই আরোগ্য নির্ভরশীল। এখানকার হিন্দু-মুসলমান চিকিৎসক-গণও ঐ একই ধারণা পোষণ করতেন, এবং সে অনুসারে তাদের সকল ঔষধপত্র প্রয়োগ করা হতো—যাতে মূত্রনালীর ক্রিয়া বর্ধিত হয়, এবং কুকুর ছানাগুলো বের হয়ে আসে। রোগীর প্রস্রাব খুব যত্ন সহকারে তাঁরা পরীক্ষা করতেন এবং রোগীর মঙ্গলামঙ্গল তার এ রকম প্রস্রাবের উপর নির্ভরশীল ছিল। আফিম, ট্রামোনিয়াম, প্রুসিক এসিড ও গরম ভাপ ইত্যাদি জাতীয় প্রতিষেধক আমি ব্যবহার করেছি। অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে সামান্য উপকার ছাড়া তেমন কিছুই পাইনি।

মৃগী রোগ, অসাড়তা ও সন্ন্যাসরোগ বা অঙ্গ-বিকৃতি

অন্যান্য স্নায়ু সংক্রান্ত ব্যাধিগুলোর মধ্যে মৃগী রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যধিক। পক্ষাঘাত ও সন্ন্যাস রোগ মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কারণজনিত কিংবা কারণহীন ধনুষ্টংকার ব্যাধি তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

কারিগর শ্রেণীর রোগব্যাধি

কারিগর শ্রেণীর লোকেরা যারা কাপড় বোনে, সুতা কাটে এবং কাপড় ধোয় তাদের মধ্যে দৃষ্টিহীনতা, রাতকানা এবং এমন কি, মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ব্যাধি সচরাচর দৃষ্ট হয়। শাঁখারিদের মধ্যে কোমর-বেদনা জনিত রোগও পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অত্যধিক ঘাম অথবা আংশিক ঘাম ইত্যাদিও ব্যাধি, যা' ইউরোপে প্রায় অজ্ঞাত। কেবল এখানেই এর প্রাদুর্ভাব মাঝে মাঝে দর্জি, সুচীকর্মশিল্পী ও লেখকদের মধ্যে দেখা যায়। এদের হাত পা' স্বভাবতঃই আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং দেখে প্রতীয়মান হয় যে, এই মাত্র তারা পানি থেকে হাত পা চুবিয়ে এনেছে; দর দর করে

বড় বড় ফোটায় ঘাম গড়িয়ে পড়তে থাকে এবং তা' শুকিয়ে যেতে না যেতেই বা কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে না ফেলতেই, আবার বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হতে থাকে। দীর্ঘ সময় হাতপায়ে ঘাম জমা থাকলে চামড়া কুঁচকে যায় এবং এদের মধ্যে অনেকেই জ্বালা-পোড়ার কথা বলে থাকে। বিভিন্ন বয়সের ও বিভিন্ন গঠনের লোকদের মধ্যে এ রোগ পরিলক্ষিত হয়। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত সবচেয়ে কম-বয়স্ক যে রোগীকে আমি দেখেছি সে ছিল দর্জিকাজ-শিক্ষারত বারো বছরের একটি বালক। সাধারণতঃ শীত ঋতুতেই এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং এ সময়ে এ জাতীয় রোগীদের প্রস্রাবের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে থাকে। মাত্রাধিক্য ঘাম মাঝে মাঝে রোগীর এমন অসুবিধার সৃষ্টি করে যার ফলে কাজ কর্ম চালানো অসুবিধা হয়ে পড়ে। আমি লৌহ ও ধাতবজাত ঔষধসহ এই ব্যাধিতে বলবর্ধক ও ধারক জাতীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করেছি, কিন্তু কোন ফলোদয় হয়নি।

দুর্ঘটনা

দেশের পূর্বাংশে যে সমস্ত দুর্ঘটনা সবচেয়ে বেশী ঘটে, তার মধ্যে হাড়-ভাঙ্গা, গ্রন্থিচ্যুতি ইত্যাদি সাধারণতঃ গাছ থেকে পতনের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। এছাড়া, বন্য শূকর, মহিষ, কয়েক প্রকার কাঁটাযুক্ত মাছ যেমন, শিঙ্গী, মাগুর ইত্যাদি দ্বারা আঘাত ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ, শূকরের দন্তাঘাত ছোট ছোট কাটা দাগের ন্যায় দেখা যায়। এমন কি, রোগীর বাহুতে, পিঠে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিশ বা তদূর্ধ্ব ক্ষতচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এসব ক্ষতগুলো সাধারণতঃ বেশ গভীর এবং মাংস পেশী পর্যন্ত এমন ভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়, যাতে এগুলোকে ছুরির কাটা বলে প্রতিয়মান হয়। দেশীয় হাসপাতালে আনীত বেশীর ভাগ রোগীর বাঘ ও চিতাবাঘের আক্রমণে সৃষ্ট ক্ষতগুলো দেখতে থেতলানো এবং এটা সাধারণতঃ বাঘের থাবা থেকে সৃষ্ট। এসব ক্ষতে প্রায়শঃই খুব বেশী রক্ত জমে যায়। এমন কি, কোন কোন নখের আচড় দৃষ্টিগোচর না হলেও আঘাতের জায়গায় রক্ত ঠিকই জমে থাকে। ক্ষতের চারপাশে পচন ধরে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এতে দুরারোগ্য নালীর সৃষ্টি হয়। এসব ক্ষেত্রে প্রধান বিপদ দ্বিতীয় পর্যায়ের রক্তক্ষরণ থেকেই দেখা দেয়। প্লীহা রোগগ্রস্থ শ্রমিকদের দ্বিতীয় পর্যায়ে রক্তক্ষরণ প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, যেখানে তাদের রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে এবং আভ্যন্তরীন রক্তের জমাটবাধা শক্তি রহিত হয়। ফলে মধ্যম ধরনের শিরার মুখ বন্ধ রাখতে অপারগ হয়।

দেশীয় হাসপাতালে অধুনা সংঘটিত একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, কাঁধের কাছাকাছি মাংস পেশীর উপর বেশ বড় রকমের একটি ক্ষতে শিমের বীচি পরিমাণ জায়গা ব্যতীত বাকী সম্পূর্ণ অংশ একটি বিশুদ্ধ 'Granulating Surface' এর মত পরিদৃশ্যমান হয়। শিমের বীচি-পরিমাণ জায়গাটুকু একটি শিরার মুখের উপর অবস্থিত থাকে এবং এর গা' ঘেঁসে সামান্য কিছুদূর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়। শিরায় গিট দেবার কয়েক ঘণ্টা পরে শিরার গায়ে ঘা য়ের সৃষ্টি করে। কেবল শিরায় গিট বাঁধা ছাড়াও. রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্যে স্পঞ্জ দ্বারা চেপেও ধরা হয়, কিন্তু সাবক্লাবিন (Subclavian) নামক শিরাকে চেপে না ধরা পর্যন্ত রক্ত ক্ষরণ কয়েকদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। এরূপভাবে (Subclavian) শিরা মৃদুভাবে কয়েকদিন চেপে রাখার ফলে শিরার মুখের চতুর্দিকে রক্ত জমাট বেঁধে যায় এবং গ্রানুলেসন টিস্যুর (Granulation Iissue) সৃষ্টি হয়।

বাঘ ও চিতাবাঘের আক্রমণজনিত ক্ষত অপেক্ষা মহিষ ও কুমীরের ক্ষত অনেক বেশী মারাত্মক। মহিষ ও কুমীরের আক্রমণজনিত ক্ষতের রোগী কদাচিৎ আরোগ্য লাভ করে। কুমীরের কামড়ে সাধারণতঃ হাঁটুই অধিক আক্রান্ত হয় এবং এটা না কেটে ফেললে, শোচনীয় পরিণতি ঘটে থাকে। স্থানীয় লোকেরা সাধারণতঃ অঙ্গচ্ছেদে রাজি হয় না; ফলে পচনশীল অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে নিরাময় হতে খুব কমই দেখা যায়। আমি জীবন্ত অংশ থেকে মৃত অংশকে স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় পায়ের মাঝামাঝি স্থানের একটি ক্ষত দেখেছি, যেখানে মৃত অংশে টিবিয়া (Tibia) ও ফিবুলা (Fibula) এবং পায়ের পাতার হাড়গুলো বের হয়েছিল। ফলে রোগী শেষ পর্যন্ত তার পা' কেটে ফেলতে বাধ্য হয়। বন্য শূকর, বাঘ ও চিতাবাঘ ইত্যাদির আক্রমণ জনিত দুর্ঘটনা প্রধানতঃ দেশের উত্তরাংশের প্রজা, কাঠুরে ও মাঝি মাল্লাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ সকল হিংস্র পশুর দ্বারা সেখানকার বনজঙ্গল পরিপূর্ণ। এমন কি, শহরের মধ্যস্থলেও চিতাবাঘ হত্যা করা হয়েছে।

শিঙ্গী ও মাগুরের করাতসদৃশ কাঁটা ফোটানো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা এবং মাঝে মাঝে তা মারাত্মক হয়ে দেখা দেয়। ব্যথা ও প্রদাহ হাত থেকে বাহুতে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায়ই শিরায় পচন ধরে ও হাড় পেকে যায়। জেলেরাও অনেক সময় হাঙ্গর ও রয় (ray) মাছের আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে। রয় মাছের লেজের কাঁটার আঘাত খুবই মারাত্মক; এবং এর

আঘাতে লোকের মৃত্যু পর্যন্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। উইলিয়ামসনের 'ফিল্ড স্পোর্টস অব ইণ্ডিয়া' (Field sports of India) নামক গ্রন্থেও এরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাড়ভাঙ্গা, গ্রন্থি-বিচ্যুতি ও আঘাত জনিত ক্ষতের পরেই অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা হচ্ছে আগুনে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় ক্ষতসমূহের চিকিৎসা করার নতুন পদ্ধতি হলো ধূনা তুলার দ্বারা বেঁধে রাখা। কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে এসব দেশে উপরিউক্ত ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি খুব একটা উপযোগী নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি আমি অনুসরণ করেছিলাম। এতে পচনশীল অবস্থায় ক্ষতের মধ্যে ছোট ছোট পোকা জন্মানোর ফলে তুলার আচ্ছাদন খুলে ফেলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, এবং প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে ফিরে আসতে হয়েছিল।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত আকস্মিক মৃত্যুর সংখ্যা

১৮৩০ থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত সময়ে পুলিশ কর্মচারী কর্তৃক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট রিপোর্টকৃত এ জেলার আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনাগুলোর একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

	পুরুষ	রমণী
আত্মহত্যা	৫	০
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা	৪	৮
পানিতে ডুবে মৃত্যু	২১	২০
সর্পাঘাতে ,, ...	৩০	২৬
বজ্রাঘাতে ,, ...	৩	৩
বিষ ক্রিয়ায় ,, ...	৩	৩
গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু	৩	০
প্রহার জনিত ,, ...	৯	০
বাঘের আক্রমণে ,, ...	৮	৩
শূকরের আক্রমণে ,, ...	২	১০
মহিষের ,, ,, ...	২	০
কুমীরের ,, ,, ...	৮	৬
বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে মৃত্যু ...	৩	০
গর্ভপাত জনিত মৃত্যু	০	৭
হত্যা জনিত ও অনুল্লিখিত বিবিধ কারণে মৃত্যু	৪৫	৩০
মোট	১৪৬	১০৯

দেশীয় হাসপাতালে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও আকস্মিক মারামারি থেকে আহতদের ভর্তির সংখ্যা

এ জেলার দেশীয় হাসপাতালে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও ঝগড়া ঝাটির ফলে, মাথায় বংশদণ্ড বা লাঠির আঘাত জনিত ক্ষত ও থেঁতলানো জখম নিয়ে বেশ কিছু পরিমাণ রোগী ভর্তি হয়ে থাকে। এ সকল আঘাত যেমন, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, মাথার মস্তকের পর্দা সরে যাওয়া এবং হাড়ের নীচে পচন ধরা ইত্যাদি সত্বেও এর ভয়াবহ পরিণতি খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। বিগত দশ বছর যাবৎ এ জাতীয় কয়েকশ' রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছিল কিন্তু কারোরই ট্রিফাইন (Trephine) করার প্রয়োজন হয়নি। এ সময়ের মধ্যে যে দুটো ক্ষেত্রে ট্রিফাইন করা হয়েছিল তার মধ্যে একটি হলো গাছ থেকে পতনজনিত কারণে মাথার হাড় ভেঙ্গে গিয়ে মগজে ঢুকে যাওয়ার ফলে এবং অন্যটি ছিল মস্তিষ্কের পর্দায় টিউমার হওয়ার জন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ার কারণে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত রোগীটি আরোগ্য লাভ করেছিল। তরবারী অথবা বর্শার আঘাত জনিত ক্ষতসমূহ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। জমিদার নিয়োজিত পশ্চিমা বরকন্দাজ ও ভৃত্যগণ ছাড়া এ অস্ত্রের ব্যবহার খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত রোগীকে প্রায়শঃই অস্ত্রোপচার করা হয়, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেণীর ও সর্ববয়সের রোগীদের পুরাতন ফোঁড়া, চোখে ছানি, ফিসশুলা, নেত্রনালী, এনট্রোপিয়াম ও টেরিজিয়াম ইত্যাদি জাতীয় প্রচুর রোগী ছিল। এ ছাড়া কানের ঝুলন্ত টিউমারসহ বিভিন্ন ধরনের কোষবদ্ধ টিউমার; পেটে পানি নামা এবং ওভারিয়ান টিউমার ইত্যাদি রোগের রোগীও ছিল। অণ্ডকোষে পানি জমা এখানকার একটি সাধারণ ব্যাধি। কিন্তু সাধারণতঃ দেশীয় লোকেরা ইউরোপীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করানোর চাইতে কষ্টিক দ্বারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করাই বেশী পছন্দ করে; ফলে হাসপাতালে ইনজেকসন কিংবা অস্ত্রোপচার দ্বারা চিকিৎসা করার প্রচলন তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

অর্শরোগ

দেশীয় চিকিৎসকগণ কর্তৃক আর্সেনিক জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ প্রয়োগে অর্শ রোগের চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। এহেন চিকিৎসায় খুব ভোগান্তি হয় এবং শারীরিক গোলযোগের সৃষ্টি করে। মূত্রনালীর সংকোচন জনিত কারণে প্রস্রাব বন্ধ হওয়া সংক্রান্ত রোগটিও নিয়মিত ঘটনা। এর চিকিৎসার্থে হাসপাতালে

প্রায়শঃই ক্যাথেটার বা নলের ব্যবহার হয়ে থাকে। বিগত আট বছরে এহেন নল প্রয়োগে মাত্র দু'জন রোগীর মূত্রথলি ফুটো হয়ে যায়। মূত্রথলির পাথরি-ব্যাধি মাঝে মাঝে দৃষ্টিগোচর হয়। বিগত দু'বছরে পাঁচ জন রোগীর মূত্রথলি থেকে পাথর বের করা হয় এবং এদের একজন ছাড়া সবাই আরোগ্য লাভ করে। কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রে মূত্রথলিটি রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিল। মাঝে মধ্যে মূত্র থলিতে পাথরি যেতে দেখা যায় এবং বিগত পাঁচ বছরে এ জাতীয় চারজন রোগীর মূত্রনালীতে আটকে পড়া পাথরি বের করে আনা হয়।

হার্নিয়া

কুচকিতে এবং তার অব্যবহিত নিম্নস্থিত হার্নিয়া রোগ বিরল। কিন্তু নাভিস্থলে ও এর উপরে এবং নীচে ছিঁড়ে যাওয়া অবস্থা সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। অবরুদ্ধ কোকনঁলের (Harniae) ঘটনা খুব কমই ছিল।

জন্মগত দোষজনিত ব্যাধি

জন্মগত দোষজনিত ব্যাধি যেমন, ফাইমোসিস ও ঠোঁট ফাটা ইত্যাদি সম্ভবতঃ খুব বেশী দেখা যায়। শিরদাঁড়ার ফাটল (spina bifida) এবং চোখের ছানি পড়া বিরল ঘটনা। প্রকৃত এন্যুরিজম (aneurism) ও ক্যান্সারের একটি ঘটনাও আমি এখানে পাইনি। শহরের নিম্নশ্রেণীর, হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই সন্তান-প্রসবের সময় ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের শরনাপন্ন হয়ে থাকে।

সন্তান প্রসব

এদেশে সন্তান প্রসব অতি সহজে ঘটানো হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে অবশ্য, ধাত্রীদের অবহেলা অথবা তাদের অমার্জিত ও মাত্রাধিক্য হস্তক্ষেপের দরুন প্রসবের সাধারণ গতি বাধাপ্রাপ্ত বা বিলম্বিত হয়। ফলে স্থান বিশেষে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা অথবা হাতের সাহায্যে প্রসব করানো হয়ে থাকে। যে সব ক্ষেত্রে প্রসূতির ফুল পড়ে না, অস্বাভাবিক প্রসব হয় এবং পূর্বাহ্নেই পর্দা ছিঁড়ে যায় ও প্রস্রাবের বেগ হ্রাস পায়—সে সব ক্ষেত্রে প্রসব স্বভাবতঃই কষ্টকর হয়ে থাকে।

অস্বাভাবিক প্রসবে পূর্বাহ্নে হাত বের হয়ে আসার ঘটনাই বেশী। প্রসূতির সময়মত ফুল না পড়ার ঘটনা প্রায়শঃই পরিলক্ষিত হয়। গর্ভাশয় থেকে রক্তক্ষরণের দুটো মাত্র ঘটনা আমি পেয়েছি এবং উভয় ক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণ ছিল গর্ভাশয়ের মুখে ফুল আটকে পড়া। এখানকার দেশীয় মেয়েদের মধ্যে প্রসূতি অবস্থায় বেশীর ভাগ মৃত্যুর ঘটনা প্রসবের পরে উত্তেজক ঔষধ পত্র সেবনের ফলে ঘটে থাকে। বিভিন্ন উপকরণ মিশ্রিত ঔষধ পত্রাদি শহরে বিক্রি হয়ে থাকে এবং প্রসূতিরা তাদের শাদাস্রাব সম্পূর্ণ তিরোহিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ জাতীয় ঔষধ সেবন অত্যাবশ্যক বলে মনে করে। এ ধরনের ঔষধ সেবন, সাংঘাতিক গরমের মধ্যেও বদ্ধ ঘরের ভিতরে আগুন প্রজ্জলিত রাখার রীতি থেকে মাতৃগর্ভে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং এর পরিণতি শোচনীয় হয়ে থাকে। হিন্দুদের মধ্যে যে সমস্ত মেয়েদের সন্তান পেটে-থাকা অবস্থায় মৃত্যু ঘটে, তাদেরকে দাহ করার পূর্বে পেট কেটে মৃত সন্তান বের করে আনা হয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এদেরকে স্বতন্ত্র স্থানে কবরস্থ করা হয়ে থাকে।

দেশীয় হাসপাতাল

শহরের চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে দেশীয় হাসপাতাল, পাগলা গারদ, জেল হাসপাতাল ও রোগ প্রতিষেধক বীজাগার বিভাগ ইত্যাদি। প্রথমটি কলকাতার দেশীয় হাসপাতালের শাখা হিসাবে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয়। এটি সরকার থেকে মাসিক ১৫০ টাকা অর্থ সাহায্য ও কিছু পরিমাণ ঔষধপত্র সরবরাহ এবং শহরের ইউরোপীয় ও দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে চাঁদা বাবদ-তোলা ২২,০০০ টাকার সুদ থেকে লব্ধ অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। বিগত চার বছরে যারা চিকিৎসা-সংক্রান্ত উপদেশ ও ঔষধ ইত্যাদি সাহায্য পেয়েছে, তাদের বাৎসরিক গড়পড়তা সংখ্যা ২,৬১০। এদের বেশীর ভাগ চিকিৎসার্থীই হাসপাতালে উপস্থিত হয় অথবা তাদের বাড়িঘরে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

হাসপাতালটিতে মাত্র ৪০ জন রোগীর স্থান সংকুলান হয়ে থাকে এবং এটি একবারেই সংকীর্ণ ও খারাপভাবে পরিকল্পিত একটি অট্টালিকা। যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এটা তার সঙ্গে কোনক্রমেই সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। মিঃ ওয়াল্টার,

এবং অতি সম্প্রতি মিঃ জে. গ্রাণ্ট এর ব্যাপক উন্নতি বিধান করেন। এঁরা একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও এতদ্‌সংক্রান্ত বহির্বাটী নির্মাণ করেন। অট্টালিকাটিতে ৭২ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রস্থ একটি ওয়ার্ড আছে এবং এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রায় ৮ ফুট প্রশস্ত দুটো বারান্দা। প্রতিটি বারান্দা শেষে একটি করে কামরা রয়েছে। যে সব রোগীরা এ হাসপাতালে ভর্তি হতে আসে, তারা দরিদ্র, নির্বান্ধব ও নিঃস্ব ব্যক্তি। এরা সাধারণতঃ খুব দুর্বল এবং কোন কিছু কাজ কিংবা ভিক্ষা পর্যন্ত করতেও অক্ষম। অপরিচিত ও পথিক ব্যক্তি যারা এখানে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে মাঝি মাল্লা ইত্যাদি ব্যক্তিদের সংখ্যাই প্রচুর। এছাড়া, দুর্ঘটনা, কিংবা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় আহত ব্যক্তিদের বেশ কিছু সংখ্যক আসে গ্রামাঞ্চল থেকে।

পাগলা গারদ

শহরের পশ্চিম প্রান্তে চকের সন্নিকটে পাগলাগারদ ও জেল হাসপাতাল অবস্থিত। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে পাগলা গারদটি নির্মিত হয়। এটি প্রশস্ত ও সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত দালান এবং একটি বৃহৎ উদ্যান দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে আরোগ্যের পর ক্রমশঃ স্বাস্থ্যলাভকারী রোগীদেরকে কাজে নিয়োজিত করা হয়। এ অট্টালিকার প্রধান অংশে বারান্দা ইত্যাদি ঘেরা ছোট ছোট কক্ষের দুটো সারিসহ ৫৪´×৩৫´ ফুটের একটি উন্মুক্ত চতুষ্ক বা চতুর্ভুজাকৃতি প্রাঙ্গন আছে। এরূপ প্রতিটি দৈর্ঘে ১০ ফুট এবং প্রস্থে ৬ ফুট বিশিষ্ট ১৪টি কক্ষের প্রতিটিতে দুটো করে দরজা আছে—যার মধ্য দিয়ে খোলা বাতাস চলাচল করতে পারে। উক্ত চতুষ্কের সঙ্গে সংযোগকারী ৫৭ ফুট দীর্ঘ ও ৩৪ ফুট প্রশস্ত আরও একটি গৃহ প্রাঙ্গন আছে; সেখানে অনুরূপ দীর্ঘ ও প্রায় ১৭ ফুট প্রশস্ত আর একটি ওয়ার্ড রয়েছে। এ গৃহ প্রাঙ্গন ছাড়াও, ক্রমশঃ আরোগ্যলাভকারী রোগীদের জন্য স্বতন্ত্র আরও একটি ওয়ার্ড আছে এবং উদ্যানের একটি আলাদা অংশে উপরের দিক থেকে আড়াআড়িভাবে দেয়ালের দ্বারা বিভক্ত - বারান্দাসহ ৩টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত কয়েকটি ঘর মেয়ে-রোগীদের জন্য সংরক্ষিত আছে। এই উন্মাদ-আশ্রমের বিভিন্ন কক্ষ ও ওয়ার্ডের উচ্চতা প্রায় ১২ ফুট এবং এর দরজার দৈর্ঘ ৬ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুট। বহির্বাটী, নর্দমা ও কুপ ইত্যাদি সবই পাকা বা ইষ্টক নির্মিত।

জেল হাসপাতাল

৭০ ফুট দীর্ঘ এবং ২৪ ফুট প্রশস্ত একটি অট্টালিকা নিয়ে জেল হাসপাতাল গঠিত। এটি পাঁচটি উন্মুক্ত খিলান পথসহ একটি দেয়াল দ্বারা লম্বা-লম্বিভাবে বিভক্ত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এর একটি করে উন্মুক্ত বারান্দা আছে এবং দালানের প্রতিটি প্রান্তে নির্দিষ্ট রোগের রোগীদের অভ্যর্থনার জন্য ১৮´×৮´ ফুট পরিমাপের কক্ষ আছে। শহরতলী অঞ্চলে ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত সামরিক হাসপাতালটি আলো-হাওয়াযুক্ত একটি বৃহৎ অট্টালিকা; এটি একটি মাত্র হলঘর নিয়ে গঠিত এবং একটি বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এতে ৭০ জন রোগীর স্থান সংকুলান হতে পারে। এর থেকে সামান্য দূরে মাদুরে-ঢাকা একটি অস্থায়ী দালান আছে। ব্যাপক আকারে রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে, এটাকে হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পূর্বোক্তটির মত এ দালানটিও একই আয়তনের।

মানবেতর জীবজন্তুর রোগ

জন্তু জানোয়ারের প্রচলিত রোগব্যাধি সমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাধি জলাতঙ্ক। প্রায়শঃ গরম ঋতুতে, বিশেষতঃ যখন বৃষ্টিপাত খুবই কম এবং অভ্যন্তর ভাগের নদী নালাগুলো শুকিয়ে যায়, তখনই এসব ব্যাধি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। শহরের আশেপাশের জঙ্গল খেঁকশিয়ালে পূর্ণ হয়ে যায় এবং শহর যখন বেওয়ারিশ কুকুরে ভর্তি থাকে, তখন এসব কুকুরকে খেঁকশিয়ালে কামড়ালে, সরাসরি কুকুরের মধ্যে এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলে খেঁকশিয়ালের কামড় থেকে এ ব্যাধিটা মানুষের দেহেও সংক্রামিত হয়। এরকম দৃষ্টান্ত বহু রয়েছে, যেখানে খেঁকশিয়ালগুলো পূর্বাহ্নেই জলাতঙ্কগ্রস্থ ছিল। এ জাতীয় রোগগ্রস্থ খেঁকশিয়ালগুলো অনেক সময় ছুটো-ছুটি করে থাকে এবং ঘরে পর্যন্ত প্রবেশ করে মানুষকে কামড়ায়। আমি এরকম বহু ঘটনার কথা জানি, যেখানে এ ব্যাধির জীবাণু ঐ সকল খেঁকশিয়ালের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়েছিল। দেশের এ অংশে সম্প্রতি সংঘটিত একটি ঘটনায় দেখা যায় যে, একই স্থানে একই রাত্রে ১৭ জন ঘুমন্ত লোককে খেঁকশিয়ালে কামড়ায়। গরম আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ অনাবৃষ্টির দিনে, "মাত্তা" (মাতঙ্গ) নামক গরুর ব্যাধি প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে

এটা খুবই ক্ষতিকারক বলে প্রতীয়মান হয়। ১৮৩৭ সালের এপ্রিল, মেও জুন মাসে অস্বাভাবিক গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ার দরুন এ জেলায় এবং বিশেষ করে উত্তর বিভাগে ও ময়মনসিংহ জেলাতে এ রোগে গরু-বাছুরের বিরাট মড়ক দেখা দিয়েছিল। কোম্পানীয় হস্তিশালায় এরূপ 'মাত্তা' জাতীয় ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রোগ বিস্তার লাভের পূর্বে, জন্তুরা আহার পরিত্যাগ করে, মূত্রনালী থেকে রক্তক্ষরণ শুরু হয় এবং পরে শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থিগুলো ফুলে যায় ও পেছনের পা দুটো পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অপর দিকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে রোগের আক্রমণ সহসা দেখা দেয় এবং এতে ব্যাধিগ্রস্থ পশু কাঁপতে থাকে ও সাংঘাতিক ধরনের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। অতপর অকস্মাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে মরে যেতে দেখা যায়। এতে বিভিন্ন বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার হস্তীই আক্রান্ত হয়ে থাকে। উক্ত ব্যাধিতে হস্তী শালার ২৫টি হাতী দু' মাসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এর মধ্যে দশটির মৃতদেহ কেটে দেখা যায় যে, সব কটি হাতির মস্তক ও পেট দূষিত ছিল। এতে মগজের সর্বনিম্ন পর্দার রক্তবাহী শিরা উপশিরা গুলো অতি মাত্রায় রক্তাভ ছিল এবং মগজের অভ্যন্তরভাগে ভেন্টিকেলে অতিরিক্ত পানি জমা হয়েছিল; পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের আভ্যন্তরীন পর্দাও অত্যধিক রক্তাভ ছিল। বহু ক্ষেত্রে ভেন্টিকেলের মধ্যে রক্তক্ষরণ দেখা দিয়েছিল এবং এদের প্রতেকটি জন্তুর মগজ ও এর লম্বা মাইজ (Medulla oblougata) এত বেশী পরিমাণে রক্তাভ ছিল যে, ছুরি দিয়ে তা' কাটার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য শিরা উপশিরার মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হচ্ছিল। খাদ্যনালীর আভ্যন্তরীন পর্দার প্রদাহ অনেকটা বসন্ত রোগাকৃতি দেখাচ্ছিল; এর অন্তর্বর্তী পর্দার (Mucus membrane) রক্তক্ষরণ দেখতে খুবই টাটকা ছিল। এগুলো আকারে কোনটা মগের ডালের দানার মত, কোনটা টাকার মত, আবার কোনটা শিলিং ইত্যাদির মত সম্পূর্ণ পৃথক পৃথকভাবে সাজানো ছিল। নাড়ীর ঝুলন্ত পর্দার গ্রন্থি সমূহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এদের চতুষ্পার্শ্ব শক্ত হয়ে এঁটে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ হস্তীর মৃতদেহ ময়না তদন্ত করে দেখা যায় যে, ঝুলন্ত পর্দার গ্রন্থিদ্বয়ের ন্যায় বগলের ও কুচকির গ্রন্থিগুলোও ব্যাধিগ্রস্থ ছিল। এদের প্রত্যেকটির পেটেই কৃমি দেখা যায়, এবং এগুলো ছিল তিন রকমের; যথা সাধারণ ফাইলেরিয়া ও দু'রকমের চ্যাওটা। শেষোক্তটির অর্থাৎ চ্যাওটা দুটোর একটা থেকে অন্যটি পৃথকীকরণের একমাত্র

উপায় ছিল—এদের একটির বুকের উপরে সম্মুখ ও পশ্চাতের ছিদ্র বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চাদকির (Disc) ন্যায় ঈষৎ দাবানো স্থান। চাঁদকিতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা উপশিরা এসে যুক্ত হয়েছিল। এক্ষেত্রে একটি মাত্র চিকিৎসাই ছিল—যাতে কিছুটা উপকার লাভ হতে পারতো—তা'হলো কেটে রক্ত বের করে দেয়া। একটি ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বনও করা হয়েছিল ; এবং এতে কানের একটি শিরা কেটে দেড় পাউণ্ডের মত রক্ত বের করা হয়। কিন্তু এত অল্প রক্ত টেনে বের করায়, তেমন বিশেষ কিছু ফলোদয় হয়নি, যাতে রোগের গতি ব্যাহত হতে পারে ; অগত্যা এ জাতীয় পরীক্ষা পুনর্বার আর চালানো হয়নি।

১৮২৮ এবং ১৮৩৭ সালের মধ্যে এস্থানের রেজিমেণ্টাল হাসপাতালে ভর্তি করা রোগীদের রোগের বিবরণ ঃ

	জানুয়ারী		ফেব্রুয়ারী		মার্চ		এপ্রিল		মে	
	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু
সন্ন্যাস রোগ................. ...	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
হাঁপানী ও কফরোগ..........	৯	০	৪	১	১২	১৫	০	০	৪	০
উদরাময়............	৫৫	৬	১৩	১	৩৪	১	২১	১	২৮	০
রক্তআমাশয়............	২৫	০	১৫	০	৫	০	১৬	১	১০	১
জ্বর...	২২০	৬	১৫৪	১০	১৭০	৬	২৩৪	৩	২০৮	৮
উন্মত্ততা...	০	০	০	০	০	০	১	০	২	০
চক্ষু প্রদাহ...	৪	০	০	০	১	০	২	০	৩	০
ফুসফুস সম্বন্ধীয় ব্যধি...... ...	১৭	০	৩	০	৭	১	১	১	৯	০
বাতরোগ...	৩৩	১	১৯	২	২৫	০	২২	০	২৮	০
বসন্ত রোগ...	০	০	০	০	৩	০	৭	১	২	০
প্লীহারোগসমূহ........	০	১	৪	০	১	০	৩	০	৩	২
ক্ষত রোগ	৫৪	০	৪২	০	৩৮	১	২৮	০	২৪	০
দূষিত সহবাসজনিত রোগসমূহ	২	০	২	০	৫	০	৩	০	৩	০
আঘাতজনিত ঘটনাসমূহ	১২	০	১১	০	৫০	০	১৪	০	৩	০
বিবিধ রোগব্যাধি	১৪৩	১	৯২	০	১০৪	২	৭৯	০	৮৪	০
কলেরা ব্যাধিগ্রস্থ	২	০	২	০	১	১	৫	৩	৫	১
	৫৭৬	১৫	৩৬১	১৪	৪৫৭	১২	৪৩৮	১০	৩৮১	১২

	জুন		জুলাই		আগস্ট		সেপ্টেম্বর		অক্টোবর		নভেম্বর		ডিসেম্বর		মোট	
	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু	রোগের ঘটনা	মৃত্যু
সন্ন্যাস রোগ…	০	০	০	০	০	০		০		০	০	০	০	০	০	০
হাঁপানী ও কফরে	২১	১	০	০	১	০		০	৩	০	৫	০	৬	০	৬২	২
উদরাময় …	২৮	১	২৯	১	২০	০	১৬	১	২৬	২	২৫	৮	৬৬	৫	৩৫৬	৭
রক্তআমাশয়	৯	০	১২	০	১৩	০	১১	০	৮	১	১৫	০	৭	০	১৪৫	৩
জ্বর…	১৫৯	১	২৫৯	১	৩০১	৫	৩৫৯	২	৬০৯	৯	৪৮৭	২৮	১৮৫	১০	৩৩৪০	৯
উন্মত্ততা…	০	০	০	০	১	০	০	০	১	০	০	০		০	৫	০
চক্ষু প্রদাহ…	১	০	৫	০	২	০	১	০	২	০	০	০		০	২১	০
ফুসফুস সম্বন্ধীয় ব্যধি	৪	০	০	০	৫	০	৪	০	২	০	৪	০	৭	০	৬৩	২
বাতরোগ…	২৬	০	১০	০	১৬	১	৯	০	১৬	০	২৫	১	২৫	১	২৪৬	৬
বসন্ত রোগ…	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১	০	০	০	১৩	১
প্লীহারোগসমূহ	১	১	২	১	১	০		১	৫	০	০	০	২	০	২৪	৫
ক্ষত রোগ…	২৬	০	৩২	০	৩৪	০	৪৪		৪০	০	২৩	০	৫১	০	৪৩৬	১
দূষিত সহবাসজনিত রোগসমূহ	৪	০	১	০	২	০	৮		৪	০	৯	০	৯	০	৫১	
আঘাতজনিত ঘটন সমূহ	২	০	৪	০	৬	০	৫	০	১১	০	৫	০	৫	০	১২৮	১
বিবিধ রোগাব্যাধি …	৭৪	০	৭১	৩	৫১	০	৬৯	০	৫৪	০	৯০	০	১৫	২	১০৪৬	৮
কলেরা ব্যাধিগ্রস্থ …	১	০	১	০	১	০	১	১	৪	০	৪	৪	১	১	২৮	১১
	৩৩৭	৪	৪২৬		৪৭৪	৬	৫২৮	৫	৭৭৪	১২	৬৮৩	৪১	৪৮১	১৯	৫৯৬৩	১৫৬

দ্বাদশ অধ্যায়

•

[শিল্পদ্রব্য ও জনসংখ্যা হ্রাস—শহরের সাধারণ ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য—এর উন্নতি বিধানের উপায় ও প্রস্তাব।]

বিভিন্ন শিল্পের ক্রমাবনতি

ঢাকা নগরীর খ্যাতি সুদীর্ঘ কালের। এ খ্যাতি ঢাকা এদেশের রাজধানী থাকার দরুন যতটা নয়, তার চেয়েও অনেক বেশী প্রসিদ্ধ ছিল—এর অতীতের বহু বিখ্যাত শিল্পদ্রব্য এবং বিস্তৃত ব্যবসা বাণিজ্য, ঘনবসতি ও অত্যধিক প্রাচুর্যের জন্য। এই জেলার ইতিহাসের আদিকাল থেকে তুলার চাষাবাদসহ মসলিন বস্ত্র বয়ন, সুতা কাটা ও ধৌতকরণ ইত্যাদি সম্ভবতঃ এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা ছিল। অন্যদিকে, মুসলমান কর্তৃক এদেশ বিজয়ের সময় থেকে এখনকার মুসলিম অধিবাসীগণের মধ্যে সীবন শিল্পের কাজ শিল্পের একটি প্রধান শাখারূপে গড়ে ওঠে। মুঘল সরকারের আমলে এবং বিশেষ করে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বের সময়ে যখন ঢাকা শহর অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী অবস্থায় ছিল, তখন সেই হাওয়ায় ভাসমান ঊর্ণাভ জালের ন্যায় অদ্ভুত সুন্দর মসলিন বস্ত্র প্রস্তুত করা হতো এবং সেই সকল বস্ত্র "কোন মানব অপেক্ষা, বরং পরীদের তৈরী" বলে অভিহিত করা হতো; এ মসলিন ছিল "সবচেয়ে মূল্যবান উপহার, যা বাংলা তার দেশীয় রাজকুমারদেরকে দিতে পারতো। দিল্লীশ্বরের তোষাখানার জন্য এবং সারা হিন্দুস্থানের শাসন কর্তাদের রাজদরবারের আমীর ওমরাহ্‌গণের নিমিত্ত এ সকল অননুকরণীয় মসলিন বস্ত্র (মালবাস খাস) তৈরীতে সবচেয়ে নিপুণ কারিগরদের উদ্ভাবনী কৌশল প্রতিফলিত হয়েছিল। অন্যদিকে, পারস্য, ইথিওপিয়া, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক, ইতালী, লাঙ্গুয়েদক, প্রোভেন্স ও স্পেন প্রভৃতি দেশের জন্যে প্লেন মসলিন এবং নানা ধরনের বুটিদার কাপড় কিংবা মিশ্রিত রেশমী ও সুতীবস্ত্র ইত্যাদি তৈরীর জন্য বাৎসরিক পুঁজি-বিনিয়োগের ব্যবস্থা থাকায়—প্রচুর সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল।

১৬৬৬ থেকে ১৬৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডে প্রথম ঢাকাই মসলিনের আমদানী হয় এবং এ সময় থেকে ইংলণ্ডে এর কিছুকাল আগে থেকে ওলন্দাজ এবং পরবর্তীকালে ফরাসীগণ ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত এখানে ব্যাপক ব্যবসা বাণিজ্য চালায়। ঐ বছরে ঢাকার সমুদয় বাণিজ্যের পরিমাণ নিরূপিত হয়েছিল এক কোটি টাকা বা ১½ মিলিয়ন স্টার্লিং। ইংরেজ কর্তৃক এদেশ লাভের কিছু কাল পূর্ব থেকে যদিও ঢাকার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি পতনোন্মুখ ছিল, তথাপি নিঃসন্দেহে ১৭৮৫ সালে বিলেতের কলের তৈরী সুতোর আমদানীর ফলেই মসলিন শিল্প সর্বপ্রথম সবচেয়ে নির্মমভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল। ঐ বছর ইংলণ্ডে কমপক্ষে ৫,০০,০০০ খণ্ড মসলিন বস্ত্র তৈরী হয়েছিল। ১৭৮৮ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত সময়টা ইংলণ্ডের সুতা ব্যবসায়ের স্বর্ণযুগ বলে আখ্যায়িত হয় এবং অপরদিকে বাষ্প-শক্তির ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে তার উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের দ্বারা প্রভূত উন্নতি লাভ করে। এছাড়া, ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত ঢাকার মসলিন শিল্পের ওপর শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত আমদানী শুল্ক বসিয়ে সেখানকার বস্ত্রশিল্প লালন করা হয়। এ ধরনের অত্যধিক উচ্চ হারে শুল্ক আরোপণের ফলে কার্যত ইংলণ্ডে ঢাকাই মসলিন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে বছরের পর বছর হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে এসব বস্ত্র বাণিজ্য তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। ১৭৮৭ সালে ইংলণ্ডে মসলিন রপ্তানী-মূল্যের পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। ১৮০৭ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮½ লক্ষ টাকায় এবং ১৮১৩ সালে এর পরিমাণ আরো হ্রাস পেয়ে ৩½ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। অতঃপর ১৮১৭ সালে রপ্তানীর পরিমাণ শূণ্যের কোঠায় এসে ঠেকে এবং এখানকার বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিনিধির পদ বাতিল করা হয়। ১৮২৫ সালে মিঃ হাসকিসন কর্তৃক ভারতীয় সুতী বস্ত্রের উপর ধার্যকৃত শুল্ক মোট মূল্যের শতকরা ১০ ভাগ কমিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এই সামান্য শুল্ক হ্রাসের দ্বারা বাংলার মসলিন বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এতে যে যৎসামান্য লাভ হয়েছিল—তা'ও আবার এদেশে ইংলণ্ডের বিপুল পরিমাণ সুতা রপ্তানী করে দশগুণ পুষিয়ে নেয়া হয়। ১৮২১ সালে সর্বপ্রথম ঢাকায় প্রচুর বিলেতী সুতার আমদানী পরিলক্ষিত হয়। ১৮২৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ৩,০৬৩,৫৫৬ পাউণ্ড; ১৮৩১ সালে ৬৬,২৪,৮২৩ পাউণ্ড এবং ১৮২৮ সাল থেকে এখানে দেশীয় সুতার প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে

এবং এরপর থেকে বিলেতে তৈরী সুতাই ব্যবহৃত হতে থাকে। এদেশের এ অংশে শিল্পের বিরাট উৎসগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ হ'তে এটা স্পষ্ট হবে যে, ঢাকার গৌরবময় বাণিজ্যিক ইতিহাস শুধু বিষাদময় অতীতের স্মৃতি রোমন্থন মাত্র। ৩০ বছর কালের পরিধিতে ইংলণ্ডের সঙ্গে এর ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে যেখানে বহু লক্ষ লক্ষ টাকার আমদানী হতো, এখন তা' বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতি সাম্প্রতিক কালে এর অন্যান্য বিরাট পণ্য সম্ভার যেমন মিশর ও তুরস্কের জন্য সূচী শিল্পজাত বস্ত্রাদির রপ্তানী ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে এবং সম্ভবতঃ আর অল্প কয়েক বছরের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। পূর্বে জেলার প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারের সুতা উৎপাদনের পেশাকার্য বর্তমানে ইংলণ্ডের তুলনামূলকভাবে সস্তা সুতা আমদানীর দরুন প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। এভাবে সুতা কাটা ও বয়ন শিল্প কর্ম যা' যুগ যুগ ধরে অসংখ্য পরিশ্রমী লোকদের জন্য কাজের সংস্থান করে দিতো, তা' মাত্র ৬০ বছর সময়ের ব্যবধানে এমন এক হাতে গিয়ে পড়েছে—যারা কেবল বিভিন্ন জাতির অন্যান্য চাহিদাই মিটাচ্ছে না, বরং তার এককালের প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির চাহিদাও পূরণ করছে। উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের পতনের ফলে স্বভাবতঃই শহরের লোকসংখ্যারও ক্রমাবনতি ঘটেছে। ১৮০০ সালে ঢাকার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ২,০০,০০০। কিন্তু ১৮৩৮ সালের লোক-গণনা অনুসারে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৬৮,০৩৮ জনের অধিক নয়। যে হারে জনসংখ্যার হ্রাস ঘটেছে, তার চেয়ে বহু গুণে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়টি চৌকিদারী বা নির্ধারিত পুলিশ করের (লোকের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার একমাত্র নির্ণায়ক মানদণ্ড) রেকর্ড থেকে অবগত হওয়া যায়।

এতে দেখা যায় যে, ১৮১৪ থেকে ১৮৩৮ সালে ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৩১,৫০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকায় নেমে আসে। এ সকল পরিবর্তনের ফলে, পূর্বে যে সমস্ত পরিবার প্রাচুর্যের মধ্যে ছিল, বর্তমানে তারা দারিদ্র্যের মধ্যে কালাতিপাত করছে। অন্যদিকে নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ লোক কাজের অভাবে চরম দুঃস্থ অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করে চলেছে। নিজেদের ও পরিবারের জীবিকা সংগ্রহের নিমিত্ত এরা তাদের পূর্ববর্তী পেশার পক্ষে যতই অসামঞ্জস্য হোক না কেন, তা' তারা যে কোন কাজ পেলেই খুশী হয়।

শহরের সাধারণ অবনতি

হ্রাসকৃত জনসংখ্যার ন্যায়, শহরের অবনতির লক্ষণগুলো এবং এর নাগরিকগণের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। বহুসংখ্যক বাড়িঘর শূন্য অথবা ধ্বংসাবস্থায় পড়ে আছে। নর্দমা, সরু গলিপথ ও সেতুগুলো অর্থের অভাবে সংস্কার সাধন না হওয়ায় অবহেলিত হয়ে রয়েছে। শহরতলী সমূহ বর্তমানে জঙ্গলাকীর্ণ; অপরদিকে, শহরের অভ্যন্তরভাগে পরিত্যক্ত মরা জীবজন্তু ও শাক-সব্‌জি এবং নানাবিধ ময়লা আবর্জনায় বহু অবরুদ্ধ খাল-নালা ও গর্ত পূর্ণ হয়ে আছে। এতে পার্শ্ববর্তী কূপগুলোর পানি দূষিত হয়ে পড়ছে। সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপক পরিমাণে রোগ ব্যাধি ছড়িয়ে আছে বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু অত্যাধিক দরিদ্র শ্রেণীর অধিবাসীগণের অপরিষ্কার ও অকিঞ্চিৎকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের ফলে এসব রোগব্যাধি ব্যাপক আকারে পরিলক্ষিত হয়। স্থান বিশেষের উন্নতি অবশ্য সেই এলাকার উপর নির্ভরশীল; এবং এ সকল খারাপ অবস্থার মূল উৎস নিহিত আছে—উপরোল্লিখিত দূষিত পানিও অসংখ্য কাদাযুক্ত খালনালা এবং বহু অবরুদ্ধ পয়-প্রণালীর অস্তিত্বের মধ্যে। প্রতি বছর ম্যালেরিয়া রোগের ব্যাপক বিস্তার ঘটছে এবং এভাবে সৃষ্ট বিষাক্ত আবহাওয়ায় বহু সংখ্যক লোক রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সর্বত্র হতভাগ্য অসহায় লোকদের ভীড় চরম বিপর্যস্ত ও দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধিগ্রস্থ এবং বিকলাঙ্গদেরকে আমরা দেখে থাকি; এরা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে তাদের অনিশ্চিত আহার্যের সন্ধান করে থাকে। সুতরাং এটা স্বীকার করতেই হবে যে, এখানে পৌর বিষয়ক উন্নতিমূলক কাজের যথেষ্ট সুযোগ এবং দাতব্য কার্যক্রমের বিরাট পথ উন্মুক্ত আছে। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, সিভিল সার্ভিসের সদস্য পরলোকগত মিঃ মিটফোর্ডের বিরাট বদান্যতার ফলে এসব মহৎ উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত মহৎ প্রাণ ব্যক্তি যিনি প্রথমে কলেক্টররূপে এবং পরে প্রাদেশিক আপীল কোর্টের বিচারক হিসেবে বহু বছর যাবৎ এখানে বসবাস করেছেন, তিনি ১৮৩৬ সালে ইউরোপে পরলোক গমন করেন। জানা যায় যে, ইনি ঢাকা শহরে দাতব্য, উপকারক ও জনহিতকর কার্যাবলীতে ব্যয় করার জরুরী উদ্দেশ্যে বাংলা সরকারের হস্তে ছ'থেকে আট লক্ষ টাকার মত তদীয় বিরাট ঐশ্বর্যময় তহবিল রেখে গেছেন। "এইরূপ উইলের উদ্দেশ্য ও নির্দেশ এই যে, এই অর্থ একান্তভাবে স্থানীয়

অধিবাসীগণের উপকারার্থে এককভাবে কাজে লাগানো হবে, যা' তারা এবং দেশের সরকার, সেই উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বাধিক সহায়ক বলে মনে করেন।" ১৮৩৭ সালের জুন মাসে শহরের নাগরিকগণ উক্ত বিষয়ের ওপর আলোচনার্থে একটি সভানুষ্ঠান করেন এবং এ হেন বদান্যতা-মূলক উইল উদ্ধার ও এর দ্রুত বাস্তবায়ন তরান্বিত করার পথে "কোর্ট অব্ ডিরেক্টরস্" এর সাহায্য কামনা করে তাদের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, উইলকারীর অনুকল্পিত মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য অতিসত্বর উক্ত অর্থ পাওয়া যাবে। এ অর্থ ব্যবহারের ব্যাপারে যদি আমাদেরকে কোন প্রস্তাব উপস্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়, তাহলে আমরা বলবো যে, শহরের বর্তমান বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানাদির সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধানকল্পে উক্ত অর্থ-সম্পদ নিয়োগের চাইতে আর কোন মহৎ কাজই থাকতে পারেনা।

সরকারী 'কনজারভেন্সি' বা সংরক্ষণ বিভাগের আয়ত্তাধীন বিবিধ জনহিতকর কার্যাবলী বাস্তবায়নের জন্য নগর শুল্ক থেকে লব্ধ কিছু অর্থ সরকার কর্তৃক কিছুকাল পূর্বে একটি স্থানীয় কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিল। উক্ত কমিটি মিঃ ডাউয়েস ও মিঃ ওয়াল্টারের তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় বহু উন্নতি ও জনহিতকর কার্যাবলী সুসম্পন্ন করে। মাসিক ১,৬০০ টাকার উক্ত অর্থ মঞ্জুরী ১৯২৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে এ উদ্দেশ্যে একমাত্র বাৎসরিক অর্থমঞ্জুরী ২,০০০ টাকা—প্রধান প্রধান সড়ক ও বাজারগুলো ঝাঁট দেয়ার প্রয়োজনে সামান্য কয়েকটি গরুর গাড়ি ও কিছুসংখ্যক ঝাড়ুদার রাখার জন্য করা হয়।

শহরের উন্নতিকল্পে প্রস্তাব

শহর সংরক্ষণ সংক্রান্ত তহবিল আরো বাড়ানো উচিত। এ অর্থের পরিমাণ এরূপ হওয়া প্রয়োজন—যাতে সেতু, ঘাট ও নর্দমাগুলোর সংস্কার সাধন ছাড়াও, সাধারণ স্বাস্থ্যের সহায়ক নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্য যেমন, শহরের অভ্যন্তর ভাগের খাল নালা গভীর করে খনন করা, আবর্জনাপূর্ণ গর্তগুলো ভরাট করা, এবং সড়ক ও সংকীর্ণ গলিপথগুলো প্রশস্ত করা ইত্যাদি সম্ভব হয়।

অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এখানে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। প্রতি বছর এতে

সহায় সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। অতএব, একটি অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র স্থাপন করা হলে, তা' জনসাধারনের বিরাট উপকারে আসবে।

উৎস-কূপ নির্মাণ

উৎস-কূপ ইত্যাদি নির্মাণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় কাজ হবে। শহরের কাঁকর মাটিতে পানির বহিঃউন্মুক্ত উৎসগুলোর সন্ধান লাভ থেকে ভরসা করা যায় যে, কোন বড় ধরনের খরচ ব্যতিরেকেই এগুলো নির্মাণ করা সম্ভব হবে।

নতুন হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রয়োজন

১৮০৩ সালে স্থাপিত দেশীয় হাসপাতালে চাঁদার সাহায্যে গড়ে-তোলা তহবিলে বিগত দশ বছরে অতিরিক্ত কোনো অর্থই জমা হয়নি। বিভিন্ন শ্রেণীর দরিদ্র লোকজনদেরকে সাহায্য দানের জন্য বর্তমান তহবিল খুবই অপর্যাপ্ত। হাসপাতালের দালানটি খুবই ছোট, এবং নির্মল হাওয়া চলাচলের অনুপযোগী। এতে শুধুমাত্র ৪০ জন রোগীর স্থান-সংকুলান হতে পারে। এছাড়া, যে উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছে, এটি তার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, উন্নত পরিকল্পনার ভিত্তিতে অন্তত পক্ষে ১০০ রোগীর স্থান-সংকুলানের উপযোগী একটি নতুন হাসপাতাল নির্মাণ করা খুবই প্রয়োজন। শহরের দু'প্রান্তে দুটো দাতব্য চিকিসালয় স্থাপন করা হলে, তা' দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খুবই সুবিধাজনক হবে। কেননা, বর্তমানে এদের অনেকেই তাদের আবাসস্থানের বেশী দূরত্বের কারণে হাসপাতালে উপস্থিত হতে অসমর্থ হয়।

রেভারেণ্ড মিঃ শেফার্ড

মুঘল সরকারের আমলের ন্যায়, গরীবদের জন্য বর্তমানে এখানে কোন "লঙ্গর-খানা" বা 'ভোজনালয়' নেই। এ ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা' আছে তা' হলো পরহিতৈষণা-মূলক একটি তহবিল। এটি প্রায় চার বছর পূর্বে রেভারেণ্ড মিঃ শেফার্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত তহবিল থেকে অপেক্ষাকৃত অধিক নিঃস্ব যেমন, অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতিদের মধ্যে মাসে ৮০ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত বিতরণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং, এর সম্প্রসারণকরতঃ একে কলকাতার "ডিষ্ট্রিক্ট চেরিটেবল সোসাইটি"র ন্যায় একই মর্যাদা সম্পন্ন করা যেতে পারে। এতদ্‌সঙ্গে শহরতলীতে কুষ্ঠরোগীদের বসবাসের জন্য একটি গ্রাম নির্দিষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন।

ঢাকা শহরের অধিবাসীগণ তাদের শিক্ষার নিমিত্ত "শ্রীরামপুর মিশনারী সোসাইটির" নিকট ঋণী। বাংলা, ফার্সী ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান-কারী ঊনত্রিশটি বিদ্যালয় দীর্ঘ বিশ বছরেরও উর্ধ্বকাল যাবৎ রেভারেণ্ড মিঃ শেফার্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়ে আসছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্থের অভাবে এসব স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে সাতে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সংখ্যার মধ্যে 'ক্যালকাটা বেনেভলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন' কর্তৃক অর্থ সাহায্যকৃত খ্রীস্টিয়ানদের স্কুলটিও অন্তর্ভুক্ত। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের অশেষ উপকার সাধন করছিল। উইলদাতা মিঃ মিটফোর্ড এস্থানে তাঁর বসবাস কালে এসব বিদ্যালয় সম্বন্ধে খুবই উৎসাহী ছিলেন। তাঁর এই মনোভাব বিবেচনা করে, এটা অবশ্য মেনে নিতে হয় যে, উইলের তত্ত্বাবধায়কগণের নিকট থেকে অর্থ সাহায্য লাভের জন্য এ সব বিদ্যালয়ের জোর দাবী উত্থাপনের সুযোগ আছে।

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও শিল্পবিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত নতুন একটি মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন, এবং বর্তমান ইংরেজী বিদ্যালয়টির সম্প্রসারণ অত্যন্ত হিতকর বলে প্রমাণিত হবে।

নির্ঘণ্ট

অ

ও

ক

ঝ

ট

ফ

শ